যোগসাধন

প্রথম ভাগ।

বা

ক্তির উৎকর্ষ-সাধন।

সংসারি ভ্রাতার উপকারার্থ জনৈক

ব্রহ্মচারীর উপদেশ।

১৮৯৬।

PRINTED BY BHOO BAN MOHAN DASS, SA
PUBLISHED BY DASS MITRA & CO. 18, KRISH...

CALCUTTA.

গ্রন্থসূচনা।

সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী অশেষ জ্ঞানপারগ জনৈক ব্রহ্মচারী বা যোগীর নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাহা জানিবার তাহা প্রায় জানিয়াছি; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তব্যসাধনের সময় প্রায়ই বিপরীতাচরণ করিয়া ক্লেশভোগ করি; এইরূপ ক্রমাগত ক্লেশ ভোগ করিয়া আমরা জর্জ্জরিত হইতেছি। আমরা ক্লেশের কারণ জানিয়াও সেই কারণ বর্জ্জন করিতে পারি না। সংসারে কে[illegible] আমাদের একটীমাত্র পয়সা ক্ষতি করিলেও আ[illegible] ক্ষতি সহ্য করিতে পারি না; আমরা ক্ষতিকারক ব্যক্তিকে শত্রু বলিয়া চিরদিন স্মরণ রাখি এবং কখ[illegible] তাহার সংস্রবে যাই না; দূর হইতে দেখিলেই [illegible] শত্রু বলিয়া চিনিতে পারি এবং তাহাকে নিকটে [illegible]সিতে দেই না বা তাহার নিকটেও যাই না। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্য চিরকাল রিপু বলিয়া জগতে বিঘোষিত, মহা মনীষিগণ যাহাদিগকে শত্রু শত্রু শত্রু বলিয়া চিরদিন উচ্চৈঃস্বরে অবিরত প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমরাও প্রতিনিয়ত পরীক্ষা দ্বারা —ফলভোগ দ্বারা যাহাদের বিষম অপকারিতা নিয়ত হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, যাহারা আমাদের বিষম ক্ষতিকারক বা সর্ব্বনাশকারী, সেই সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ শত্রুদিগকে আমরা সর্ব্বতোভাবে শত্রু বলিয়া জানিয়াও তাহাদের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারি না! তাহাদিগকে চিনিয়াও চিনিতে পারি না! আমাদের এ বিষম ব্যাধির ঔষধ কি?

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন,—

স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন করিলেই সাংসারিক যাবতীয় ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। ফলতঃ স্মরণশক্তির উৎকর্ষ সাধনই সর্ব্বব্যাধির পরমৌষধ।"

আমি পুনরায় যখন প্রশ্ন করিলাম, কিরূপে স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন করা যায়? তখন তিনি আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সংসারক্লিষ্ট সাধারণ ভ্রাতৃবর্গের উপকারার্থ সেই সমস্ত উপদেশ প্রচার করিলাম।

প্রচারক।

স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন

স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে যোগসাধনের প্রয়োজন।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। সমাধিস্থ মহাযোগীর চিত্তই নিরুদ্ধ। এই যোগের লক্ষ্য সুমহান্! অতি মহান্! এই যোগসাধনও অতি দুরূহ, অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার! ইহা সাধারণ মানবের অসাধ্য। দেবতাদেরও দুঃসাধ্য! অতএব স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য যে যোগসাধনের প্রয়োজন, তাহা মহাযোগীর যোগসাধন হইতে যে কতদূর অন্তরস্থ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যদি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার, তবে শুন ;—

দরিদ্র শতপতি হইতে চায়; শতপতি সহস্রপতি হইতে ইচ্ছা করে; সহস্রপতি অযুতপতি হইতে বাসনা করে; অযুতপতি লক্ষপতি হইতে বাঞ্ছা করে; লক্ষপতি জমীদার হইতে চায়, জমীদার রাজা হইতে চায়; রাজা মহারাজ হইতে চেষ্টা করে; মহারাজ সম্রাট্ হইতে ইচ্ছা করেন; সম্রাট্ পৃথ্বীশ্বর হইতে বাসনা করেন; পৃথ্বীশ্বর ইন্দ্রত্ব পাইতে অভিলাষ করেন; ইন্দ্র শিবত্ব প্রার্থনা করেন; শিব

বিষ্ণুত্ব অভিলাষ করেন; বিষ্ণু ব্রহ্মপদের জন্য তপস্যা করেন; **কিন্তু সমাধিস্থ নিরুদ্ধচিত্ত মহাযোগী ব্রহ্মপদেরও বাসনা করেন না!**

এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি চাও? মনপ্রাণ খুলিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দাও। যোগ বাঞ্ছাকল্পতরু। তুমি যাহা চাহিবে, যোগের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহাই পাইবে। তবে তোমার প্রার্থনা যে পরিমাণে উচ্চ হইবে, যোগসাধনের জন্য সেই পরিমাণে আয়াস গ্রহণ করিতে হইবে। "অসাধ্য কিছুই নাই" এ কথা কেবল যোগীই বলিতে পারেন।

বামহস্তে গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করা, গণ্ডূষে সমুদ্র শোষণ করা, কক্ষতলে সূর্য্যকে সংস্থাপন করা, যোগীর অনায়াস-সাধ্য। কিন্তু আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের প্রয়োজন কি? যাহা তোমার অসাধ্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহাতে বিশ্বাস করিবারই বা প্রয়োজন কি? তোমার চাই কি? স্মরণশক্তির একটু উৎকর্ষ চাই! এই স্মরণশক্তিরই বা প্রয়োজন কি? সাংসারিক অবস্থার একটু উন্নতি সাধন করাই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য; তজ্জন্যই স্মরণশক্তির একটু উৎকর্ষ-সাধন আবশ্যক। এখন বুঝিলাম, তোমার কতটুকু যোগ-সাধনের প্রয়োজন। তোমার কিরূপ যোগী হওয়া আবশ্যক তাহাও বুঝিলাম। গণ্ডূষে সমুদ্র পান করা তোমার উদ্দেশ্য নহে। যোগে-যাগে গোষ্পদ পার হওয়াই তোমার উদ্দেশ্য। ইহাই তোমার পক্ষে মহান্ উদ্দেশ্য! এই সামান্য যোগসাধনই তোমার পক্ষে মহান্ পুরুষকার!

অতএব শুন; তোমার বাঞ্ছাকল্পতরু যোগের বিষয় বলিতেছি শুন;—

যোগসাধন এবং যোগী।

মনোযোগের নামই যোগ।

অভ্যাসের * নাম সাধন।

মনোযোগ অভ্যাসের নামই যোগসাধন।

যিনি মনোযোগী তিনিই যোগী।

অর্থাৎ মনোযোগ যাঁহার অভ্যস্ত হইয়াছে, তিনিই যোগী। যিনি মনোযোগ অভ্যাস করেন, তিনিই পুরুষ নামের যোগ্য; অর্থাৎ যিনি যোগী তিনিই পুরুষ। অভ্যাস, যত্ন-সাপেক্ষ, চেষ্টা-সাপেক্ষ, পরিশ্রম-সাপেক্ষ এবং অধ্যবসায়-সাপেক্ষ। অর্থাৎ যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ব্যতীত কিছুই অভ্যাস করা যায় না। কিন্তু যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়কে একটী কথায় "পুরুষকার" বলে; "সুকৃতিও" বলে। অতএব অভ্যাস পুরুষকার-সাপেক্ষ। সেই জন্যই যিনি যথার্থ পুরুষ, তিনিই সুকৃতি বা সাধনার অধিকারী; সুতরাং তিনিই যথার্থ যোগী। সামান্য উদাহরণ দ্বারা এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম কর;—

সংসারে অনেক লোক দেখা যায়, তন্মধ্যে ইতর-বিশেষ আছে। কেহ বা সাধারণ, কেহ বা অসাধারণ। সকলে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে না।

---

* অভ্যাস দুই প্রকার; কদভ্যাস বা দুষ্কৃতি এবং সদভ্যাস বা সুকৃতি। এখানে সাধন বলিলে যে অভ্যাস বুঝায়, তাহা সুকৃতিই বুঝিতে হইবে।

যে স্বীয় কর্ত্তব্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই কৃতকার্য্য বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহারই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। অতএব যে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া স্বীয় বাসনানুরূপ ফল লাভ করিতে পারে, তাহাকেই যোগী বলিয়া জান। অপর ব্যক্তিরা যোগী নামের অযোগ্য। ফলতঃ, যাঁহারা এ সংসারে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত, তাঁহাদিগকেই যোগী বলিয়া মনে কর। অসাধারণ পুরুষ আর যোগী তুল্যার্থ-বাচক জানিয়া রাখ।

কোন বিদ্যালয়ের একটী শ্রেণীতে ২৫ জন সমপাঠী ছাত্র আছে; কিন্তু তন্মধ্যে তিনটী ছাত্র উত্তম, পাঁচটী মধ্যম এবং অপরগুলি অধম। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী উত্তম যোগী, অন্য পাঁচটী মধ্যম যোগী এবং অপর গুলি যোগী নামের অযোগ্য বা অধম কাপুরুষ।

যে কর্ম্মকার সম-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অসাধারণ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি উত্তম যোগী। এইরূপে যে কোন ব্যক্তি যে কোন ব্যবসায়ে অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই যোগী। মনোযোগ ব্যতীত কেহই যোগী হইতে পারে না, এবং মনোযোগ ব্যতীত কেহই অসাধারণত্ব লাভ করিতে পারে না। অতএব যিনি মনোযোগী তিনিই যোগী।

তুমি যদি অসাধারণত্ব লাভ করিতে চাও, যদি অপর পাঁচজনের অপেক্ষা তুমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব চাও, তবে যোগসাধন কর অর্থাৎ মনোযোগ অভ্যাস কর। মনোযোগ অভ্যাস আর স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন একই কথা বুঝিয়া

রাখ। মনোযোগ অভ্যাস করিলে অশেষ ফললাভ করিতে পারিবে; তন্মধ্যে স্মরণশক্তির উৎকর্ষ একটী ফলমাত্র। যোগসাধন বলিলে তুমি যেন কিম্ভূত কিমাকার একটা বড় জুজু মনে করিও না। যোগসাধন বলিলে "মনোযোগ অভ্যাস" এই কথাই বুঝিবে। একথা বালকেরাও বুঝিতে পারিবে।

এই যোগসাধনের উপরই সাংসারিক যাবতীয় উন্নতি নির্ভর করে, ইহা দৃঢ়বিশ্বাস কর। অথবা এখন বিশ্বাস করিতেও বলিতেছি না; কিঞ্চিৎ যোগসাধন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ ফল প্রত্যক্ষ করিয়া তবে বিশ্বাস স্থাপন কর। যে বিন্দুমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের শক্তি জানে বা অনুভব করিয়াছে, সে মহাগ্নির শক্তি সহজেই অনুমান করিতে পারে। অতএব "অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, ইহা বিশ্বাস কর" একথা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। "সামান্য অগ্নিকণার শক্তি অনুভব করিয়া দেখ, পরে মহাগ্নির শক্তিতে বিশ্বাসস্থাপন কর" এই কথা বলাই সঙ্গত। কিন্তু যে মূঢ় পামর একথাও শুনিতে চায় না, ইহাতেও বিশ্বাস করিতে চায় না, তাহাকে আর কি বলিব? যাহার কিঞ্চিৎ পুরুষকার বা পুরুষত্ব আছে, তাহাকেই পুরুষকারের উন্নতিসাধন শিক্ষা দিলে ফলের প্রত্যাশা আছে; কিন্তু যাহার কিছুমাত্র পুরুষকার নাই, সেই অলস কাপুরুষকে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত বিফল। যে পামর পূর্ব্বজন্মে সুকৃতিলেশ সঞ্চয় করে নাই, যে ইহজন্মেও কিছুমাত্র সুকৃতি সঞ্চয় করিতে পারে নাই, তাহাকে সুকৃতির উপদেশ দেওয়া আর শূকরের

সম্মুখে মহামূল্য মুক্তারাজি নিক্ষেপ করা উভয়ই প্রায় সমান ফলপ্রদ।

যোগসাধনের অধিকারী।

ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে বিরাট ব্রহ্মপর্য্যন্ত সকলেরই উদ্দেশ্য যোগসাধন। কিন্তু যাউক্, বড় কথায় কাজ নাই। সকল মনুষ্যই স্বীয় উন্নতি ইচ্ছা করে। সেই জন্য যোগ-সাধন সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু সকলের সাধ্য বা শক্তি সমান নহে। অতএব সকলে যোগসাধনের সমান অধি-কারী নহে। নিতান্ত অলস দুষ্কৃতি-পরায়ণ ইতর-সাধারণের কথা ত্যাগ করা যাউক্; কেননা তাহারা মনুষ্যের আকৃতি-মাত্র লাভ করিয়াছে; কিন্তু ইতর জন্তু অপেক্ষা অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। সুকৃতিশালী অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যেও সকলে সমান অধিকারী নহেন। কেহ মৃদুমাত্রায়, কেহ মধ্যমাত্রায় এবং কেহ বা অধিমাত্রায় অধিকারী। যাঁহার মনের আগ্রহ (শ্রদ্ধা ও বীর্য্য অর্থাৎ উৎসাহ) যে পরিমাণে অধিক, তিনি সেই পরিমাণেই যোগসাধনের অধিকারী হইয়া থাকেন।

যাঁহার সুকৃতি বা পুরুষকার (সংবেগ অর্থাৎ কার্য্যপ্রবৃত্তি) যে পরিমাণে তীব্র, তিনি যোগসাধনে সেই পরিমাণে অধি-কারী হইয়া তদনুযায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারেন। সেই জন্যই চিরকারী সাধক বিলম্বে বাসনার ফল লাভ করিতে পারেন; আর উদ্যমশীল সাধক সত্বর মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন।

যোগাঙ্গ।

যোগের বা যোগসাধনের আটটী অঙ্গ আছে। যথা ;—

যমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি।

এই অষ্টাঙ্গ যোগের শেষ অঙ্গ সমাধি। সমাধিই উদ্দেশ্য। এই সমাধির নামই মনোযোগ। এই মনো-যোগ বা সমাধি লাভ করিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অতি সঙ্কীর্ণ বা অতি ক্ষুদ্র। স্মরণ শক্তির উৎকর্ষসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। তজ্জন্যই সমাধি বা মনোযোগের প্রয়োজন। সুতরাং এই যোগসাধন অতি অনায়াসসাধ্য, ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঠিক্ উদ্দেশ্যানুযায়ী চেষ্টা করিলে হয় ত সম্যক্ উদ্দেশ্যলাভ হয় না। ব্যবহারিক নিয়মে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি তিন হাত পরিসরের একটী খাল লাফাইয়া পার হইতে চায়, সে পাঁচ হাত বা অন্ততঃ চারি হাত লাফাইবার জন্য উদ্যম বা প্রয়াস গ্রহণ করে। যে ১২টী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া যশোলাভ করিতে চায়, সে অন্ততঃ ১৫ টী ব্রাহ্মণের উপযোগী খাদ্যের আয়োজন করে। অত-এব তোমার উদ্দেশ্য যতই সামান্য হউক্ না কেন, সেই

উদ্দেশ্য লাভের জন্য অপেক্ষাকৃত একটু অধিক সাধনের প্রয়োজন। তোমার যদিও অধিক সাধনের প্রয়োজন না থাকে, তথাপি আমার কিছু অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন। তবে আমিও যে নিতান্ত অতিরিক্ত কথা বলিব, তাহা মনে করিও না। আমি যখন জানি যে, পদব্রজে মহাসাগর পার হওয়া তোমার উদ্দেশ্য নহে, তখন তদ্বিষয়ে কেন তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য বৃথা আয়াস গ্রহণ করিব? কিন্তু গোষ্পদ উত্তীর্ণ হওয়া তোমার অভিপ্রেত হইলেও বা তোমার উদ্দেশ্য হইলেও আমি ততটুকু ক্ষুদ্র উপায়ের নির্দ্দেশ করিতে যেন পারিয়াও পারিব না। আমি সামান্য একটী নদী পার হইবার জন্য তোমাকে একখানি ছোটখাট জাহাজ প্রদান করিব, তুমি সেই জাহাজখানি লইয়া তোমার সাধ্যানুসারে বা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার কর। তবে একথা বলিয়া রাখি যে, যদি নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই ছোট জাহাজখানিও ছিন্নভিন্ন কর, তাহা হইলে নদী পার হওয়াও দুষ্কর হইবে, এমন কি হয়ত গোষ্পদেও হাবুডুবু খাইবে। এখন আমি যে নদী ও জাহাজের কথা বলিলাম, ইহার তাৎপর্য্য সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না। অগ্রে যাহা যাহা বলি, সমস্ত শুনিয়া যাও। পুনরায় সমালোচনার সময় বুঝিতে পারিবে। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, আমি নভেল বা নাটক লিখিতেছি না। যাহা কেবল একবার মাত্র পড়িয়া আল্‌মারি সাজাইয়া রাখিতে হয়, তাহা লিখিতেছি না। ইহা জীবনের প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের সহচর। জীবনের চরম

উদ্দেশ্য সাধনের ইহাই সহায়স্বরূপ বা পথপ্রদর্শক। অতএব সাবধানে ইহার যত কথার যে পর্য্যন্ত তাৎপর্য্য বুঝিতে পার, তত কথার সেই পর্য্যন্ত বুঝিতেই চেষ্টা করিবে।

আমি মহাযোগীর জন্য ব্যবস্থা লিখিতেছি না। আমি তোমার জন্যই ব্যবস্থা লিখিতেছি; তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধিবিদ্যা যতদূর থাকে থাকুক্, তুমি তদনুসারে বুঝিয়া রাখ যে, **সমাধি শব্দের অর্থ মনোযোগ,** মনোযোগ বলিলে তুমি যতদূর বুঝিতে পার, সমাধি শব্দেরও ততদূর অর্থ জানিয়া রাখ। তোমার সাধ্যাতীত কোন কথা বা তোমার সাধ্যাতীত কোন সাধনের কথা আমি বলিব না, ইহা আমার দৃঢ়সঙ্কল্প জানিও। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তোমার উপযোগী ব্যবস্থা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। অগ্রে যমনিয়মাদির ব্যাখ্যা না করিয়া কেন সমাধির অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম? তোমাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য। পাছে তুমি আমার নিকট হইতে ছুটিয়া পলাও, সেই আশঙ্কাতেই শেষের কথা আগে বলিলাম। সমাধির অর্থ আগে প্রকাশ না করিয়া, অর্থাৎ তোমার উদ্দিষ্ট স্থান তোমাকে আগে ভাল করিয়া না দেখাইয়া দিয়া, যদি আমি আগেই পথের বর্ণনা করিতে বসি, তাহা হইলে হয় ত তুমি আমাকে আসাম চা-বাগিচার চা-কর সাহেবের নিয়োজিত আড়কাটি মনে করিয়া আমার নিকট হইতে কোনওরূপে পলায়নের চেষ্টা করিবে। এই জন্যই আমি পুনরায় তোমাকে বলিতেছি যে, আমি তোমাকে কোন কষ্টকর দুরারোহ বা দুর্গম গহন স্থানে লইয়া যাইতে

চেষ্টা করিতেছি না। জাহাজ দিব বলিয়াছি বলিয়া তুমি মনে করিও না যে তোমাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করাই আমার অভিপ্রেত। যাহা হউক, তুমি ভয় পাইবে বলিয়াই আমি আগে যমের বর্ণনা না করিয়া সমাধির বর্ণনা করিলাম। যোগসাধনের প্রথম অঙ্গই যম! যাহা শুনিলেই হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া যায়। কিন্তু তুমি আশ্বস্ত হও; আমি যমের ব্যাখ্যা করি শুন;—

যম।

যে পরমপুরুষ ভগবান্ যমসাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন; যিনি ধর্ম্মরাজ নামে ভুবনবিখ্যাত, যিনি পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা, যিনি স্বর্গের দ্বার-রক্ষক, যিনি সুকৃতি ও দুষ্কৃতির বিচারকর্ত্তা, যিনি পুণ্যা-পুণ্যের ফলদাতা, যিনি মনুষ্যের প্রভু, দেবতার সহায়, পাপীর শত্রু, তিনিই যম বা যমরাজ নামে ত্রিলোকে পরিচিত। এই ধর্ম্মরাজ যমের নাম করিলেই পাপীর হৃদয় আতঙ্কে কম্পিত হয়; পুণ্যবানের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে। এই অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানের মহিমা কিঞ্চিৎ অনুধ্যান করিলেই হৃদয় প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়ে, চিত্ত আত্মহারা হইয়া যায়! যম পরম দয়ালু ও সত্যপরায়ণ, তিনি কখনও পরধন হরণ করেন না, তিনি পরম ব্রহ্মচারী, তিনি পরম সন্তোষের আধারস্বরূপ। অমৃতের অনন্ত সমুদ্র স্বরূপ। এই ন্যায়দণ্ডধারী বরাভয়হস্ত যমরাজের বিশাল সাম্রাজ্য পাঁচটী রাজ্যে বিভক্ত। সেই পাঁচটী রাজ্যের

প্রত্যেকের রাজা যমরাজের মিত্ররাজ, সেই পাঁচ জন মিত্ররাজ যমরাজের পৃথক্ পাঁচ অঙ্গস্বরূপ।

স্বয়ং যমরাজের ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব, ইহাঁর পাঁচ জন মিত্ররাজের প্রত্যেকের ঐশ্বর্য্য ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই মন অমৃতের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যায়। সেই স্রোতের বেগ অতিক্রম করিয়া মন যেন ফিরিয়া আসিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে।

যমের প্রথম মিত্ররাজ্।

'যমরাজের প্রথম মিত্ররাজ ভগবান্ অহিংসাসিদ্ধ নামে ভুবন-বিখ্যাত। ভূমণ্ডলের নিখিল জীব ভীষণ মৃত্যুভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়া সকাতরে ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়া আছে। ইনি নিখিল জীবের ভয়ত্রাতা—অভয়দাতা! আহা! ইহাঁর নয়নে নিয়ত যেন অমৃতনদী বহিতেছে! ইহাঁকে দর্শন করিলেই হৃদয়ে মৃত্যুভয় থাকে না। এমন দয়াল মধুরমূর্ত্তি ত্রিভুবনে নাই। স্বয়ং বিষ্ণু এবং বুদ্ধদেব বহু তপস্যায় ইহাঁরই সালোক্য লাভ করিয়াছেন। দেখিতে পাই, ইহাঁর অধিকারে কোন জীব অন্য জীবের প্রাণ হিংসা করে না। এমন কি, কোনরূপে কেহ অন্যের প্রাণে আঘাত করে না, বেদনা দেয় না। এই মহাত্মার ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব, সমগ্র বিশ্বের নিখিল জীব ইহাঁরই শরণাগত, ইহাঁরই বশীভূত। ইহাঁর নিকটে ভীষণ শার্দ্দূল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করে; কাল সর্প ভেকের সহিত একত্র অবস্থিতি করে। ইহাঁর অতুল অক্ষয় ভাণ্ডার সর্ব্বজীবের অধিগম্য।

যিনি নিয়ত এই মহাপুরুষের ঐশ্বর্য্য ধ্যান করেন, তাঁহার চিত্তের উদ্বেগ থাকে না, তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া মৃত্যুকেও জয় করিতে পারেন। এস ভাই, ভগবান্ অহিংসাসিদ্ধের চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত করি।

যমের দ্বিতীয় মিত্ররাজ।

যমরাজের দ্বিতীয় মিত্ররাজ ভগবান্ সত্যসিদ্ধ নামে ভুবন-বিখ্যাত। এই মহাত্মার প্রভাব বা ঐশ্বর্য্য বর্ণনাতীত! ইনি সর্ব্বকার্য্যেই সফলতা লাভ করেন। ইহাঁর সকল বাক্যই সিদ্ধবাক্য। ফলতঃ ইহাঁরই বাক্যাবলি অমোঘ মন্ত্র নামে চরাচর-বিশ্রুত। ইহাঁরই বাক্যের প্রভাবে ঔষধ সমস্ত রোগনাশের শক্তি পাইয়াছে। ইহাঁরই বাক্যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ অব্যভিচারী নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ইহাঁরই নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতেছে। ফলতঃ এই বিশ্বে ইহাঁর বাক্য অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিবার সাধ্য কাহারও নাই। স্বয়ং ব্রহ্মা বহুতপস্যায় ইহাঁরই সালোক্য লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরই বাক্য বেদবাক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার বাক্যেও যদি অযুক্তি থাকে তথাপি ভগবান্ সত্যসিদ্ধের বাক্যে অযুক্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ইনি ইচ্ছা করিলে মৃতকেও সঞ্জীবিত করিতে পারেন। ফলতঃ পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতি ইহাঁরই বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করে। অতএব ইহাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব?

যমের তৃতীয় মিত্ররাজ।

যমরাজের তৃতীয় মিত্ররাজ ভগবান্ অস্তেয়সিদ্ধ নামে ত্রিলোক-বিশ্রুত। এই মহাত্মাই নিখিল জগতের সর্ব্বরত্নের অধিকারী। লক্ষ লক্ষ কুবের-ভাণ্ডার ইহাঁর নখাগ্রে লুক্কায়িত! ইনিই নিখিল জীবের ভাগ্যানুসারে তাহাদিগকে ভক্ষ্যভোজ্য ও বিষয়-সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিয়া থাকেন। এই মহাত্মাই সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব, ইনিই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি।

যমের চতুর্থ মিত্ররাজ।

যমরাজের চতুর্থ মিত্ররাজ ভগবান্ ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধ বা পরম-ব্রহ্মচারী নামে ভুবন-বিখ্যাত। এই ঊর্দ্ধরেতাঃ মহাত্মার প্রভাব অনন্ত! ইহাঁর পরাক্রমে ত্রিভুবন কম্পিত! ব্রহ্মতেজঃসমন্বিত এই মহাত্মার তেজস্বিতায় সহস্র সূর্য্যের তেজঃ পরাভূত হয়; অথচ ইনি কমনীয়তার আধার! এমন সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই! এই মহাত্মার পরম রমণীয় দেহজ্যোতিঃ ত্রিভুবন স্নিগ্ধ করে। আবার ইহাঁরই তৃতীয় নেত্রের প্রচণ্ড শিখায় সুরাসুরজয়ী দুর্দ্ধর্ষ মন্মথ নিমিষমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া থাকেন। ইহাঁর বিক্রমের কথা কি বলিব, ইনি এক একটা জগৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে অনায়াসে ধারণ করিতে পারেন। ইহাঁর পদভরে ভুবন কম্পিত হয়। যমরাজের সংহারদণ্ড ইহাঁরই

হস্তে ন্যস্ত, অথচ ইনি তৃণ অপেক্ষাও বিনম্র, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু। ইহাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা আর কত বলিব, ইনি অসীম তেজস্বিতা ও পরাক্রমের আধার, আবার ইনিই অনন্ত মাধুর্য্যের নিধান। ইহাঁর ঐশ্বর্য্য অনুধ্যান করিলে, ইহাঁর শরণাপন্ন হইলে, রোগ শোক পরিতাপ সমস্ত দূরীভূত হয়। মৃত্যুভয় অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয়। অনন্ত প্রীতির লহরী হৃদয়-কন্দর পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। বিশ্বসংসার অমৃতের সাগর বলিয়া চিত্ত তাহাতেই নিয়ত ভাসমান থাকে। বহু সাধনায় ইহাঁরই আরাধনা করিয়া দেবদেব ভগবান্ মহাদেব, দেবসেনাপতি কুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, মহাত্মা ভীষ্মদেব, এবং অষ্টাশীতি সহস্র ঋষি ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া ইহাঁরই সালোক্য লাভ করিয়াছেন। এস ভাই, এই ভগবান্ পরমব্রহ্মচারীর চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত করি।

যমের পঞ্চম মিত্ররাজ।

যমরাজের পঞ্চম মিত্ররাজ ভগবান্ অপরিগ্রহসিদ্ধ নামে ব্রহ্মাণ্ডবিখ্যাত। এই মহাত্মাই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বসৃষ্টির নিয়ন্তা। ইহাঁরই মহিমায় পরমাণু জীবাণুরূপে এবং সেই জীবাণু কালে ব্রহ্মার স্বরূপে পরিণত হইতেছে! এই মহাত্মাই মহাকাল নামেও বিখ্যাত। ইনিই জীবের জন্মান্তর-পরিগ্রহের নিয়ন্তা। কোন্ জীব কিরূপ কর্ম্ম করিয়া কিরূপ জন্মান্তর প্রাপ্ত হইবে, ইনিই তাহার হিসাবপত্র রাখিয়া থাকেন। ইহাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব,

ইনি ঐশ্বর্য্যে বিতৃষ্ণ, পরম সন্তুষ্ট, ইনি স্বার্থের অতীত। পরার্থে নিযুক্ত !

কিন্তু ভাই, চল চল, এখান হইতে চল, আমরা দূরে থাকিয়া ইহাঁকে প্রণাম করিয়া অন্যত্র যাই চল।

যমসাধন কি, তাহা বলিবার পূর্ব্বে যমসাধনসিদ্ধ যমরাজের ঐশ্বর্য্যাদির বর্ণনা করিলাম কেন ? তোমার মৃত্যুভয় তিরোহিত করিবার জন্য। মৃত্যুভয় মনুষ্যের মনকে যত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল করে, তত আর কিছুতেই করে না। অতএব মনোযোগ সাধনের পূর্ব্বে মৃত্যুভয় সঙ্কুচিত করা আবশ্যক। কিন্তু আমি যে যমরাজের বিষয় বলিলাম, এবং যমরাজের পঞ্চ মিত্ররাজের যেরূপ ঐশ্বর্য্যাদি প্রদর্শন করিলাম, তাহা বাহ্য দৃষ্টির বিষয় নহে ; উহা অন্তর্দৃষ্টির বিষয়। সাধনা না করিলে এই অন্তর্দৃষ্টির শক্তি জন্মে না। সুতরাং যাহা বলিলাম, তাহা সাধনাবিহীন চঞ্চলচিত্তের বোধগম্য নহে , ইহা জানিয়াও বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি ইহাতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসবীজও উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও সেই শ্রদ্ধাবীজ ক্রমে বীর্য্যে অর্থাৎ উৎসাহে পরিণত হইবে এবং সেই বীর্য্য বা উৎসাহ ক্রমে স্মৃতিরূপে পরিণত হইয়া সমাধি অর্থাৎ একাগ্রতা লাভ হইবে।

যাহা হউক্, যাহা বলিলাম, তাহাতে তোমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস জন্মিয়াছে কি না, তাহাও জানি না। যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবীজও লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার যোগসিদ্ধি অতি নিকটবর্ত্তী জানিও। তাহা হইলে তুমি সত্বরই যোগরূপ মহাবৃক্ষে আরোহণ করিয়া অভিলষিত

ফল লাভ করিতে পারিবে। আর যদি শ্রদ্ধা না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও তুমি নিরাশ হইও না। সাধনা দ্বারাও শ্রদ্ধা জন্মিবে। তবে শ্রদ্ধা জন্মিলে সাধনা অতি সহজ-সাধ্য হয়, নতুবা কিছু দুরূহ বা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাই অনুরাগের জননী। অনুরাগ দুর্গম পথও সুগম করিয়া দেয়। সামান্য উদাহরণ দিলেও একথা বুঝিতে পারিবে।

যে ছাত্রের যে বিষয়ে অনুরাগ আছে, সে তাহাতে শীঘ্রই ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারে। সমস্ত দিন গাড়ি টানিয়া অতিক্লান্ত গোরুও মহা উৎসাহের সহিত সন্ধ্যার সময় গাড়ী লইয়া বাড়ীর দিকে দৌড়িতে থাকে। বাড়ীর প্রতি তাহার অনুরাগ আছে বলিয়াই সে তদ্রূপ করিতে পারে। কিন্তু গোরু বাড়ী ছাড়িয়া বোঝা লইয়া অন্যত্র যাইতে বড়ই নারাজ ! তাহাকে ঠেঙ্গাইয়া পিটাইয়া লইয়া যাইতে হয়। তদ্রূপ শ্রদ্ধাহীন সাধনাও অতি ক্লেশকর।

অতএব বলি, আশা কর। আশায় নির্ভর করিয়া সাধনায় নিযুক্ত হও। যতই কষ্টকর বোধ হউক্, সাধনা পরি-ত্যাগ করিও না। প্রথমে একটু কষ্টস্বীকার করিলেই রসবোধ জন্মিবে, রসবোধ হইতে বিশ্বাস জন্মিবে, তখন আর ক্লেশ করিতে হইবে না।

অতঃপর যমসাধনের বিষয় বলিতেছি ; ইহার অর্থ মনোযোগ দিয়া বুঝিলেই পূর্ব্বোক্ত যমরাজের মহিমাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাও কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবে। কিঞ্চিৎ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সাধনা না

করিলে সম্যক্ বুঝিবার শক্তি জন্মিবে না। যাহাহউক, এখন তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বুঝিতে পার, তাহাই যথেষ্ট। অতএব শুন ;—

যম-সাধন।

যম কাহাকে বলে?

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ।

(১) অহিংসা। (২) সত্য। (৩) অস্তেয়। (৪) ব্রহ্মচর্য্য। (৫) অপরিগ্রহ। এই পাঁচটীর নাম যম।

সাধন কাহাকে বলে ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব যমসাধন বলিলে কি বুঝায়, তাহা বলা বাহুল্য হইলেও বলিতেছি ;—

অহিংসা-সাধন, সত্যসাধন, অস্তেয়-সাধন, ব্রহ্মচর্য্য-সাধন, এবং অপরিগ্রহ-সাধন, এই পঞ্চ সাধনের নামই যম-সাধন।

ইহা অপেক্ষাও আরও একটু বাহুল্যরূপে বলিতেছি ;—

অহিংসা অভ্যাস, সত্য অভ্যাস, অস্তেয় অভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস এবং অপরিগ্রহ অভ্যাস, এই পাঁচ প্রকার অভ্যাসের নামই যমসাধন।

(১) অহিংসা।

অহিংসা কি?

মনোবাক্‌কায়ৈঃ সর্ব্বভূতানামপীড়নং অহিংসা।

কোনজীবের প্রাণে আঘাত না করাকে অহিংসা বলে। কোন প্রাণীর প্রাণবধ করিলে কিংবা কোনরূপে কোন

প্রাণীর প্রাণে বেদনা দিলেই হিংসা করা হয়। সেই হিংসা না করাকেই অহিংসা বলে। এই হিংসা, শরীর দ্বারা, বাক্য দ্বারা এবং মন দ্বারাও করা যায়। অর্থাৎ শারীরিক চেষ্টা দ্বারা প্রহারাদি করিয়া হিংসা করা যায়; দুর্ব্বাক্য বলিয়াও হিংসা করা যায়; এবং মনে মনে পরের অনিষ্ট চিন্তা করিয়াও হিংসা করা যায়। অতএব হিংসা কায়িক বাচিক ও মানসিক তিন প্রকার। এই তিন প্রকার হিংসা পরিত্যাগ করিলে অহিংসা সাধন করা হয়। হিংসা স্বয়ং করা যায়, অন্যের দ্বারাও করান যায়, এবং অন্যে হিংসা করিলে অনুমোদন করাও যায়। অতএব এরূপেও হিংসা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত। এই তিন প্রকার হিংসাও পরিত্যাগ করিলে অহিংসা সিদ্ধ হয়। এই হিংসা লোভহেতু, মোহহেতু (অজ্ঞানতাহেতু), এবং ক্রোধহেতু হইতে পারে। এই হিংসার মাত্রা অর্থাৎ পরিমাণও মৃদু, মধ্য এবং অধিক হইতে পারে। এই হিংসার ফল অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞানতা।

এখন হিংসা কি এবং অহিংসাই বা কি, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা কর।

(২) সত্য।

সত্য কি?

পরম যোগীর সত্য, একমাত্র "সচ্চিদানন্দ"। তদ্ভিন্ন সকলই মিথ্যা। কিন্তু সে কথা থাক্। তোমার সত্য কি, বলি শুন;—

পরহিতার্থং বাঙ্মনসোর্যথার্থত্বং সত্যম্ ।

পরহিতের জন্য বাক্য ও মনের যে যথার্থ ভাব তাহাই সত্য।

যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, তদ্রূপ বলার নাম সত্য। অর্থাৎ যেমন দেখা যায়, যেমন শুনা যায়, যেমন বুঝা যায়, ঠিক্ তদনুরূপ কথার নাম সত্য। যাহা মিথ্যা নহে, তাহাই সত্য। মিথ্যাও কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে তিন প্রকার হইতে পারে। মিথ্যাও কৃত, কারিত, এবং অনুমোদিত হইতে পারে। ইহা। লোভ মোহ এবং ক্রোধজ হইতে পারে। মিথ্যাও মৃদু, মধ্য ও অধিক হইতে পারে। মিথ্যারও ফল অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞানতা।

এখন সত্য কি, এবং মিথ্যা কি, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা কর।

(৩) অস্তেয়।

অস্তেয় কি ?

পরদ্রব্যাপহরণত্যাগোঽস্তেয়ম্ ।

অচৌর্য্যের নাম অস্তেয়; অর্থাৎ চুরি না করাকেই অস্তেয় বলে। পরদ্রব্য হরণের নাম চৌর্য্য বা স্তেয়। মনেও পরদ্রব্য হরণের ইচ্ছা করিলে চৌর্য্য-পাপ জন্মে। অতএব কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ স্তেয় পরিত্যাগের নামই অস্তেয়। চৌর্য্যও কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত হইতে পারে। ইহাও লোভমোহক্রোধজভেদে

তিন প্রকার হইতে পারে এবং ইহার পরিমাণ, মৃদু, মধ্য ও অধিক হইতে পারে। এই স্তেয় অনন্ত. দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞানের হেতু বা নিদানস্বরূপ।

(৪) ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য কি ?

বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।

বীর্য্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিচলিত ও অবিকৃত রাখিবার জন্য কামপ্রবৃত্তির সম্যক্ দমনকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। কাম-প্রবৃত্তি-সহকারে স্ত্রীলোকের রূপ দর্শন করা, রূপগুণাদির কথা শ্রবণ করা বা কীর্ত্তন করা, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া করা, স্ত্রীলোকের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহা প্রভৃতিও মৈথুনের অঙ্গ; তদ্দ্বারাও বীর্য্য স্থানভ্রষ্টও বিকৃত হয়; সুতরাং উক্ত দর্শনশ্রবণাদিও পরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

মৈথুনও কায়িক, বাচিক, মানসিক হইতে পারে। ইহাও কৃত, কারিত, অনুমোদিত হইতে পারে। ইহাও মৃদুমধ্যাধিমাত্রভেদে তিন প্রকার এবং ইহারও ফল অনন্ত মোহ এবং অনন্ত দুঃখ।

(৫) অপরিগ্রহ।

অপরিগ্রহ কি ?

দেহরক্ষাতিরিক্ত-ভোগসাধনা-
স্বীকারোঽপরিগ্রহঃ।

দেহ-রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। কিন্তু ইহা মহা-যোগীর সাধ্য। দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ, বিলাসসাধন দ্রব্য পরিত্যাগ এবং যাচ্ঞা পরিত্যাগ করাকেই তুমি অপরিগ্রহ বলিয়া জান।

যমসাধন সাধ্য কি অসাধ্য।

এখন তুমি অবশ্য অহিংসা কি, সত্য কি, অস্তেয় কি, ব্রহ্মচর্য্য কি, এবং অপরিগ্রহ কি, তাহা সম্যক্ না পার, কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছ। তুমি যে পর্য্যন্ত বুঝিয়াছ, তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

এই পঞ্চাঙ্গ যমসাধনই যোগসাধনের সর্ব্ব প্রথম সুতরাং সর্ব্ব প্রধান সাধন। স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন জন্য যে মনোযোগের প্রয়োজন, সেই মনোযোগেরও প্রথম সাধন এই যমসাধন। মহাসমুদ্রগামী অর্ণবপোতও যেরূপ, ক্ষুদ্র নদীর তরণীও তৎসদৃশ। পরিমাণের পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই অনুরূপ। বালকবালিকাদের খেলা-ঘরের আয়ো-

জন আড়ম্বর, গৃহস্থের গৃহের আয়োজন আড়ম্বরের সদৃশ। তবে গৃহস্থ তামা-রূপা-সোনার মুদ্রা ব্যবহার করে; বালক-বালিকারা খোলাকুচিকেই মুদ্রা মনে করিয়া বিনিময় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া প্রস্তাব-বাহুল্য করিতে চাহিনা। ইঙ্গিতমাত্রেই অনেক কথা বুঝিতে হইবে। তুমি বুঝিতে পার আর নাই পার, কিন্তু ইঙ্গিতজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রীতির জন্যও অন্ততঃ আমাকে এরূপ ইঙ্গিত করিতে হইতেছে।

তোমার যোগসাধন বা মনোযোগ সাধন প্রকৃত-প্রস্তাবে খেলা-ঘরের যোগসাধন। যেহেতু ইহার উদ্দেশ্য অতি ক্ষুদ্র। অতএব তোমার পক্ষে যে যমসাধনের প্রয়োজন, তাহাও অতি অনায়াস-সাধ্য। অতএব তুমি যেন নিরাশ হইয়া পলায়ন করিও না।

জানিয়া রাখ, সাধনার সীমা নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও অদ্যাপি সাধনা করিতেছেন। অনন্তজীবনের তুলনায় শতবর্ষ আয়ুঃ মুহূর্ত্ত বলিয়াও গণ্য নহে; অতএব আমাদের আয়ুঃকাল সাধনার পক্ষে নিতান্তই নগণ্য। তবে যে ক্ষুদ্রশিশু যৌবন প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীতে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বিচরণ করিবে, এখন সে যদি "হাঁটি-হাঁটি-পা-পা" করিয়া দুই এক পাও অগ্রসর হয়, তবে যেমন তাহাকে সকলেই বাহবা দিয়া থাকে, এবং ভবিষ্যতে সে যে পঙ্গু হইবে না, এই আশায় সকলেই যেমন আনন্দ প্রকাশ করে, তদ্রূপ তুমিও যদি এখন এই অনন্ত যোগসাধন-পথে "হাঁটি-হাঁটি-পা-পা" করিয়া বিতস্তিমাত্রও অগ্রসর হইতে

পার, তাহা হইলেও তোমাকে আমি মহাপুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিব। এবং তুমিও সিদ্ধিলাভে বা উদ্দিষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইব।

অতএব অহিংসাদির সংজ্ঞা দেখিয়াই তুমি আপনাকে অসমর্থ মনে করিও না। তুমি বলিও না,—

"অহিংসা সাধন আমার অসাধ্য"। ঐ দেখ, তোমার সম্মুখে একব্যক্তি স্বীয় জন্মদাতা পিতাকে পাদুকা প্রহার করিতেছে! ঐ দেখ, একব্যক্তির জননী আসিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুত্রের নিকট কিছু ভিক্ষা করিতেছে, কিন্তু পুত্র প্রহার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছে। ঐ দেখ, একব্যক্তি গলিত-কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়াও গোরুর গলায় ছুরি বসাইতেছে! তুমি উক্ত তিন জনকেই পাপাত্মা পামর বলিয়া ঘৃণা কর কেন? উহাদের তিন জনের অপেক্ষা তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত একটু সুকৃতি বা সাধনা অধিক আছে বলিয়াই তুমি পিতা-মাতার প্রতি তদ্রূপ নিষ্ঠুরাচরণ কর না এবং গোহত্যাও কর না। তুমি উক্ত তিন ব্যক্তির তুলনায় অসাধারণ ব্যক্তি এবং পুণ্যাত্মা। উক্ত ত্রিবিধ এবং তদ্রূপ বহুল অতিমাত্র হিংসার হস্ত হইতে তুমি পরিত্রাণ বা মুক্তি লাভ করিয়াছ। কিন্তু তুমি মধ্যমাত্রার বহু সহস্র এবং মৃদুমাত্রার বহু লক্ষ হিংসাপাপে লিপ্ত রহিয়াছ। তুমি যেমন উক্ত তিন ব্যক্তিকে পামর ও পাপাত্মা বলিয়া ঘৃণা কর, তোমাকেও অপেক্ষাকৃত উচ্চসাধকেরা প্রায় তদ্রূপ পামর ও পাপাত্মা বলিয়া মনে করেন। অতএব তোমারও সাধনার প্রয়োজন। তুমি পিতৃহিংসা, মাতৃহিংসা ও গোহিংসা

হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ ;—বহুজন্মের সাধনার ফলেই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ। কিন্তু ইহজন্মে সাধনার উন্নতি করিতে নিবৃত্ত থাকিবে কেন ? অতএব ইহ জন্মেও আরও কতকগুলি হিংসা হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা কর। যতদূর পার তাহাই ভাল। এই সামান্য সাধনাও পুরুষকার। এই সাধনাই সুকৃতি। এই সাধনাই অনন্ত দুঃখের হ্রাস-কারক এবং অনন্ত সুখের বীজস্বরূপ। এই সাধনাই ধর্ম্ম। এই সাধনাই পরকালের সম্বল। অথবা যাউক্, পরকাল দূরে থাক্ ; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, এই সাধনাই স্মরণশক্তির উৎকর্ষ-বিধায়ক। যদি বল, অহিংসাদি যমসাধনের সঙ্গে স্মরণ-শক্তির সম্বন্ধ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর পরে দিব। ফলতঃ, যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যে কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না, তাহা তোমাকে গ্রাহ্য করিতে বলিতেছি না।

এখন এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, অহিংসাদি যম-সাধন তোমার অসাধ্য নহে।

এই অহিংসাদি যমসাধনের ফল কি, তাহা বলিতেছি শুন ;—

যমসাধনের ফল।

অহিংসা সাধনের ফল কি ?

অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

অহিংসা-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে শত্রুতাচরণের আশঙ্কা থাকে না। যে পরিমাণে এই অহিংসা সিদ্ধ হয়, সেই পরিমাণেই হিংসাজনিত উদ্বেগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি

লাভ করা যায়। যে পরিমাণে চিত্তের উদ্বেগ প্রশমিত হয়, সেই পরিমাণেই. মনের একাগ্রতা লব্ধ হয়; এবং সেই পরিমাণেই স্মরণ-শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা যায়। যে মহাত্মা অহিংসা-সাধনে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই যমরাজের প্রথম মিত্ররাজের সালোক্য * লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব যমের প্রথম মিত্ররাজের বিষয় এক্ষণে আবার পাঠ করিয়া দেখ। তাহা হইলেই অহিংসা-সাধনের ফল কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

•সত্যসাধনের ফল কি ?

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।

সত্যসাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে অনুষ্ঠিত সর্ব্বকার্য্যেরই ফল লাভ করা যায়। অর্থাৎ সত্যবাদী সকল কার্য্যেই কৃত-কার্য্য হইয়া থাকেন। সত্যের ফলে বাক্‌সিদ্ধিও লাভ হয়। অর্থাৎ যিনি সত্যবাদী, তাঁহার বাক্য অমোঘ বা অব্যর্থ। যিনি সত্যবাদী, তাঁহার মনে মৃত্যুর আশঙ্কাও থাকিতে পারে না। তিনি নিরুদ্বেগ; সুতরাং যোগসাধন তাঁহার অনায়াস-সাধ্য। যে মহাত্মা এই সত্যসাধনে চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, তিনিই যমরাজের দ্বিতীয় মিত্ররাজের সালোক্য লাভ করেন। তাঁহার মহিমা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; এই সময় আবার তাহা পাঠ করিয়া দেখ। তাহা হইলেই সত্যের মহিমা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

---

* সমান লোক বা সমান স্থান।

অস্তেয় সাধনের ফল কি ?

অস্তেয়-প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ।

অস্তেয় অর্থাৎ অচৌর্য্য সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সর্ব্ব-রত্ন লাভ হয়। অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে যিনি পরদ্রব্য-হরণের চেষ্টা করেন না, তাঁহার কোন অভাব থাকে না, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে পারেন। তাঁহার মন তৃপ্তির সাগর-স্বরূপ। তাঁহার চিত্তে কোন উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য থাকে না, সেই জন্য তিনি সহজেই যোগসাধন করিতে পারেন। যে মহাত্মা এই অস্তেয়-সাধনে চরমোৎ-কর্ষ লাভ করিতে পারেন, তিনি যমরাজের তৃতীয় মিত্র-রাজের স্থানীয় হইয়া অতুল প্রভাবসম্পন্ন হইতে পারেন। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত যমরাজের তৃতীয় মিত্ররাজের ঐশ্বর্য্য পুনরায় পাঠ করিয়া অস্তেয়-সাধনের মহিমা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম কর।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনের ফল কি ?

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।

বীর্য্যশব্দে শুক্র, শৌর্য্য, উৎসাহ, সামর্থ্য প্রভৃতি বুঝায়; ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা সেই সমস্তই লাভ করা যায়। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের ফল অশেষ, অনন্ত, বর্ণনাতীত! ইতঃ-পূর্ব্বে যমরাজের যে চতুর্থ মিত্ররাজের কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য বা প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে পুনরায় পাঠ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম কর।

অপরিগ্রহ সাধনের ফল কি ?

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তা-সংবোধঃ।

অপরিগ্রহসাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে "কিরূপে জন্ম হয়" তাহা বোধগম্য হয়, অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্ম-সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে। অপরিগ্রহ-সাধনে "জাতিস্মর" হওয়া যায়। কিন্তু তোমার জাতিস্মর হওয়া যখন উদ্দেশ্য নহে, সামান্য স্মরণশক্তির উৎকর্ষই উদ্দেশ্য, তখন যমের পঞ্চম মিত্ররাজ ভগবান্ অপরিগ্রহসিদ্ধের প্রভাব সম্যক্ ধারণা করা তোমার সাধ্যাতীত হইবে। ফলতঃ, সেই মহাত্মার মহিমা অতীব গহন বলিয়াই তোমাকে ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, "দূর হইতে এই মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চল," এ কথার তাৎপর্য্য পরে পরিস্ফুট হইবে। এখন আর অধিক বলিতে চাই না। কেননা এখন বলিলে তুমি আমার নিকটে আর তিলার্দ্ধ সময়ও অপেক্ষা করিতে পারিবে না; নিরাশ হইয়া প্রস্থান করিবে। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, এই অপরিগ্রহসাধন অতি কঠোর বলিয়া, অতি দুঃসাধ্য; এবং অতি দুঃসাধ্য বলিয়াই অতি ভীষণ! সংসারী ব্যক্তির কথা দূরে থাক্, বনস্থ যে যোগী অনায়াসে সিংহশার্দ্দূলাদি ভীষণ জন্তুগণকেও বশীভূত করিতে পারেন, এবং তদপেক্ষাও ভীষণতর ইন্দ্রিয়গণকেও যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, এবং তাহাদের অপেক্ষাও ভীষণতম স্বীয় কুপ্রবৃত্তিরূপ রিপুগণকেও যিনি বশীভূত করিতে পারেন; তিনিও সহজে অপরিগ্রহসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। অধিক আর

কি বলিব, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও বোধ করি এই অপরিগ্রহ সাধনে অদ্যাপি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। অতএব তোমার কাছে অপরিগ্রহসাধনের কথা বলাই বিড়ম্বনামাত্র। তবে বলিতেছি কেন ? শুন; যে সাধন যে পরিমাণে কঠোর, সেই সাধনের ফলও সেই পরিমাণে মহৎ। অপরিগ্রহসাধনের ফল অমৃতের অনন্ত মহাসাগর। তুমি সেই অমৃতের বিন্দুমাত্র লাভ করিতে পারিলেও পার্থিব অনেক রাজার অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ হইতে পার। অতএব অপরিগ্রহরূপ মহাসাধনের অণুমাত্র সাধনই তোমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধিবিষয়ে যথেষ্ট হইবে।

যমসাধনের প্রয়োজন কি ?

স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধনই আবশ্যক। অতএব যোগেরই বা প্রয়োজন কি, এবং যমসাধনেরই বা প্রয়োজন কি ? এ প্রশ্ন সহজেই তোমার মনে উদিত হইতে পারে।

পঞ্চাঙ্গ যমসাধনের বিষয় তোমাকে বলিয়াছি। প্রত্যেক সাধনের ফল ও মাহাত্ম্য বলিয়াছি। সেই সমস্ত ফলের সমষ্টি করিলে সমগ্র যমসাধনের ফল কত হয়, তাহাও স্বয়ং যমরাজের ঐশ্বর্য্যে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু "যমরাজ অত্যন্ত মনোযোগী" কিংবা "যমরাজ অত্যন্ত স্মরণশক্তি-শালী" একথা বলি নাই। সুতরাং যমরাজ পৃথিবীর আধিপত্য লাভই করুন্ বা স্বর্গের ও নরকের দ্বাররক্ষকই হউন্, তাহা শুনিবার প্রয়োজন কি ? এই পঞ্চাঙ্গ যমসাধনের সহিত স্মরণশক্তির ত কোন সম্পর্কই দেখি না। তবে

এ সকল বাজে কথায় কাজ কি? যে কথা আমার উদ্দেশ্য-সাধক নহে, সে কথা শুনিবার প্রয়োজন কি? এই সকল ভাব ও প্রশ্ন তোমার মনে সহজেই উদিত হইয়াছে। তুমি অস্থির হইয়াছ; পলায়নের চেষ্টা করিতেছ; অতএব আর বিলম্ব করা উচিত নহে। স্মরণশক্তির সহিত যমসাধনের সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইয়া দিতেছি শুন; অগ্রে মনোযোগের সহিত স্মরণশক্তির সম্বন্ধ কি, তাহাই বলিয়া পরে মনো-যোগের সহিত যমসাধনের সম্বন্ধ কি, তাহা বলিব। তাহা-হইলেই তুমি যমসাধনের সহিত স্মরণশক্তির সম্বন্ধ সহজেই ঠিক্ করিয়া লইতে পারিবে।

মনোযোগের সহিত স্মরণশক্তির সম্বন্ধ কি?

মনোযোগের সহিত স্মরণশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রয়োজন নাই। স্কুলের একটী ভাল ছাত্র, প্রত্যহ উত্তমরূপে পড়া মুখস্থ বলে। কিন্তু এক দিন সে ভাল করিয়া পড়া মুখস্থ করিতে পারে নাই বলিয়া শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিন্, আজ তোমার পড়া মুখস্থ হয় নাই কেন?"

পুলিন্‌বিহারী উত্তর করিলেন,—"মহাশয়, অন্যদিন যত-ক্ষণ বসিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া থাকি, আজ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিকক্ষণ পড়া মুখস্থ করিলেও আজ আমার পড়া মুখস্থ হয় নাই; ইহার কারণ কি আমি জানি না। তবে আজ আমার মনটা কিছু উদ্বিগ্ন ছিল। আমাদের প্রতি-বেশী হরচন্দ্র মণ্ডল বাবাকে ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী

করিয়া শমন ধরাইয়া গিয়াছিল। তাহাতেই আমি উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলাম। মনদিয়া পড়িতে পারি নাই। যখনই পড়ি, তখনই মনে হয়, বাবার যদি মেয়াদ হয়, তবে আমাদের উপায় কি হইবে? কিন্তু আমি ভাবিয়া কি করিব, বাবাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার নাই; এই বলিয়া মন সুস্থির করিয়া পড়িতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুতেই পড়ায় আমার মনোযোগ হইল না। কোথা হইতে কে যেন আমার মনে কেবল এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, "বাবার যদি মেয়াদ হয়!" এই উদ্বেগ হইতে আমি কিছুতেই মন-স্থির করিতে পারি নাই।"

সুবিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয় পুলিনের কথা শুনিলেন; এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন;—

"পুলিন্ যেমন বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী, তেমনই সত্যবাদী। কিন্তু হায়! ইহার পিতা প্রতিবেশীদিগের অনিষ্ট-চেষ্টায় নিয়ত বিব্রত! পুলিন্ আজ পড়া মুখস্থ করিতে পারে নাই কেন, তাহার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করিয়াছে। মন যদি উদ্বিগ্ন থাকে, তবে মনোযোগ দিয়া কোন কাজ করাই যায় না। মন উদ্বিগ্ন থাকিলে মনোযোগ দিয়া পাঠ অভ্যাস করা নিতান্তই অসাধ্য। মনোযোগ না দিয়া সহস্রবার পড়িলেও কোন ফল হয় না। উদ্বেগই মনোযোগের প্রধান প্রতিবন্ধক। আত্মীয়ের বিপদাশঙ্কাই এখানে উদ্বেগের কারণ। কিন্তু অনিষ্টচেষ্টা বা হিংসাই সেই বিপদের মূল কারণ। পিতার হিংসা-প্রবৃত্তির ফল পুত্রও ভোগ করে। এরূপ হিংসাকে ধিক্! আমি এই সুবোধ পুলিনের শাস্তি

বিধান করিয়া তাহার মনে কষ্ট দিতে পারিব না। যদিও বুঝিতেছি, শাস্তি না দিলে অন্যান্য বালকেরা প্রশ্রয় পাইবে এবং পড়া মুখস্থ করিতে পারিলেও করিবে না, তথাপি এই পুলিন্‌কে শাস্তি দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। হিংসা যে বিপদের কারণ, এবং বিপদ্ যে উদ্বেগের কারণ, এবং উদ্বেগ যে অমনোযোগের কারণ, আর অমনোযোগই যে বিস্মরণের কারণ, ইহাই আমি অদ্য সমস্ত ছাত্রকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিব।"

শিক্ষক মহাশয় এইরূপ মনে করিয়া স্কুলের বালকদিগকে যে সকল উপদেশ দিলেন সে সমস্ত এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে দিন পুলিনের পড়া মুখস্থ হয় নাই, তৎপর দিন স্কুলের আর একটী উত্তম বালকেরও পড়া মুখস্থ হয় নাই। তাহার নাম নৃত্যগোপাল। শিক্ষক মহাশয় হস্তস্থিত বেত্র উদ্যত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৃত্য, বলি তোর আজ পড়া মুখস্থ হয় নাই কেন রে?"

নৃত্যগোপাল বলিলেন ;—

"মহাশয়, আমার পিতা পুলিনের বাপের সপক্ষে কি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। সেই জন্য হাকিম তাঁহার ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জরিমানার টাকা দিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে সাত দিনের জন্য কারাগারে দিয়াছেন। সেই জন্য আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাই পড়া মুখস্থ করিতে পারি নাই। মহাশয়, আপনি গত কল্য হিংসার বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। আমার সে সমস্ত মনে আছে। পিতার হিংসার পাপের ফল পুত্রও

ভোগ করে, তাহাও দিয়াছি; আজ আবার বুঝিলাম যে, প্রতিবেশীর হিংসাপাপের ফলও প্রতিবেশীকে ভোগ করিতে হয়। দেখুন, আমার পিতার কোন অপরাধ নাই। তিনি পুলিনের বাপকে শাস্তির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই কি সামান্য দুই একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কি বিষম শাস্তি হইল! ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হইলে আমাদিগকে কিছুকালের জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত; যেহেতু আমরা অতি গরীব! পুলিনের পিতা আমাদের অনেক উপকার করিয়া থাকেন। তাঁহাকে বিপদের সময় সাহায্য করা আমাদের অবশ্যই কর্ত্তব্য। আমি পিতার মুখে শুনিয়া ছিলাম যে "রাজদ্বারে শ্মশানেচ য স্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" আমার পিতা এই নীতি অনুসারেই কাজ করিয়াছেন। তিনি কোনরূপে কিছুমাত্র পাপ করেন নাই। এরূপ নির্দ্দোষ পিতা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে। আমি পড়িবার সময় অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়াছি, বাড়ীর সকলেই কাঁদিতেছেন। আমি ইচ্ছা করিয়া পড়া মুখস্থ করিতে অবহেলা করি নাই। আমি বিলক্ষণ জানি, পড়া মুখস্থ করিতে আলস্য করিলে সংসারে আমার দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু মহাশয়, আজ আমি শত চেষ্টা করিয়াও পড়া মুখস্থ করিতে পারি নাই। এজন্য আপনি আমাকে যে শাস্তি দিবেন, আমি তাহা সহ্য করিব। যেহেতু আমি আজ যে শাস্তি পাইয়াছি, আপনি তদপেক্ষা আর অধিক শাস্তি আমাকে দিতে পারিবেন না।"

নৃত্যগোপালের কথা শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে, নৃত্যগোপালকে শাস্তি দিবেন, নৃত্যগোপালের কোনওরূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া ছিলেন। কল্য পুলিনের পড়া হয় নাই বলিয়া তিনি কোন কাজই করিতে পারেন নাই। অহিংসা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্যই তাঁহাকে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। আজ সেই জন্য তাঁহার আর কোন ওজর আপত্তি শুনিবার তত ইচ্ছাও ছিল না। ওজর আপত্তি শুনিতে গেলে কাজের অনেক ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ ছাত্রেরাও তাহা হইলে নূতন নূতন ওজর আপত্তি আনিয়া উপস্থিত করে এবং ক্রমশই তাহারা প্রশ্রয় পাইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি করে। এই সকল বিবেচনা করিয়াই শিক্ষক মহাশয়, বেত্র উদ্যত করিয়াই নৃত্যগোপালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "নৃত্য, বলি তোর্ আজ পড়া মুখস্থ হয় নাই কেন রে?" কিন্তু শিক্ষক মহাশয় সেকালের নির্দ্দয় গুরুমহাশয়ের মত কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য বা হৃদয়-বিহীন নহেন। তিনি অত্যন্ত সহৃদয়; সুতরাং নৃত্য-গোপালের কথাগুলি তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। নানাভাবে তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। তিনি বহুক্ষণ নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নৃত্যগোপালের পিতা দোষী, কি নির্দ্দোষ? নির্দ্দোষ ব্যক্তি যদি শাস্তি পায়, তবে ত সংসার প্রকৃতই অতি ভীষণ নরক! এ নরকে তবে ত পাপপুণ্যের বিচার করা অতীব দুষ্কর! একজন হিংসা করিল, সে অবশ্য

শাস্তি পাইবার উপযুক্ত; তাহার পুত্রেও আত্মজ বলিয়া যেন শাস্তি পাইবার উপযুক্ত; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার সন্নিহিত-বাসীও কি শাস্তির উপযুক্ত? নৃত্যগোপালের পিতা কি তজ্জন্যই শাস্তি পাইয়াছে? অথবা মিথ্যা বলার জন্য শাস্তি পাইয়াছে? কিন্তু এরূপ স্থলেও মিথ্যা বলাতে পাপ হয় বলিয়া বোধ হয় না! উপকারীর প্রত্যুপকার না করা ত কৃতঘ্নের কাজ। কৃতঘ্ন ব্যক্তির পাপের ইয়ত্তা নাই। রাজদ্বারে বিপন্ন উপকারীর সপক্ষে যদি সাক্ষ্য দেওয়া যায়, আর তজ্জন্য যদি সত্যের অপলাপ করাও আবশ্যক হয়, তাহা হইলেও নীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা সেই সত্যের অপলাপকে মিথ্যা পাপ বলিয়া গণ্য করেন না। অধিক কি, এরূপ অনেক স্থলে মিথ্যা কথা বলিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেই নীতিশাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থা কি ভ্রান্ত? এইরূপ শত শত প্রশ্ন মনে উদিত হইয়া শিক্ষক মহাশয়কে সে দিন অভিভূত করিল। তিনি নিজেই নানা সংশয়ে অভিভূত; সুতরাং তাঁহার আর উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"দেখ, কাল যেন সকলেরই পড়া মুখস্থ হয়, আমি কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি শুনিব না। বাবার ফাঁসী হইয়াছে, একথা বলিয়াও কেহ রেহাই পাইবে না। পড়া মুখস্থ না করিলে আমি এই বেত্রাঘাতে পিঠের চামড়া মাংস ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিব। তোদের বাবাদের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতে চাই না। আমি

আমারই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিব। পড়া মুখস্থ না হইলেই আমি শাস্তি দিব।"

এই বলিয়া শিক্ষক মহাশয়, সকল ছাত্রকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু নৃত্যগোপালকে আর শাস্তি দিলেন না।

তথাপি তৎপরদিনও আর একটী ছেলে পড়া মুখস্থ করিয়া আসে নাই। শিক্ষক মহাশয় তাহাকে সক্রোধে বলিলেন ;—

"হাঁরে, সুরে ! তুই পড়া মুখস্থ করিস্ নাই কেন ?"

শিক্ষক মহাশয়ের এই একটী অসীম গুণ যে, কারণ না জানা পর্য্যন্ত ক্রোধের কার্য্য সংযত রাখিতে পারেন। সেই জন্য তিনি আজি অসীম ক্রোধকেও সংযত রাখিয়া সুরেন্দ্র-নাথকে উক্ত প্রশ্নটী করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ উত্তর করিল ;—

"মহাশয়, বলিব কি, বলিলেও আপনি শুনিবেন না। সুতরাং আমি সকল কথা বলিতে চাই না, তবে এইমাত্র সত্য বলিতেছি যে, আমি পড়া মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াও পড়া মুখস্থ করিতে পারি নাই।"

শিক্ষক মহাশয়, সুরেন্দ্রের কথা শুনিয়া আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না ; সপাসপ্ করিয়া দুই চারি ঘা বেত্রাঘাত করিয়া বলিলেন,—

"হাঁরে পাজি, চেষ্টা করিলেও পড়া মুখস্থ করা যায় না, একথাও কি কখনও সত্য হইতে পারে ?"

শিক্ষক মহাশয়ের বেত্রাঘাত পাইয়া সুরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন দেবেন্দ্র নামক একটী উত্তম বালক উঠিয়া বলিল,—

"পণ্ডিতমহাশয়, আমি জানি, সুরেন্দ্র পড়া মুখস্থ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। সে আজ সকালে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমারই বই দেখিয়া পড়া মুখস্থ করিয়াছিল। আমি কল্য রাত্রিতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই যে পড়া মুখস্থ করিয়াছিলাম, সুরেন্দ্র আমাদের বাড়ীতে আসিয়া দুই ঘণ্টাতেও তাহা ভাল মুখস্থ করিতে পারে নাই। কল্য দারোগা বাবু আসিয়া উহাদের যথাসর্ব্বস্ব পুলিশে লইয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রের পিতা, অনেক দিনের কথা, একবার চুরি অপরাধে একমাস মেয়াদ খাটিয়া ছিলেন। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে প্রায়ই দারোগা বাবু আসিয়া উহাদের বাড়ীতে খানাতল্লাসি করেন; এবং সময়ে সময়ে যাহা কিছু পান, সমস্ত পুলিশে লইয়া গিয়া থাকেন। ফলতঃ গ্রামের মধ্যে কাহারও কোন দ্রব্যাদি চুরি হইলেই, দারোগা বাবু আগে আসিয়া সুরেনের বাপকেই গ্রেপ্তার করেন; এবং তাঁহার ঘর তল্লাস করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া যান। সেই জন্যই কল্য বৈকালে দারোগা বাবু উহাদের বাড়ীতে আসিয়া অনেক দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে সুরেনের পড়ার বইগুলিও ছিল। সুতরাং পুস্তকের অভাবে কল্য রাত্রিতে সুরেন্ পড়া মুখস্থ করিতে পারে নাই। অদ্য সকালে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পড়া মুখস্থ করিয়াছিল। কিন্তু দেখিতেছি, সুরেন্ ভাল করিয়া পড়া মুখস্থ করিতে পারে নাই।"

দেবেন্দ্রের কথা শুনিয়া শিক্ষক মহাশয়ের ক্রোধ প্রশমিত হইল। তিনি গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে

লাগিলেন। চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, "চিত্ত উদ্বিগ্ন থাকিলে, শত চেষ্টা করিয়াও কেহ কিছুতে মনোযোগ দিতে পারে না। মনোযোগ দিতে না পারিলেও স্মরণ থাকা সম্ভাবিত নহে। দেবেন্দ্র যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সুরেন্দ্রের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ ছিল। সেই উদ্বিগ্ন চিত্তে পাঠ্য বিষয় ধারণা করা সুরেন্দ্রের অসাধ্য। আমি ইহাকে বেত্রাঘাত করিয়া যথার্থই অনুচিত কার্য্য করিয়াছি। শিক্ষকতা কি দুরূহ দুষ্কর কার্য্য! এই সুরেন্দ্র চিরদিন আমার এই অনুচিত শাস্তি প্রদানের কথা মনে রাখিবে। এই শাস্তির কথা সে যখনই মনে করিবে, তখনই আমার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিবে। আমি যে তাহার হিতৈষী, তাহার হিতের জন্যই যে বেত্রাঘাত করিয়াছি, সে আহত হৃদয়ে তাহা কখনই মনে ধারণা করিতেও পারিবে না। আমি ছাত্রদিগকে পড়া মুখস্থ করাইবার জন্য যে কঠোর শাস্তি দিতেছি, এবং যে ভয় প্রদর্শন করিতেছি, সেই শাস্তি এবং ভয়প্রদর্শনই অনেক বালকের চিত্তচাঞ্চল্যের বা উদ্বেগের হেতু হইবে। সুতরাং আমার এই উপায়ে হিতে বিপরীত ফলই ফলিবে। আমার ভীষণ মুর্ত্তি স্মরণ করিলেই বালকদের স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইবে। আমারও এই হিংসা পাপের ফল ছাত্রেরা ভোগ করিবে। আমি জানি, আমার এই হিংসা অবশ্য ক্রোধমূলক নহে এবং লোভমূলকও নহে; কিন্তু ইহা মোহমূলক। কিরূপে আমার কর্ত্তব্য সাধন করা উচিত, তাহা আমি সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না। বাস্ত-

বিক আমারও অনভিজ্ঞতা আছে। তবে আমি এইমাত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, মন উদ্বিগ্ন থাকিলে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব, এবং মনোযোগ না দিলেও কিছু স্মরণ রাখা অসম্ভব। কিন্তু উদ্বেগ তিরোহিত করিবার উপায় কি? আমি ত তাহা জানি না। আমি এই ছাত্রদিগকে কিরূপে নিরুদ্বেগ করিব? ইহা ত ভাবিয়া পাই না! সংসারে ত শত সহস্র লক্ষ কোটি উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে! আমি তাহার কি নিবারণ করিব? কয়টা নিবারণ করিব? শ্রেণীর মধ্যে যাহারা উত্তম বালক তাহারাও উদ্বেগের জন্য অধম হইয়া যায়। একবার অধম হইলে আবার উত্তম হওয়াও দুরূহ হইয়া পড়ে। পড়া মুখস্থ না হইলেই আমরা ক্রোধে অন্ধ হইয়া শাস্তিবিধান করি। গাধা, পাজি, বানর, ইষ্টপিট, রাস্কেল বলিয়া কত গালাগালি দেই। আমাদের এই তাড়না ও ভর্ৎসনার জন্যও অনেক ছাত্র চির-দিন মূর্খ হইয়া থাকে; চিরদিন অধম হইয়াই সংসারে কষ্টে জীবন যাপন করে। হায়! এইরূপে আমরাই কত জনের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকি। কিন্তু উপায় কি? তাহাও ভাবিয়া পাই না। অহো! আমি কি মহাসঙ্কটেই পড়িলাম। হে ভগবন্! হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শিক্ষক মহাশয় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এবং অনেক মিষ্টবাক্যে সুরেন্দ্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

পরদিন বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য পরীক্ষক (ইন্-স্পেক্টর) মহাশয় আসিয়া সমস্ত শ্রেণীর পরীক্ষা করিলেন;

এবং বালকগণের জ্যামিতি-শিক্ষা ভালরূপ হইতেছে না বলিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে কিছু অনুযোগ করিয়া জ্যামিতি-শিক্ষার এরূপ অনুন্নতির কারণ প্রদর্শন করিতে বলিলেন। শিক্ষক মহাশয় এইরূপ কারণ প্রদর্শন করিলেন; যথা,—

"মহাশয়, যে শ্রেণীর মধ্যে ২৫ জন ছাত্র আছে, তাহাদের মধ্যে ২০ জনের যদি পড়া না হয়, তবে অগত্যা নূতন পড়া দিতে ক্ষান্ত হওয়া যায়। এইরূপে বৎসরের অনেক দিনই বাধ্য হইয়া জ্যামিতির পড়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রের জ্যামিতি শিক্ষার অনুন্নতির কারণ, কেবল চিত্তের চাঞ্চল্য। অধিকাংশ স্থলেই এই চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ কুপ্রবৃত্তি। জ্যামিতির সংজ্ঞাগুলি ভালরূপে বুঝিতে না পারিলে এবং স্বতঃসিদ্ধগুলি উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলে, কোন প্রতিজ্ঞাই বুঝিতে পারা সম্ভাবিত নহে।

যে দিন প্রথমে জ্যামিতির সংজ্ঞাগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হয়, সে দিন উক্ত ২৫ জনের মধ্যে বিবিধ কারণে ১০ জনের চিত্ত চঞ্চল ছিল। সেজন্য কেবল ১৫টী মাত্র বালক ভালরূপ বুঝিয়াছিল। যে দিন স্বতঃসিদ্ধগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হয়, সে দিন উক্ত ১৫ জনের মধ্যেও কেবল ৮ জন মাত্র ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল; অপর ৭ জনের মন নানা কারণে চঞ্চল ছিল। তৎপরে যে দিন প্রথম প্রতিজ্ঞা বুঝাইয়া দেওয়া হয়, সে দিন উক্ত ৮ জন বালকের মধ্যে নানা কারণে ৫ জনের মন চঞ্চল ছিল; সুতরাং কেবল ৩টী মাত্র বালকই বুঝিতে পারিয়াছিল। প্রতিজ্ঞা গুলি পরস্পর সাপেক্ষ

বলিয়া, যাহারা প্রথম প্রতিজ্ঞা বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাও বুঝিতে পারা কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুইচারিটী ছাত্রকে শিক্ষা দিলে কখনই শিক্ষা কার্য্য চলিতে পারে না। তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত চঞ্চলচিত্ত বালকদিগের অনুরোধে অপর বালকদের উন্নতির প্রতিরোধ করিতে হইয়াছে।

গণিত শিক্ষার জন্য মনের একাগ্রতা বা মনোযোগ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু অনেক বালকই স্বভাবতঃ কুপ্রবৃত্তি-প্রবণ বলিয়া চঞ্চলচিত্ত এবং অনেক বালক পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের দোষেও চঞ্চলচিত্ত হইয়া থাকে। সেই জন্যই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই গণিত বিষয়ে অনুন্নত থাকে। গণিতের জন্য বিস্তর ছাত্রই তাড়না ও ভর্ৎসনা সহ্য করে এবং তজ্জন্য অনেক ছাত্রই গণিতকে বাঘভালুকের মত ভয়ানক মনে করে। অনেক বুদ্ধিমান্ বালকও প্রাথমিক শিক্ষায় অমনোযোগী হইয়া চিরদিনই আপনাদিগকে নিতান্ত অসমর্থ মনে করিয়া নিরাশ হয়। যাহাহউক, অধিক আর কি বলিব, জ্যামিতিশিক্ষার জন্য যে চিত্তের একাগ্রতা বা মনোযোগের প্রয়োজন, সেই মনোযোগের অভাবই জ্যামিতিশিক্ষার অনুন্নতির কারণ। কিন্তু মনোযোগ বা একাগ্রতা শিক্ষা দিবার উপায় কি, তাহা আমরা জানি না।”

পরীক্ষক মহাশয় শিক্ষক মহাশয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন,—

"হাঁ, আপনি যথার্থ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মনোযোগ বা একাগ্রতা শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবন নিতান্ত আবশ্যক বটে। ফলতঃ সর্ব্ববিধ শিক্ষার অগ্রে মনোযোগ শিক্ষা দেওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য; একথা আমি এক্ষণে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আমি ডিরেক্টর সাহেব মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া সত্বরই মনোযোগ শিক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিব।"

এই যে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও পরীক্ষকের সামান্য ছবি প্রদর্শন করিলাম, ইহাতে তুমি কিছু বুঝিতে পারিলে কি? তুমি স্বয়ং একটু চেষ্টা করিলে এরূপ শতস্থানে শত শত ছবি দেখিতে পাইবে। কিন্তু এই ছবি দেখিয়া বুঝিতে পারিলে কি যে, **মনোযোগের সহিত স্মরণশক্তির সম্বন্ধ আছে?**

যদি কিছুমাত্রও বুঝিয়া থাক, তবে শুন, চিত্তবৃত্তি কিরূপ, চিত্তচাঞ্চল্যের বা উদ্বেগের হেতু কি, ইত্যাদি ক্রমশঃ বলিতেছি শুন;—

চিত্তবৃত্তি।

মন এবং চিত্ত একার্থবাচক বলিয়া জান। মনের সহিত চিত্তের যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহা তোমার জানিবারও প্রয়োজন নাই। অতএব চিত্তবৃত্তি আর মনোবৃত্তি একই কথা জান।

বিষয়সম্বন্ধাচ্চিত্তস্য যা পরিণতিঃ সা বৃত্তিঃ।

বিষয়সম্বন্ধহেতু বা বিষয়ভোগহেতু চিত্তের যে পরিণতি (অবস্থান্তর-প্রাপ্তি) তাহাকেই বৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি বলে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের নাম বিষয়। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বিষয় গ্রহণ করিয়া চিত্তের নিকট উপস্থিত করে, চিত্ত সেই সকল বিষয় গ্রহণ করিয়া তদ্ভাবাক্রান্ত হয় বা অবস্থান্তর-প্রাপ্ত হয়। ইহাকে যোগবিৎ পণ্ডিতেরা বিষয়ের চিদাকারপ্রাপ্তি বলেন। অর্থাৎ চিত্ত যে বিষয় গ্রহণ করে, ঠিক্ তৎস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণই চিত্তবৃত্তির কারণ। চিত্তবৃত্তিই বোধশক্তির বা বুদ্ধিতত্ত্বের কারণ। চক্ষু যে দেখে না, কর্ণও যে শুনে না, একথা বোধকরি তুমি জান। মনই দেখে, মনই শুনে। চক্ষু দেখিলেও মন যদি না দেখে, তবে সে দেখা বাস্তবিক দেখাই নহে। ফলতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দর্শনাদি জ্ঞানের সাধন বা "দ্বারস্বরূপ" মাত্র। আবার মন দর্শনাদির বিষয় গ্রহণ করিয়াও যদি ভালরূপ গ্রহণ না করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয় যদি চিত্তক্ষেত্রে ভালরূপে অঙ্কিত না হয় বা চিদাকারে পরিণত না হয়, তাহা হইলে সেই বিষয় স্মরণশক্তির আয়ত্ত হয় না। আবার চিত্ত-ক্ষেত্রের মলিনতাহেতু মনোগৃহীত ছবিও তাহাতে স্পষ্ট-রূপে অঙ্কিত বা পরিস্ফুট হইতে পারে না; সুতরাং গ্রাহ্য বিষয়ও বোধশক্তির অগ্রাহ্য ও স্মরণশক্তির অনায়ত্ত হয়। ক্রমে এই সকল বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে চিত্তের অবস্থার বিষয় বা চিত্তভূমির বিষয় বলা যাইতেছে শুন;—

ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধঞ্চেতি
চিত্তস্য ভূময়োঽবস্থা-বিশেষঃ।

চিত্তভূমি বা চিত্তের অবস্থা পাঁচ প্রকার ; যথা ;—

(১) ক্ষিপ্ত। (২) মূঢ়। (৩) বিক্ষিপ্ত। (৪) একাগ্র। (৫) নিরুদ্ধ।

চিত্তের ক্ষিপ্ত অবস্থা কিরূপ ?

রজোগুণের উদ্রেক হেতু চিত্ত যে নিতান্ত অস্থির হইয়া সুখ-দুঃখাদি নানা বিষয়ে ধাবিত হয়, চিত্তের সেই অস্থির অবস্থাকেই ক্ষিপ্ত অবস্থা বলে।

চিত্তের মূঢ় অবস্থা কিরূপ ?

তমোগুণের উদ্রেক হেতু যখন চিত্ত ক্রোধমোহাদি দ্বারা নিতান্ত অভিভূত হইয়া হিতাহিত বা কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান হারাইয়া থাকে, তখন চিত্তের সেই অবস্থাকে মূঢ়াবস্থা বলে।

চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা কিরূপ ?

সত্ত্বগুণের ক্ষণিক উদ্রেক হেতু দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া যখন সুখপ্রাপ্তির চেষ্টায় সুখসাধন বিষয়ে চিত্ত প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার অবস্থাকে বিক্ষিপ্ত বলা যায়। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ত অবস্থাও ক্ষণস্থির বলিয়া, চিত্তের ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে এই বিক্ষিপ্ত অবস্থার প্রভেদ করা দুষ্কর।

ফলতঃ, সেই জন্যই চিত্তক্ষেপ বা চিত্তবিক্ষেপ বলিলে একার্থই বুঝায়।

চিত্তের একাগ্র অবস্থা কিরূপ ?

সত্ত্বগুণের উৎকর্ষহেতু যখন চিত্ত সুখময় এবং প্রকাশময় (উজ্জ্বল) হইয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং যে কোন বিষয় (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু বা আভ্যন্তরীণ ভাব্য বিষয়) সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া তৎস্বরূপ বা তদাকারে পরিণত হয়, চিত্তের সেই অবস্থাকে একাগ্র বলে। এই একাগ্র অবস্থাকেই মনের একতান অবস্থা বলে। ইহাই আমাদের সমাধি বা মনোযোগের চূড়ান্ত অবস্থা। এই একাগ্রতাই আমাদের প্রার্থনীয়।

চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা কিরূপ ?

চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা যে কিরূপ, তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই।

চিত্তের ক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত অবস্থা এবং মূঢ় অবস্থা তিরোহিত করিতে পারিলেই চিত্তকে একাগ্র অবস্থায় আনা যায়। অথবা চিত্তের ক্ষিপ্ততা ও মূঢ়তা অপসারিত হইলেই চিত্ত স্বতঃই একাগ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রজোগুণের ও তমোগুণের আধিক্যই চিত্তের ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থার কারণ। এবং সত্ত্বগুণের আধিক্যই একাগ্র অবস্থার কারণ।

এক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিষয় বলিতেছি শুন ;—

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ।

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণবিশিষ্টা। এই তিন গুণের বিষয় না জানিলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। এই গুণত্রয়-বিষয়ক জ্ঞানের উপরই যাবতীয় জ্ঞান নির্ভর করে। এই গুণজ্ঞানের উপরই যে যোগসাধন সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, একথা পরে বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে এই তিন গুণ কিরূপ, তাহা পরিস্ফুটরূপে বুঝাইবার জন্যই একটু বিস্তৃতরূপে লিখিত হইল। যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্রেই এই ত্রিগুণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কফ, পিত্ত, বায়ু, এই তিন ধাতু অবলম্বন করিয়াই যেমন আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ লিখিত হইয়াছে, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ অবলম্বন করিয়াই যাবতীয় আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত হইয়াছে। অতএব এই গুণত্রয়-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য একটু বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। তজ্জন্য অত্যন্ত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, এবং মনুসংহিতা হইতে এই ত্রিগুণের পরিচয় যথাবশ্যক উদ্ধৃত হইল।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥

হে মহাবাহো (অর্জ্জুন)! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, নির্ব্বিকার আত্মাকে সুখদুঃখমোহাদি দ্বারা দেহে আবদ্ধ করে। মনুষ্যের চিত্ত, সত্ত্বরজস্তমোগুণ-

বিশিষ্ট। সেই চিত্ত, চৈতন্য কর্ত্তৃক অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উক্ত তিন গুণ অনুসারেই সুখ, দুঃখ অথবা মোহ ভোগ করে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণহেতু সুখ, রজোগুণহেতু দুঃখ, এবং তমোগুণহেতু মোহ বা অজ্ঞানতা ভোগ করে। অতএব চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত চিত্তই সুখদুঃখাদির ভোক্তা। চৈতন্য নির্ব্বিকার; তাঁহার সুখদুঃখাদি বিকৃতির সম্ভাবনা নাই। অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত লৌহ-গোলক যেমন অগ্নি-সংজ্ঞা লাভ করে, তেমনই চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত চিত্তও 'জীবাত্মা' বা 'দেহী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই বদ্ধ জীবাত্মাই সুখদুঃখাদিভাগী। তজ্জন্যই মনুসংহিতায় আছে,—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্ ॥

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটী আত্মার (জীবাত্মার) গুণ জানিবে।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।

হে নিষ্পাপ (অর্জ্জুন)! সেই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ অতি নির্ম্মল বলিয়া জ্ঞানের প্রকাশক এবং দুঃখবর্জ্জিত বা প্রশান্ত। সেই সত্ত্বগুণই জীবকে সুখাসক্ত ও জ্ঞানাসক্ত করে।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥

হে কৌন্তেয়! রজোগুণ অনুরাগাত্মক ও আকাঙ্ক্ষা-জনক। এই রজোগুণ আত্মাকে কর্ম্মে আসক্ত করে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥

হে ভারত। তমোগুণ অজ্ঞানজনক এবং সকল দেহীর মোহজনক। ইহা জীবাত্মাকে প্রমাদ * (অনবধানতা বা অমনোযোগ), আলস্য (কর্ম্মে অনুৎসাহ) এবং নিদ্রাতে আবদ্ধ করে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥

হে ভারত। সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্ম্মে আসক্ত করে, আর তমোগুণ প্রমাদে (অনবধানতায় বা অমনোযোগে) আসক্ত করে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥

হে ভারত! কোথাও সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত (পরাস্ত) করিয়া প্রবল হয়; কোথাও রজোগুণ, সত্ত্ব এবং তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয় এবং কোথাও বা তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়।

প্রত্যেক দেহেই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ বিদ্যমান আছে। কোন কোন দেহে স্বভাবতঃই (পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলহেতু বা অদৃষ্টহেতু) সত্ত্বগুণ প্রবল থাকে এবং রজোগুণ ও তমোগুণ অভিভূত থাকে। যেমন শুদ্ধাচার-

* "প্রমাদোঽনবধানতা"। অনবধানতা বা অমনোযোগের নামই প্রমাদ। সুতরাং প্রমাদই অজ্ঞানতা, প্রমাদই ঘোর বিপদ।

সম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রকৃতি সত্ত্বগুণপ্রধান। তদ্রূপ কোন কোন দেহে স্বভাবতঃই রজোগুণের আধিক্য দৃষ্ট হয়। আবার কোন কোন দেহে স্বভাবতঃই তমোগুণের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই ইহজন্মের সাধনা বা অভ্যাস দ্বারাও যে সত্ত্বগুণের আধিক্য লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয় অভ্যাস-প্রকরণে বা সাধন-প্রকরণে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইবে। এখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভাব স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য আরও কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥

হে অর্জ্জুন! যখন চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল পরিস্ফুট-রূপে জ্ঞানের প্রকাশক হয়, অর্থাৎ যখন দর্শনশ্রবণাদি জনিত জ্ঞান অতি বিশদ হয়, তখনই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বা আধিক্য জানিবে। অতএব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিই সম্যক্ জ্ঞানের কারণ।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে, লোভ (দুরাকাঙ্ক্ষা), প্রবৃত্তি (কর্ম্মের ইচ্ছা), আরম্ভ (নূতন কর্ম্মের সূত্রপাত), অশম (কর্ম্মে অশান্তি অর্থাৎ ক্রমাগত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি) এবং স্পৃহা (সর্ব্বগ্রাহিতা) জন্মে। রজোগুণই মনুষ্যকে দুরাকাঙ্ক্ষ করিয়া বিবিধ কষ্টকর কার্য্যে নিয়োজিত করে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

হে কুরুনন্দন। তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে, লোকে বিবেক-বিহীন, নিরুদ্যম, অমনোযোগী, এবং বিমূঢ় বা মোহান্ধ হইয়া থাকে।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে, আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞানতা জন্মে।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিরা ঊর্দ্ধগতি (স্বর্গ বা দেবত্ব, উন্নতি বা উৎকর্ষ) লাভ করেন; রজোগুণান্বিত ব্যক্তিরা মধ্যস্থ থাকে (মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়) এবং জঘন্য তমোগুণাবলম্বীরা অধোগামী হয় (নরকে গমন করে; তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়)।

সত্ত্বগুণপ্রভাবেই মনুষ্য দেবতা হইতে পারে; রজো-গুণ প্রভাবে মনুষ্য মনুষ্যই থাকে; বিশেষ উন্নতি করিতে পারে না। আর তমোগুণ-প্রভাবে ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

যাহা আয়ুঃ, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতি বর্দ্ধন করে এরূপ রসাল, স্নিগ্ধ, সারবান্ ও উপাদেয় আহারই সত্ত্বগুণাধিক ব্যক্তির প্রিয়।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥

অতিকটু, অত্যম্ল, অতিলবণ, অত্যুষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ, এবং অতিবিদাহী, এই সকল দুঃখ-শোক-রোগপ্রদ খাদ্যই রজোগুণাধিক ব্যক্তির প্রিয়।

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

শীতলাবস্থাপ্রাপ্ত (বাসী), রসহীন, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিন-পক্ক (পচা, পান্তা), উচ্ছিষ্ট (অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট), অপবিত্র খাদ্যই তমোগুণাধিক ব্যক্তির প্রিয়।

এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, যে যে দ্রব্য যে গুণের প্রিয়, সেই সেই দ্রব্যই সেই গুণের বর্দ্ধক। উদাহরণ যথা;—

সাত্ত্বিক ব্যক্তি দুগ্ধ ভাল বাসেন; আবার এই দুগ্ধই সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক।

রাজসিক ব্যক্তি লঙ্কামরীচের ঝাল ভাল বাসেন; আবার এই লঙ্কামরীচের ঝাল রজোগুণের বর্দ্ধক।

তামসিক ব্যক্তি পচামাছ পেঁয়াজ দিয়া রসুই করা হইলে বড়ই প্রিয় বোধ করে; আবার এই পচামাছ ও পেঁয়াজ তমোগুণের বর্দ্ধক।

অথবা অধিক উদাহরণের প্রয়োজন কি, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তদ্দ্বারা সহায়তা বা সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; ইহার উদাহরণের অভাব নাই। একথা পরে আবশ্যক হইবে বলিয়া এখানে একটু সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলাম।

যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত লিখিত হইল, তাহাতেও চিত্ত-গুণ সম্যক্ বর্ণিত হইল কি না সন্দেহ করিয়া, ভগবান্ মনুর কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা;—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্।
যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ মহত্তত্ত্বরূপ আত্মার গুণ, এই তিন গুণ দ্বারা ব্যাপ্ত মহত্তত্ত্ব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থেই বিদ্যমান আছেন।

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্॥

এই তিন গুণ সকল দেহেই অল্লাধিক বিদ্যমান আছে। কিন্তু তন্মধ্যে যে গুণ যখন যে দেহে প্রবল হয়, তখন চিত্ত (আত্মা) তদ্গুণময় হইয়া থাকে। তজ্জন্য সাত্ত্বিক বলিলে সত্ত্বগুণ-প্রধান, রাজসিক বলিলে রজোগুণ-প্রধান এবং তামসিক বলিলে তমোগুণ-প্রধান প্রকৃতি বুঝিতে হইবে।

এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, একই গুণ চিরকালই যে একদেহে প্রধানরূপে বিদ্যমান থাকে তাহা নহে; থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিও

সেজন্য কখনও রাজসিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং কখনও বা তামসিক ভাব প্রাপ্ত হন। আবার রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিও কখন কখন সাত্ত্বিক ভাব ধারণ করিয়া থাকে। অতএব এই সকল গুণ যে চিরস্থির তাহা মনে করিও না। ইহারা পরিবর্ত্তনীয়। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিয়া রাখি যে, এই সকল গুণ পরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই সাধনের প্রয়োজন বা অভ্যাসের প্রয়োজন।

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥

সত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ, তমঃ অজ্ঞানস্বরূপ, রজঃ অনুরাগ এবং দ্বেষস্বরূপ। সুতরাং এই জ্ঞান, অজ্ঞান, অনুরাগ ও দ্বেষ সকল দেহেই বিদ্যমান আছে।

যথার্থ যে জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান), তাহাই সত্ত্বগুণের লক্ষণ; তদ্বিপরীত যে জ্ঞান (অবিদ্যাজনিত বিপর্য্যয় জ্ঞান), তাহাই তমোগুণের লক্ষণ; এবং বিষয়াভিলাষ, রজোগুণের লক্ষণ।

প্রীতি বা আনন্দই সত্ত্বগুণের স্বরূপ। অপ্রীতি অর্থাৎ দুঃখ বা ক্লেশই রজোগুণের স্বরূপ, এবং মোহ, অজ্ঞানতা ও বিষাদই তমোগুণের স্বরূপ।

সত্ত্বগুণের বৃত্তিকে শান্তা, রজোগুণের বৃত্তিকে ঘোরা এবং তমোগুণের বৃত্তিকে মূঢ়া বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিহিত করিয়াছেন।

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥

আত্মাতে (চিত্তে বা মনে) প্রীতিযুক্ত, প্রশান্ত ও বিশুদ্ধ যে ভাব অনুভব করা যায়, তাহাই সত্ত্বগুণ বলিয়া অবধারণ করিবে।

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোহপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্ ॥

যাহা আত্মার দুঃখপ্রদ ও অপ্রীতিকর এবং অনিবার্য্য-বিষয়স্পৃহাজনক, তাহাই রজোগুণ বলিয়া অবধারণ কর।

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥

আর যাহা আত্মাকে হিতাহিতজ্ঞানবিহীন ও সন্দেহযুক্ত করে, সেই দুর্জ্ঞেয় বিষয়াত্মক চিত্তগুণকেই তমোগুণ বলিয়া অবধারণ করিবে।

গুণত্রয়ের লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের কার্য্যাদি নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা ;—

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥

বেদাভ্যাস (অনন্তজ্ঞানোদ্ভূত শব্দ-ব্রহ্মের বা শাস্ত্রাদির অভ্যাস)। তপঃ (মনোবাক্যের সংযম, তপস্যা), জ্ঞান, শৌচ (বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধি), ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ, ধর্ম্মক্রিয়া, আত্মচিন্তা (ঈশ্বর-প্রণিধান), এই গুলি সাত্ত্বিক কার্য্য।

আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্ ॥

ফলের আকাঙ্ক্ষায় কার্য্যপ্রবৃত্তি, ফলপ্রাপ্তির ব্যাঘাতে

অধীরতা, লোকাচার-বিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান, অজস্র বিষয়াসক্তি, এইগুলি রজোগুণের কার্য্য।

লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্॥

লোভ, নিদ্রালুতা, কাতরতা, ক্রূরতা, ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে অবিশ্বাস, শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্য, যাচ্ঞা, এবং অমনোযোগ, এই গুলি তমোগুণের কার্য্য।

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্॥

তমোগুণের প্রিয় কাম, রজোগুণের প্রিয় অর্থ, সত্ত্বগুণের প্রিয় ধর্ম্ম। অতএব তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ প্রধান, এবং রজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ প্রধান।

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্য মিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবত্ব, রাজসিক ব্যক্তিরা মনুষ্যত্ব এবং তামসিক ব্যক্তিরা পশুত্বাদি অধম জীবত্ব প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর প্রস্তাব-বাহুল্যাশঙ্কায়, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক সমস্ত উদ্ধৃত না করিয়া কেবল অনুবাদমাত্র উদ্ধৃত হইল। এতদ্দ্বারাও ত্রিগুণের লক্ষণাদি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সত্ত্বাদি গুণের বৃত্তি নিরূপণ।

"ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! সত্ত্বাদি তিন গুণ দ্বারা পুরুষ যেরূপ হন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি মনোযোগ দিয়া শুন;—

শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, ধর্ম্মানুরাগ, সত্য, দয়া, স্মৃতি, সন্তোষ, দান, বৈরাগ্য, আস্তিকতা, অনুচিত কর্ম্মে লজ্জা, সরলতা, বিনয়, ঈশ্বরপ্রেম, ইত্যাদি সত্ত্বগুণের বৃত্তি।

আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, দর্প, অতৃপ্তি বা অসন্তোষ, গর্ব্ব (আত্মপ্রাধান্যপ্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যের মনে ক্লেশ দেওয়া, ইহা একপ্রকার হিংসা-প্রবৃত্তি), কামনা, ভেদবুদ্ধি (শত্রু ও মিত্র-জ্ঞানে কাহারও অপকার ও কাহারও উপকার করিবার প্রবৃত্তি), বিষয়ভোগ, যুদ্ধপ্রবৃত্তি, স্তুতি-প্রিয়তা, উপহাস, প্রভাব-প্রদর্শন, বলের উদ্যম, ইত্যাদি রজোগুণের বৃত্তি।

অসহিষ্ণুতা, ব্যয়কুণ্ঠতা, অশাস্ত্রীয় কথা, হিংসা, যাচ্ঞা, ধর্ম্মধ্বজিতা, শ্রান্তি, কলহ, অনুশোচনা, ভ্রান্তি, দুঃখ, দীনতা, তন্দ্রা, আশা, ভয়, আলস্য বা নিরুৎসাহ, ইত্যাদি তমো-গুণের বৃত্তি।

শম অর্থাৎ যম-নিয়মাদি দ্বারা পুরুষ সত্ত্বযুক্ত, কামাদি দ্বারা রজোযুক্ত এবং ক্রোধাদি দ্বারা তমোযুক্ত হন।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতিরই গুণ, আমার নহে ; যেহেতু এই সকল গুণ চিত্তেই সম্ভূত হয় এবং সেই চিত্তের সংসর্গেই জীব যেন উক্ত গুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করেন।

প্রকাশক, স্বচ্ছ ও শান্ত সত্ত্বগুণ, যখন রজঃ ও তমো-গুণকে জয় করে, পুরুষ তখন সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রভাবে জীব সুখী, ধার্ম্মিক, জ্ঞানী হইয়া থাকেন।

সত্ত্বগুণই আমার উপলব্ধিস্থান। যখন মন প্রশান্ত হইবে, ইন্দ্রিয়সকলের নির্ব্বৃতি হইবে, দেহের ভয়শূন্যতা হইবে, এবং হৃদয়ের সঙ্গহীনতা জন্মিবে, তখনই চিত্তে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব বুঝিবে।

যখন ক্রিয়াবশে বিকৃত হইয়া পুরুষের চিত্ত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলের অনির্ব্বৃতি জন্মিবে, কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের সমধিক বিকার উপস্থিত হইবে, মন ভ্রান্ত হইবে, তখনই চিত্তে উৎকট রজোগুণের আবির্ভাব বুঝিবে।

অত্যন্ত মলিন হইয়া চিত্ত যখন স্বীয় বৃত্তি গ্রহণ করিয়া চিদাকাররূপ পরিণাম গ্রহণে অসমর্থ হইবে অর্থাৎ যখন চিত্তের ধারণাশক্তি বা স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইবে, সঙ্কল্পাত্মক মনও বিলীন হইবে, অজ্ঞান এবং বিষাদ জন্মিবে, তখনই চিত্তে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বুঝিবে।

উদ্ধব! সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবতাদের, রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে অসুর বা দৈত্যদানবগণের এবং তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে রাক্ষসপিশাচগণের বল বৃদ্ধি পায়।

সত্ত্ব হইতে জাগরণ, রজঃ হইতে স্বপ্ন এবং তমঃ হইতে সুষুপ্তি বুঝিবে।

লোকসকল সত্ত্ব দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত গমন করেন, রজঃ দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন এবং তমঃ দ্বারা ক্রমশঃ নিম্নগতিতে স্থাবর পর্য্যন্ত অবতরণ করেন।

যাঁহারা সত্ত্বে প্রলীন হন তাঁহারা স্বর্গে, যাঁহারা রজো-

গুণে লীন হন, তাঁহারা নরলোকে এবং যাঁহারা তমোগুণে লয়প্রাপ্ত হন, তাঁহারা নরকে গমন করেন।

আমার প্রীতির উদ্দেশে কৃত বা দাসভাবে কৃত যে নিজ কর্ম্ম, তাহাই সাত্ত্বিক।

ফলকামনায় কৃত যে কার্য্য তাহা রাজসিক।

এবং হিংসাদির উদ্দেশে কৃত যে কার্য্য, তাহা তামসিক।

দেহাদির অতিরিক্ত যে আত্মজ্ঞান তাহাই সাত্ত্বিক।

দেহাদি-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা রাজস।

এবং প্রাকৃত অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানই তামস।

অরণ্যবাস সাত্ত্বিক। জনপদ-বাস রাজস এবং দ্যূতাদি-স্থলে বাস তামস।

সঙ্গহীনকর্ত্তা সাত্ত্বিক, অনুরাগ-বিমূঢ় কর্ত্তা রাজস এবং অনুসন্ধান-শূন্য কর্ত্তা তামস।

আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক। কর্ম্মে শ্রদ্ধা রাজস। এবং অধর্ম্মে শ্রদ্ধা তামস।

অনায়াসলব্ধ ভক্ষ্য-ভোজ্য সাত্ত্বিক। ইন্দ্রিয়গণের প্রিয়তম ভক্ষ্য রাজস। এবং দুঃখদায়ক অশুচি ভক্ষ্য তামস।

আত্মা হইতে উদ্ভূত সুখ সাত্ত্বিক। বিষয় হইতে উত্থিত সুখ রাজস। এবং আলস্য, মোহ ও দীনতা হইতে উত্থিত সুখাভাস * তামস।

এইরূপ দ্রব্য, দেশ, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা,

* প্রকৃত সুখ নহে; কিন্তু আপাত সুখবৎ প্রতীয়মান যে সুখ।

অবস্থা, আকৃতি ও নিষ্ঠা সকলই ত্রিগুণাত্মক। পুরুষ ও প্রকৃতিতে অবস্থিত—দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত সকল পদার্থই ত্রিগুণাত্মক। পুরুষের এই সকল গুণ কর্ম্মজন্য।”

এক্ষণে বোধকরি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণসম্বন্ধে যথেষ্টই বলা হইয়াছে। অথবা যাহা বলিয়াছি, তাহা তুমি এখন অতিরিক্ত বা বাহুল্য বলিয়াও মনে করিতে পার। যদি তদ্রূপ মনে কর, তজ্জন্যই বলিতেছি যে, এই তিন গুণই স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল-গমনের উপায়; এই তিন গুণই যোগ-সাধনের সোপান। সুতরাং যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অতিরিক্ত মনে করিও না। পুনঃ পুনঃ-পাঠ করিয়া এই বিশ্বব্যাপী তিন গুণের বিষয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম কর। কারণ এই তিন গুণের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে তুমি যোগসাধনের অধিকারী হইতেই পারিবে না।

চিত্তের অবস্থা বলা হইয়াছে। চিত্তের গুণও বলা হইল। অতঃপর চিত্তের বৃত্তি বর্ণিত হইতেছে।

চিত্ত-বৃত্তি।

চিত্তবৃত্তি কি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি কত প্রকার, এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ।

মনের বৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তি আবার দুই প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক-প্রকার মনের ক্লেশদায়ক আর একপ্রকার ক্লেশদায়ক নহে, বরং সাংসারিক উদ্বেগজনক ক্লেশের নিবারক। তজ্জন্য এক-

প্রকারের নাম ক্লিষ্টা আর অন্য প্রকারের নাম অক্লিষ্টা।
পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি কিকি?

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ।

প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি এবং স্মৃতিবৃত্তি।

ইহাদের মধ্যে প্রমাণবৃত্তি কি?

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম, এই তিন প্রকার প্রমাণ-বৃত্তি আছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ। কার্য্য কারণসম্বন্ধ বিচার করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে অনুমান আর বেদবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে বিশ্বাসবশতঃ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আগম বলে। যেমন আকাশে মেঘ দেখিয়া মেঘের প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। মেঘ হইতে জল হইবে, ইহা অনুমানজ জ্ঞান। জল সূর্য্যকিরণে বাষ্পাকার ধারণ করিয়াই মেঘাকারে পরিণত হয়, এই জ্ঞান আগম।

বিপর্য্যয় বৃত্তি কিরূপ?

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপ প্রতিষ্ঠম্।

যে জ্ঞান মিথ্যা, যাহা স্থিরতাপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ যাহা বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলেই তিরোহিত হয়, সেই জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলে। যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্পবোধ করিলে বিপর্য্যয় জ্ঞান বলা যায়। [সংসারে প্রায় যাবতীয় মনুষ্যই এই বিপর্য্যয়জ্ঞান দ্বারা নিতান্ত অভিভূত]।

বিকল্প বৃত্তি কিরূপ ?

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।

বস্তু নাই, কিন্তু শব্দ আছে বলিয়া যে এক প্রকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই বিকল্প বলে। যেমন খ-পুষ্প, শশবিষাণ, ইত্যাদি। আবার প্রকৃত বস্তু দুইটী, কিন্তু শব্দ দ্বারা একটী বস্তু বুঝাইলে তাহাকেও বিকল্প বলা যায়। যেমন অঙ্গার ও অগ্নি দুইটী পদার্থ, কিন্তু অগ্নিযুক্ত অঙ্গার অগ্নিনামে একই পদার্থের প্রতীতি জন্মায়। অতএব এরূপ স্থলেও বিকল্প জ্ঞান। এইরূপে বিকল্প দ্বারা জীবাত্মা দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থের সংযোগেও একটীমাত্র পদার্থেরই জ্ঞাপক হয়। ইত্যাদি। আবার কখন কখন শব্দ-শক্তির প্রভাবে একই বস্তু দুইটী বলিয়া জ্ঞান হয়; যেমন আত্মা ও চৈতন্য একই বস্তু হইলেও "আত্মার চৈতন্য" এরূপ উক্ত হইয়া কখন কখন দুইটী পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। এই জ্ঞানকেও বিকল্প বলা যায়

নিদ্রাবৃত্তি কিরূপ ?

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।

যখন সমুদয় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞান অবলম্বন করিয়া যে মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তাহাকেই নিদ্রা বা সুষুপ্তি বলে। যখন তমোগুণে চিত্তের সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন থাকে, তখনই সুষুপ্তি বা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা জন্মে এবং তখনই চিত্তবৃত্তির যেন অভাব হয়। এই অবস্থাই নিদ্রাবস্থা। গভীর নিদ্রার পরে আমরা জাগরিত

হইয়া বুঝিতে পারি যে, নিদ্রাবস্থায় আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। এই জন্যই লোকে বলে "আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার কোন জ্ঞান ছিল না।" অতএব নিদ্রাবস্থাতেও আমাদের অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান থাকে এবং সেই অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানই নিদ্রাবৃত্তি। স্মৃতি দ্বারাই এই বৃত্তি অনুভূত হয়।

স্মৃতিবৃত্তি কিরূপ?

অনুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।

কোন বিষয় একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণ-বৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া চিদাকারে পরিণত হইলে, চিত্ত সেই বিষয়টী কখনও পরিত্যাগ করে না। অতএব অনুভূত বিষয়ের অপরিত্যাগের নামই স্মৃতি। অনুভূত বিষয় সংস্কাররূপে চিরকালই চিত্তে অবস্থিতি করে। তাহার উদ্বোধক কারণ উপাস্থত হইলেই, সেই সংস্কার যেন জাগিয়া উঠে; এবং পূর্ব্বানুভূত বিষয় চিত্তে পুনরুদিত হয়। এই জাগিয়া উঠা বা পুনরুদয়ের নামই স্মৃতি বা স্মরণ।

কোন ধাতু দ্রবীভূত অবস্থায় যদি কোন ছাঁচে ঢালা যায়, তবে ঢালিবামাত্র সেই ধাতু যেমন ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কোন বিষয় চিত্ত-সংলগ্ন হইলেই চিত্ত সেই বিষয়ের আকার ধারণ করে; ইহাকেই বিষয়ের চিদাকার-প্রাপ্তি বলে, অথবা বিষয়ের জ্ঞান বলে। কিন্তু ঢালিবার দোষে বা অন্যকোনরূপ প্রতিবন্ধকতা হেতু যেমন অনেক সময় ছাঁচের অনুরূপ গঠনের ব্যতিক্রম হয়, তদ্রূপ

চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু বা মালিন্য হেতু অনেক সময় সেই চিত্ত সম্যক্ বিষয়াকার ধারণ করিতে পারে না। যখন সম্যক্ ধারণ করিতে পারে না, তখন তদ্বিষয়ক স্মৃতিও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় না। চঞ্চল বা কলুষিত চিত্ত কোন বিষয় যেরূপ ভাবে গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ক স্মৃতিও তদ্রূপ হইবে।

এই পঞ্চপ্রকার চিত্তবৃত্তি রোধ করাই মহাযোগীর উদ্দেশ্য। কিন্তু এই শেষোক্ত স্মৃতিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা দেখিতেছি, চিত্তের স্থিরতা এবং নির্ম্মলতা সাধন করিতে পারিলেই এই স্মৃতির সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করা যায়।

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত অনেক কথা বলা হইয়াছে। সেই সকল কথা, এখন আবার একবার সঙ্ক্ষেপে সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক্।

আমাদের উদ্দেশ্য কি? সেই উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল কি কি কথা বলা হইয়াছে? এবং কেনই বা বলা হইয়াছে?

আমাদের উদ্দেশ্য 'স্মরণশক্তির উৎকর্ষ-সাধন।' এই কথাটারই একটু আলোচনা করা যাউক্।

উৎকর্ষ শব্দটী কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কৃষ ধাতুর অর্থ চাষ করা। অতএব উৎকর্ষ শব্দে উৎকৃষ্টরূপে কর্ষণ অর্থাৎ ভালরূপে চাষ করা বুঝায়।

সাধন শব্দটী 'সাধ' ধাতু হইতে বা ণ্যন্ত সিধ ধাতু অর্থাৎ 'সাধি' ধাতু হইতে উৎপন্ন। পারলৌকিক ও অপার-

লৌকিক ভেদে এই দুই ধাতুর অর্থগত প্রভেদ আছে। যাহা হউক, সে সকল সূক্ষ্মবিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। সাধন বলিলে কি বুঝায়, তাহাই জানা আবশ্যক। ইহার যে অর্থ আমাদের আবশ্যক, তাহা অতি সরল। সাধন শব্দে সম্পাদন, করণ বা অভ্যাস বুঝিতে হইবে।

স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি যে এক প্রকার চিত্তবৃত্তি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব এক্ষণে 'স্মরণশক্তির উৎকর্ষ সাধন'-এই কথার সরল অর্থ কি, তাহা জানা গেল। যথা ;—

'এক প্রকার চিত্তবৃত্তির চাষ করা'। সুতরাং এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, যাহা বলা হইয়াছে বা যাহা বলা হইবে, তাহা চাষ-আবাদের কথা। যদি ইচ্ছা কর, তবে ইহাও বলিতে পার যে, ইহা "চাষার কথা" এবং "চাষার জন্যই লিখিত"। এই স্থানে তোমার মনে বিস্তর সংশয়াদি উপস্থিত হইবে বলিয়া, এই 'চাষ' ও 'চাষার' অর্থও একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

প্রাচীন হিন্দুরা আপনাদিগকে 'আর্য্য' বলিতেন। এই আর্য্য শব্দটী ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঋ ধাতুর অর্থও চাষ করা। অতএব আর্য্য শব্দের অর্থও 'চাষা'। এই জন্যই কোন মহাত্মা বেদকে "চাষার গান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন বোধকরি তুমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছ। এই চাষ-আবাদের মহিমা, এই চাষার মাহাত্ম্যেই কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। চাষা বলিলে এখন যে গালাগালি বুঝায়, আর্য্যেরা সেই

গালাগালিরও ভাজন বটে। যেহেতু চাষা বলিলে নিতান্ত সরলবুদ্ধি বা অনভিজ্ঞ বুঝায়। আর্য্যেরাও নিতান্ত সরলবুদ্ধি ও সংসারবিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সংসার-বিষয় বলিলেই বুঝিবে যে, রজঃ ও তমোগুণ-সম্ভূত পাপ। সেই পাপসম্বন্ধে আর্য্যেরা অনভিজ্ঞ ছিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা সরল সহজ চাষা ছিলেন। সেই জন্যই সত্যযুগে সাধনা বা তপস্যা সহজ ছিল অথবা সেই জন্যই তখন চাষ-আবাদ সহজ ছিল।

কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে আমরা আর "চাষা" নহি। আমরা "বাবু" !! আমাদের এই চাষ-আবাদ অত্যন্ত ক্লেশকর বলিয়াই বোধ হইতেছে। আমরা সংসার-বিষয়ে অভিজ্ঞ, সাংসারিক পাপে অভ্যস্ত বা সিদ্ধ-পুরুষ। আমাদের কথা দূরে থাক্; সত্যযুগের পর হইতেই এই দুর্দ্দশা বা এই "বাবুগিরির" সূত্রপাত হইয়াছে। সেই জন্যই, চাষ-আবাদের নানা প্রকার সহজ প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। যে সকল সহজ সরল চাষা অনায়াসে পদব্রজে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন; তাঁহাদেরই বংশাবলি সাগর পার হইবার জন্য কত শতশত জাহাজ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। সেই সরল সহজ চাষাদের পথ (নিবৃত্তি মার্গ) পরিত্যাগ করিয়া বড় বড় বাবু চাষারা সুগম পথ (প্রবৃত্তি-মার্গ) আবিষ্কার করিয়াছেন। ক্রমশঃ কলির আগমনে ভীষণ সময়ের প্রাদুর্ভাবে আমিও আবার সেই বড় বড় জাহাজের অনুকরণে একখান ছোটখাট জাহাজ প্রস্তুত করিতেছি !!!

যাহাহউক, এক্ষণে অধিক কথায় কাজ নাই। চাষ-আবাদের কথাই আরম্ভ করা যাউক।

চাষ-আবাদের জন্য প্রধান হাল-হাতিয়ারের কথা প্রায় সমস্তই বলা হইয়াছে। যদি এ কথা ঠিক্ না বুঝিতে পার, তবে আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। যম-নিয়মাদি সাধনই চাষ-আবাদের হাল-হাতিয়ার মনে করিও। যদিও কেবল যমসাধনের বিষয়মাত্রই বলা হইয়াছে, নিয়মাদির বিষয় এখনও কিছু বলা হয় নাই, তথাপি জানিও যে, যমসাধনই চাষ-আবাদের প্রধান সাধন, অর্থাৎ হল বা লাঙ্গলরূপ প্রধান যন্ত্র।• নিয়মাদি ইহারই আনুষঙ্গিক যন্ত্র। তাহাও পরে বিবৃত হইবে।

চাষ-আবাদের জমি কি, তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? যদি হয় তবে শুন;—

চিত্তভূমি বা চিত্তক্ষেত্রই চাষ-আবাদের ভূমি। যাহাকে মহাত্মা সাধক রামপ্রসাদ "মানব-জমি" বলিয়া গিয়াছেন। সেই মহাপুরুষের হৃদয়োত্থিত এই গাথা স্মরণ কর;—

"মন, তুমি কৃষি-কাজ জাননা। এমন মানব-জমি রাখ্‌লে পতিত, আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোনা।"

এই চিত্তক্ষেত্র বা "মানব-জমির" চাষ-আবাদের প্রয়োজন কি? একথা আর এতদূরে বলা বোধকরি নিতান্তই অনাবশ্যক; তবু যদি বলিতে হয়, তজ্জন্য বলিতেছি,— "সাধক মহাত্মার কথাক্রমে বুঝা যাইতেছে যে, আবাদ করিলে "সোনা" পাওয়া যাইবে। আমাদের এই সোনা আর কি? "স্মরণশক্তি" এই কথা স্মরণ রাখিলেই হইবে। চিত্ত-

ক্ষেত্রের চাষ করিতে হইবে কেন? লাঙ্গলেরই বা প্রয়োজন কি?

চিত্তক্ষেত্রের অবস্থা অত্যন্ত বন্ধুর অর্থাৎ উচ্চাবচ; এবং তাহার গুণও বিভিন্ন, তজ্জন্য তাহাকে সমতল করা আবশ্যক এবং তাহার গুণেরও সমতা বিধান বা উৎকর্ষ বিধান আবশ্যক। চিত্তের মূঢ় ও ক্ষিপ্ত অবস্থা চাষ করিয়া একাগ্র করা আবশ্যক। চিত্তের তমঃ ও রজঃ এই গুণদ্বয়ই উক্ত মূঢ় ও ক্ষিপ্ত অবস্থার হেতু বলিয়া এই দুই গুণেরও দমন আবশ্যক। সেই জন্যই যমসাধনরূপ মহান্ কৃষিসাধনের আবশ্যক।

যমসাধন দ্বারা চিত্তের তমঃ ও রজোগুণ বহু পরিমাণেই অন্তর্হিত হইবে এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্মিবে; তখন নিয়মাদি সাধন দ্বারা সহজেই তাহাকে একাগ্র করা যাইতে পারিবে।

যাহা হউক, এখন চাষ-আবাদের হাল-হাতিয়ার ও ক্ষেত্রও পাওয়া গেল। কিন্তু একটী মহান্ অভাবের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছ কি? ক্ষেত্র পাইয়াছ, লাঙ্গলও পাইয়াছ; কিন্তু ইহাতেই কি চাষ-আবাদ হইবে? তাও কি কখন সম্ভব? চাষ-আবাদ কি কখনও দেখ নাই? যদি না দেখিয়া থাক, তবে মাঠে গিয়া দেখিয়া আইস। লাঙ্গল টানিবে কে?

বলদ আবশ্যক।

বলদ ব্যতীত ভালরূপে চাষ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বলদের মূল্য অনেক। তুমি এখন নিতান্ত দরিদ্র; সুতরাং

বলদ পাইবে কিরূপে? ক্ষেত্রের জন্য কিছু ব্যয় নাই, কেননা সে পতিত জমির খাজনা দিতে হইবে না, সে তোমার নিজেরই সম্পত্তি। লাঙ্গলও সামান্য বস্তু। কিন্তু বলদ সামান্য বস্তু নহে। বলদের মূল্যও তোমার পক্ষে অনেক অধিক। অতএব তোমাকে প্রথমে ঘরের ছাগল বা দুর্ব্বল গাই গোরু লইয়াই চাষ আরম্ভ করিতে হইবে। পরে কিছু পুঁজি-পাটা জমিলে অনায়াসে বলদ লাভ করিতে পারিবে।

তুমি যে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া আছ? মর্ম্মকথা কিছুই বুঝিতে পার নাই, তাহা বুঝিয়াছি। অতএব স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শুন। প্রবীণ চাষার মত ভাষায় বলিলে তুমি অনেক কথা বুঝিবে না। অতএব অতঃপর যথাসাধ্য সে ভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার সুগম ভাষাতেই চাষ-আবাদের কথা সমস্ত বুঝাইয়া দিতেছি শুন;—

বল-দ শব্দের অর্থ যাহা বল দান করে। ইহার অন্য নাম বীর্য্য বা ওজঃ। এই বীর্য্যই শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস বল উৎসাহ প্রভৃতির উৎপাদক। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে কিঞ্চিৎ ফল-লাভ না করিলে এই বীর্য্য বা ওজঃ কোথায় পাইবে? চাষ করিবার আগেই ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তুমি এখন এই বীর্য্য বা ওজোরূপ সম্পত্তি-বিহীন। তবে তুমি কিসের বলে যমসাধন করিবে? তোমার বীর্য্য বা ওজঃ নাই বলিয়া কি যমসাধনে পরাঙ্মুখ হইবে? না না। তুমি 'আশার' বল অবলম্বন কর। এই 'আশা' তামসিক বলিয়া ইহা তোমার সহজ-সম্পত্তি বা অতি সুলভ। যদিও বলদের

সহিত ছাগীর যে প্রভেদ, বীর্য্যের সহিত আশারও তদ্রূপ প্রভেদ, তথাপি তুমি আপাততঃ অগত্যা এই আশাকেই অবলম্বন করিয়া চাষ-আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও। এই আশারও বল নিতান্ত অল্প নহে। তামসিক পিশাচ রাক্ষসেরাও এই আশার বলে স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল কাঁপাইয়া দেয়!

অতএব তুমি আপাততঃ এই সহজ সম্পত্তি আশার উপর নির্ভর করিয়াই যমসাধনে প্রবৃত্ত হও। তৎপরে এই সাধনার ফলে যখন কিঞ্চিৎ বীর্য্য বা ওজঃ লাভ করিতে পারিবে, তখন আর তোমার আশার সহায়তাও আবশ্যক হইবে না। তুমি তখন লব্ধ ওজঃ প্রভাবে ক্রমশঃই চাষ-আবাদের উন্নতি করিতে পারিবে। অথবা আর 'চাষ-আবাদ' বলিব না। তুমি তখন লব্ধ ওজঃ প্রভাবে সাধন-পথে সহজেই অগ্রসর হইতে পারিবে।

যোগসাধন করিলে বা যমসাধন করিলে সংসারে অত্যুন্নতি লাভ করিতে পারিবে, এই আশার উপর নির্ভর কর।

অতঃপর কিরূপে যোগসাধন করিতে হইবে তদ্বিষয় বিবৃত হইতেছে।

অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

যোগবিৎ পরম ঋষিরা যোগের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী উপায় অভ্যাস, আর একটী উপায় বৈরাগ্য। কিন্তু বৈরাগ্যরূপ উপায় আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতিবাধক বলিয়া অবলম্বনীয় নহে। সুতরাং একমাত্র অভ্যাসই আমাদের অবলম্ব্য।

সেই জন্যই ইতঃপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, অভ্যাসের নামই সাধন। কিন্তু অভ্যাস কাহাকে বলে?

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।

চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ন, অর্থাৎ তামসিক ও রাজসিক বৃত্তির উত্থান দমনের যে যত্ন, তাহারই নাম অভ্যাস। এই অভ্যাস কিরূপে দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হইতে পারে?

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্য-সৎকার-সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।

সেই অভ্যাস নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রদ্ধাসহকারে করিলে উহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়।

এক্ষণে সাধন বা অভ্যাস সম্বন্ধে সার কথা কয়টী বলা হইল। পরম ঋষিরা আমাদের মত বাজে কথা বলিতেন না। তাঁহাদের বাক্য অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে অনন্ত ভাব নিহিত। তাঁহাদের বাক্যে একবিন্দুও অসারত্ব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা অধিক কথা বলে, তাহাদেরই বাক্যে অনেক অসার কথা থাকিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে এই ঋষিবাক্য ঈশ্বরবাক্য বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পণ্ডিতেরা এইরূপ সংক্ষিপ্ত এক একটী ঋষিবাক্য লইয়া কত সময়ই সুখে অতিবাহিত করিতেন। এই এক একটী ঋষিবাক্যের সম্যক্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তাঁহারা নিয়তই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। যাহা হউক,

এখন আমরা সাধ্যানুসারে ঋষিবাক্যের মর্ম্ম বোধ করিতে চেষ্টা করি।

অভ্যাস জিনিষটা কিরূপ? একটা উদাহরণ লইয়া বুঝা যাউক। একটী বালক, প্রত্যহ বেলা ১০টার সময় আহার করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করে। বিদ্যালয়ে গিয়া যথারীতি বেলা ৪টা বা ৫টার সময় বাড়ী আসে। সে গ্রীষ্মের সময় দেড়মাস গ্রীষ্মাবকাশ পাইল। এখন তাহাকে ১০টার সময় স্কুলে যাইতে হয় না; সে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া খেলা করে, পড়াশুনাও করে, কিন্তু প্রত্যহ ১২টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত এক প্রহর সময় নিদ্রাসুখ উপভোগ করে। এই দেড়মাস উত্তীর্ণ হইলেই তাহাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে যাইতে হইল। কিন্তু বিদ্যালয়ে গিয়া দেখ, বেলা ১২টা হইতে প্রায় সকল ছাত্রই নিদ্রায় অবশাঙ্গ হইয়া ঢুলিতেছে! শিক্ষক মহাশয়দিগেরও তদনুরূপ দুর্দ্দশা! এরূপ দুর্দ্দশার হেতু কি? অভ্যাস। কি ছাত্র, কি শিক্ষক, প্রায় সকলেই দেড়মাস ধরিয়া দিবানিদ্রা অভ্যাস করিয়াছেন। দেড় মাসের পর তাঁহাদের দিবানিদ্রার প্রয়োজন থাকুক্ আর নাই থাকুক্, অভ্যাস তাহা শুনিতে চায় না! অভ্যাস চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। ছাত্রেরা ও শিক্ষকেরা এই অভ্যাসের জ্বালায় তখন জ্বালাতন হইয়া পড়েন। চোকেমুখে জল দিয়া নিদ্রাকে দূর করিতে অনবরত চেষ্টা করেন। অর্থাৎ অভ্যাসের ফল এড়াইবার জন্য পুনরায় বিপরীত অভ্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিদ্রা আনিবার জন্য যে অভ্যাস করিয়াছিলেন,

এখন নিদ্রাকে দূর করিবার জন্যও অন্যবিধ অভ্যাসই করিতে থাকেন। ইহাতেই তাঁহারা দেড়মাসের অভ্যাসের ফলকে পুনরায় দেড়মাসের অভ্যাস দ্বারা বিফল করিতে পারেন। তৎপরে দেখ গিয়া, স্কুলে আর কেহই নিদ্রালু অবস্থায় নাই। সকলেই কার্য্যতৎপর। যদি ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখ, তবে জানিও যে, সেস্থানে প্রতি-অভ্যাস সম্যক্ অভ্যস্ত হয় নাই।

যাহাহউক, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কি বুঝিলে ?

কিছুদিন ধরিয়া নিয়ত কোন কাজ করিলে, শেষে সেই কার্য্যপ্রবৃত্তি যেন স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিরূপে পরিণত হয়। আবার কিছুদিন ধরিয়া যদি নিয়ত উক্ত কার্য্যের বিপরীত কাজ করা যায়, তবে সেই কার্য্য-প্রবৃত্তিকে চিত্তক্ষেত্র হইতে দূরীভূত করাও যায়। অতএব সমস্ত চিত্তবৃত্তিই অভ্যাসের ফলমাত্র। এই অভ্যাস আর কর্ম্ম একই কথা নয় কি ? চিন্তা করিয়া বুঝ। ক্রমাগত ঘুমাইতে লাগিলে, আর ঘুমাইতে অভ্যাস করিতে লাগিলে, এই দুইটী বাক্যে কিছু প্রভেদ আছে কি ? যদি প্রভেদ না থাকে, তবে বুঝ, যে ক্রমাগত একটী কাজ করা আর অভ্যাস করা উভয়ই তুল্য কথা। সুতরাং কর্ম্ম আর অভ্যাস এই দুইটী কথার মধ্যে কতটুকু প্রভেদ আছে, ভালরূপে বুঝিয়া রাখ। অথবা এই কথাই ধারণ কর যে, **কর্ম্মেরই নামান্তর অভ্যাস।**

পুনরায় শুন, কোন কাজ করিতে করিতে, সে কাজ করা ক্রমশই সহজ হয়। ইহার শত শত উদাহরণ অবশ্য জান। তুমি ক্রমাগত একমাসকাল দিবাভাগে শয্যায়

গিয়া নিদ্রাকে আরাধনা করিয়া লইয়া আইস। দেখিবে, ক্রমেই নিদ্রার সঙ্গে তোমার বড়ই প্রণয় জন্মিবে। এক-মাস পরে দেখিবে, তোমাকে আর শয্যায় যাইতে হয় না; নিদ্রা স্বযং আসিয়া তোমার যেন হাতেপায়ে ধরিয়া তোমাকে শয্যায় লইয়া গিয়া থাকেন। ইহা অতি চমৎকার রহস্য।

এই সামান্য রহস্য দ্বারা বুঝিয়া রাখ যে, তুমি অভ্যাস করিলে এইরূপে জগতের সকলকেই বশীভূত বা স্বায়ত্ত করিতে পার। ভূত প্রেত যক্ষ রাক্ষস পিশাচকেও বশ করিতে পার; আবার দেবতাদিগকেও আয়ত্ত করিতে পার। নিদ্রা একটি তামসিক পিশাচীমাত্র। কিন্তু ভূতপ্রেত-পিশাচকে বশ করিবার প্রয়োজন কি? দেবতাকে বশ করি-বার জন্যই সাত্ত্বিক যোগের প্রয়োজন। তামসিক যোগ দ্বারা রাক্ষস-পিশাচদিগকে বশ করা যায়। আর রাজসিক যোগ দ্বারা দৈত্য-দানবগণকে বশ করা যায়। এই অত্যদ্ভুত যোগ রহস্য "বশীকরণ-যোগে" যথাস্থানে এবং যথাসময়ে ব্যক্ত করিব। এখন যাহা বলিবার তাহা বলিতেছি শুন;—

অভ্যাস কর্ম্মেরই নামান্তর একথা বোধকরি তোমার স্মরণ আছে। অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের যে স্বতঃ-প্রবণতা জন্মে, তাহাকে সংস্কার বলে। এই সংস্কার অভ্যাসেরই ফল। একমাস যত্ন করিয়া দিবানিদ্রা অভ্যাস করিলে, তৎপরে যে নিদ্রা দিবাভাগে স্বতঃই আসিয়া তোমাকে শয্যায় লইয়া যায়, এ কথার তাৎপর্য্য কি? বাস্তবিক কি নিদ্রা-নামে কোন পিশাচী আসে না কি?

না তা নয়। অভ্যাস দ্বারা তোমার চিত্তে নিদ্রার সংস্কার জন্মিয়া থাকে। সেই সংস্কারই তোমাকে নিদ্রার জন্য আকর্ষণ করে। সেই সংস্কার তামসিক বলিয়া নিদ্রাকেই তামসিক পিশাচী বলা হইয়াছে। বহু উদাহরণ দ্বারা এই সংস্কারের বিষয় চিন্তা করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। অভ্যাস-বশতঃ **চিত্তের যে স্বতঃপ্রবণতা তাহাই সংস্কার।**

চিত্তের স্বতঃপ্রবণতা কি? আপনা হইতেই অর্থাৎ যত্ন না করিলেও কোন কর্ম্ম করিতে মনে যে ইচ্ছার উদয় হয়, সেই ইচ্ছাকেই চিত্তের স্বতঃপ্রবণতা বলিয়া বুঝিয়া রাখ।

তরল পদার্থ মাত্রেই নিম্নদিকে গমন করে, ইহাকে তরল পদার্থের স্বতঃপ্রবণতা বলে। অভ্যাস দ্বারা মনে একটী সংস্কার জন্মে, তাহাও স্বতঃপ্রবণ। কিন্তু এই সংস্কারটী চিদাকার-প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ইহা মনেরই আকার গ্রহণ করে। সেই জন্যই ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, মন, চিত্ত, সংস্কার, যেন সমস্তই একার্থ-বাচক হইয়াছে।

"আমি এ কাজ করিব কিরূপে, ইহা করিতে আমার মন নাই।" এ স্থানে এই বাক্যে কি বুঝিলে?

এখানে মন শব্দে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বা সংস্কার বুঝিতে হইবে। অতএব বুঝিয়া রাখ যে, চিত্ত বা মনই সংস্কার-রূপে যেন তরলাকারে পরিণত হয়।

সুতরাং যেমন খাল খনন করিয়া জলকে যথা ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়, তেমনই অভ্যাস দ্বারা মনকে সংস্কারে পরিণত করিয়া যথা ইচ্ছা তথায় লইয়া যাওয়া যায়।

মনকে কোন স্থানে লইয়া যাওয়া, আর মনকে সেই স্থানে সংযুক্ত করা, অথবা সেই স্থানে মনোযোগ দেওয়া, একই কথা। তবে এখন ভালরূপে বুঝিয়া দেখ যে, এই

মনোযোগ অভ্যাসেরই ফল।

আবার একথাও যখন পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, মনোযোগের নামই যোগ, তখন তুমি অবশ্যই বুঝিবে যে,

যোগ অভ্যাসেরই ফল।

অনেক কথা বলা হইল। কিন্তু কাজের কথা, চাষ-আবাদের কথা এখনও কিছু বলা হয় নাই। কোন্ কথার কি অর্থ, তাই বুঝাইতেই অনেক কথা বলিতে হইতেছে। সসার সংক্ষিপ্ত ঋষিবাক্যই আমাদের একমাত্র অবলম্ব্য। সেই ঋষিবাক্য বুঝিবার জন্যই এত প্রয়াস। আমাদের শক্তি-সামর্থ্য নিতান্তই অল্প। আমাদের স্মরণশক্তি নিতান্তই অল্প। সেই জন্যই একই কথা পুনঃপুনঃ বলিতে হই-তেছে। আমরা দুর্ব্বল। আমাদের যত্ন বা অভ্যাস এক-মাত্র আশার উপরই নির্ভর করিতেছে। এই আশা কি, তাহাও বলিয়াছি। এই আশা তামসিক। কিন্তু তাম-সিক হইলেও এই আশার এত বল কিসে হইল? রাক্ষস-পিশাচেরাও আশার বলে অত্যন্ত বলীয়ান্ হয় কেন?

এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যাহা বলিতেছি শুন;—

আশাও যোগসাধনের সহায়।

প্রকৃত-প্রস্তাবে আশার শক্তি অতি অল্প। আশা তাম-সিক বলিয়াই অতি দুর্ব্বল। এই জন্যই সচরাচর লোকে

'আশা-লতা' বলিয়া থাকে। ইহার দুইটী কারণ ; অশ ধাতু হইতেই আশা কথা হইয়াছে। অশ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। আশা মনোমধ্যে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু এই আশার শক্তি অতি অল্প। এই দুই কারণেই লোকে আশাকে লতারূপে কল্পনা করে। আশা যে কেবল মনোমধ্যেই ব্যাপ্ত হয়, তাহা নহে। ইহা স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। কেন ব্যাপ্ত হয় ? ইহা কিছু অনুসন্ধানের জন্যই ব্যাপ্ত হয়, স্বাভাবিক আকর্ষণেই ব্যাপ্ত হয়। ইহা কিছু চায় বলিয়া সর্ব্বত্র যায়। ইহা চায় কি ? ইহা সুখ চায়! ইহা মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে চায়! অর্থাৎ ইহা ক্লেশ হইতে নিবৃত্তি চায়। ক্লেশের মধ্যে চূড়ান্ত ক্লেশ মৃত্যুযন্ত্রণা, সেই মৃত্যু-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই আশা ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। জীব বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়া বহুবার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে ; সেই জন্যই মৃত্যুভয় তাহার চিত্তকে সংস্কাররূপে পরিণত করিয়াছে। সংস্কার কাহাকে বলে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। সমস্ত জীবের চিত্তে মৃত্যুভয়-সংস্কার জন্মিয়া আছে ; ইহা শত শত উদাহরণ দেখিয়া তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে। সদ্যো-জাত শিশুরও এই সংস্কার আছে। এই সংস্কার বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াই মহর্ষিরা বা মহাযোগীরা জন্মান্তর-পরিগ্রহ-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই জন্মান্তর পরিগ্রহের বিচ্ছেদ বা মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বের নিখিল জীবকে মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত ভীত দেখিয়াই পরম ঋষিরা মৃত্যুভয় হইতে উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

যাহাহউক, আশাও এই মৃত্যুভয় হইতে উদ্ধার পাইতে চায়! সেই জন্যই আশা যদি শুনিতে পায় যে, "অমুক ঋষি মৃত্যুভয় হইতে মুক্তি দিতে পারেন" তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সেই ঋষির নিকট গিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে পারে। ঋষি যদি বলেন "যোগসাধন কর, মৃত্যুভয় থাকিবে না।" একথা শুনিলে আশা তৎক্ষণাৎ ঋষির চরণতলে পড়িয়া যোগসাধন শিক্ষা করে। আবার সেই যোগসাধনের প্রভাবেই অতি ক্ষীণা দুর্ব্বলা আশাও অসীম শক্তি ধারণ করিয়া থাকে! অতএব প্রকৃতপ্রস্তাবে আশা বলবতী নহে। যোগসাধনেই আশা বলবতী হইয়া থাকে।

যাহা বলিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলে কি? ভাল বুঝিতে পার নাই। শুন,—

আশা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয় কেন? মৃত্যু-সংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য। পরম ঋষিরা এই সহজাত মৃত্যু-সংস্কারকে "অভিনিবেশ" শব্দে অভিহিত করেন। অর্থাৎ মৃত্যুভয়কে যোগীরা অভিনিবেশ বলেন। এই অভিনিবেশ শব্দে মনোযোগও বুঝায়। মনোযোগ বুঝায় কেন? সর্ব্বজীব মৃত্যুভয়ে যেমন মনোযোগী তেমন মনযোগী আর কিছুতেই নহে। সেই জন্যই তত্ত্বজ্ঞ পরম ঋষিরা সাধারণ জীবের মনোযোগের চূড়ান্তকে অভিনিবেশ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

এখন বুঝিতে পারিলে কি, আশা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয় কেন? যদি না বুঝিয়া থাক, তবে শুন;—যোগসাধন ত অন্য কিছুই নহে; মনোযোগের নামই যোগসাধন।

অতএব আশা অভিনিবেশের জন্যই অভিনিবিষ্ট হয়। একথা বুঝিতে পরিলে কি? সরল কথায় বলি; যে মন মৃত্যুভয়ে স্বভাবতঃ একাগ্র, তাহা সেই ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই একাগ্র হইতে অভ্যাস করিতে চায়। সেই জন্যই আশাও যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

আবার শুন, আশা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যখনই যোগসাধনের ফল কিয়ৎপরিমাণেও বুঝিতে পারে, তখনই অতি প্রবলমূর্ত্তি ধারণ করে! মৃত্যুভয় হইতে উদ্ধারের একটু আভাস পাইলেই আশা অসীম বলে উন্মত্ত হইয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। তখন আশা শত বার সহস্র বার স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়াও ঋষির পদতলে পড়িয়া ক্রমাগতই যোগসাধনে অনুরাগ প্রকাশ করে। ঋষিবাক্যে তখন তাহার অটল অবিচলিত বিশ্বাস জন্মে।

যাহাহউক, যাহা বলিলাম, তাহা তুমি ভাল বুঝিতে পারিতেছ না, সুতরাং একটা জীবন্ত জ্বলন্ত উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। অতএব শুন;—

রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের যোগসাধন।

এদেশে রামায়ণের কথা সকলেই জানেন। অতএব এখানে সাতকাণ্ড রামায়ণের অবতারণা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আশার যোগসাধনের সহিত রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের যোগসাধনের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে বলিয়াই, আশার যোগসাধনই বুঝাইয়া দিবার জন্যই রাবণ, কুম্ভকর্ণ

এবং বিভীষণের যোগসাধন বর্ণিত হইতেছে। তুমি অবশ্যই জান যে, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, তিন সহোদর ভ্রাতা। তিন জনই ঋষিপুত্র এবং তিন জনই রাক্ষস। ইহাও শুনিয়াছ যে, উক্ত তিন জনই 'অমর' হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। এখন সহজ কথায় বলি শুন;—

উক্ত তিনটী রাক্ষসই মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তপস্যায় বা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "আমরা কখনও মরিব না" এই আশা করিয়াই তাহারা যোগসাধন করিয়াছিল। আবার বলি; তাহারা 'অভিনিবেশ' হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ যোগবল বা যোগবীর্য্য লাভ করিয়াই তাহারা যোগে উন্মত্ত হইল। মৃত্যুকে তখন অগ্রাহ্য করিয়া সকলেই নিজ নিজ মস্তক ছেদন করিয়া ব্রহ্মার তুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হইল। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; কেননা কথায় অনেক কথা বাড়িয়া যাইবে। এখন আশার যে যোগসাধনের কথা বলিয়াছি, তাহার সহিত এই তিন জনের যোগসাধন মিলাইয়া দেখ। কিন্তু আরও একটু বলি, না বলিয়া হৃদয়ের বেগ নিবারণ করিতে পারিতেছি না; সেই জন্যই বলিতেছি শুন;—

রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ তিন জনই প্রথমে আশার বলেই তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে যোগবল লাভ করিয়া তিন জন তিন প্রকার যোগফল লাভ করিয়াছিলেন। তামসিক আশাই তিন জনেরই যোগপথের নিয়ন্ত্রী বটে, কিন্তু শেষে কুম্ভকর্ণ তমোগুণে এবং

রাবণ রজোগুণে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ; আর বিভীষণ সত্ত্বগুণেই সিদ্ধিলাভ করিলেন।

অতএব তোমার যে সিদ্ধির আবশ্যক হউক্ না কেন, তুমি আশাকে নিঃসন্দেহে অবলম্বন করিতে পার। আশা যে তোমার সহজাত সম্পত্তি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আশা যে ক্লেশের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত, তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু আশা তামসিক বলিয়া অনেক সময় নিতান্ত অন্ধবৎ অন্ধকারেই ছুটা ছুটি করে। কোথায় সুখ, কোথায় সুখ, বলিয়া অরণ্যে কন্দরে সমুদ্রে শ্মশানে উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করে। মৃত্যুভয়ে হতজ্ঞান হইয়া দিশে-হারা হইয়া যেন কবন্ধের মত দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া অতিবেগে ধাবিত হয়!! সেই জন্যই সুখের প্রত্যাশায় ধাবিত হইয়া দুঃখেই পতিত হয় ; এবং মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পলাইতে গিয়া শেষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখেই পতিত হয়। সেই জন্যই বলি, আশাকে একটু সংযত করিয়া তাহাকে যথার্থ পথেই নিয়োজিত কর। তাহাকে যোগসাধনে নিয়োজিত কর। যদি এখনও বল আশাকে যোগসাধনে নিয়োজিত করিব কেন? যোগসাধনে আশার কি ফল লাভ হইবে? যোগসাধনে স্মরণশক্তির বৃদ্ধি হয়, একথা যেন স্বীকার করিলাম, অথবা এ কথাও স্বীকার যে কেন করিব তাহাও এখনও বুঝিতে পারি নাই। আবার আশা যে ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি চায়, যোগসাধনে যে সেই ক্লেশ দূর হয়, এ কথাই বা গ্রাহ্য করি কিরূপে? তুমি এ সকল কথা

বলিতে পার বটে। সেই জন্য বলিতেছি, শুন, আমার কথা গ্রাহ্য করিতে বলিতেছি না। শুন, শুন, পরম ঋষি কি বলিতেছেন শুন ;—

স হি সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ।

এই যোগসাধন সমাধি-ভাবনার জন্য অর্থাৎ একাগ্রতা উৎপাদনের জন্য এবং এই যোগসাধন ক্লেশক্ষয় করিবার জন্যই কর্ত্তব্য।

এখন বিশ্বাস হইল কি ? এই যোগসাধনে যে কেবল মনের একাগ্রতা বা মনোযোগই লাভ হইবে, আর কিছু লাভ হইবে না, তাহা নহে। অতএব এখন তোমার আশাকে এই যোগসাধনে নিয়োজিত করিতে পার কি না ? তুমি মনে মনে ভাবিতেছ কি ? আমি বুঝিয়াছি। তোমার মনে হইতেছে ;—"নিজের মাথা কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি না দিলে, যোগসাধনে সিদ্ধিলাভ হইবে না। এ যোগের কথা আর শুনিব কি ? ইহা না শুনাই ভাল। এখান হইতে অগ্রেই পলায়ন করা কর্ত্তব্য।" শুধু এই পর্য্যন্তই যে তোমার চিন্তার সীমা তাহাও নহে। আমি রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের উদাহরণ দিয়া দেখিতেছি, সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছি। তোমার মনে যদিও একটু বিশ্বাস স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া যেন একটু বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি নানাবিষয়ক ঘোরতর সন্দেহে চঞ্চলচিত্ত হইয়াছ। তুমি মনে করিতেছ, বাস্তবিক কি এই পৃথিবীতে

রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ জন্মিয়াছিল? যথার্থই কি তাহারা স্ব স্ব মস্তক ছেদন করিয়া তপস্যা করিয়াছিল? যথার্থই কি রাবণের দশটা মাথা ছিল? অথবা এ সকল কবিকল্পনা? এ সকল ঋষির রূপক বর্ণনা? এ সকল ব্যাপার কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন দেখিতেছি তোমাকে স্থির করা বড়ই দুষ্কর ব্যাপার। এখানে তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে 'ধান ভানিতে, শিবের গীত' আসিয়া পড়ে। প্রস্তাব অনন্ত হইয়া পড়ে। অতএব তোমাকে বলিতেছি, তুমি রাবণ ও কুম্ভকর্ণের কথা ভুলিয়া যাও। আমি এখন বুঝিতেছি, বড়ই একটা অন্যায় কাজ করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি এখন উহাকে মন হইতে দূর কর। শুন;—

ক্লেশ দূর করিবার জন্য, এ জগতে ইতর জন্তুরাও যোগসাধন করে। ক্লেশ দূর করিবার জন্য এ জগতে ইতর লোকেরাও যোগসাধন করিয়া থাকে।

ঐ দেখ, একটা কুকুর আহারের অন্বেষণে বেড়াইতেছে। সে যোগী হইয়াই যে বেড়াইতেছে, একথা বলাই বাহুল্য। কেননা ক্ষুধায় তাহার জঠরানল জ্বলিতেছে, সুতরাং সে সেই ক্ষুধার প্রতিই মনোযোগী হইয়া আহারান্বেষণ করিতেছে। ক্ষুধার ক্লেশ দূর করিবার জন্যই সে মনোযোগী হইয়াছে। সুতরাং ক্ষুধার ক্লেশ তাহাকে যোগী করিয়াছে। ঐ দেখ, পথিমধ্যে সে কিছু খাদ্য পাইয়া মহাসুখে ভোজন করিতেছে। এখন সে সুখেই যোগী হইয়াছে; সুখের প্রতিই তাহার মনোযোগ রহিয়াছে।

দেখ, কুকুরের দুঃখযোগের পরই সুখযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা! একখান গাড়ী আসিয়া সুখ-যোগে মগ্ন কুকুরের একখানি পা ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া গেল! যেমন্ পা ভাঙিল, অমনই সুখযোগও ভাঙিল, আবার দুঃখযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন কুকুর মহাশয় কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ করিতে করিতে ধাবিত হইতেছেন। কিন্তু ভগ্নপদের অসহনীয় যাতনা আর তাঁহাকে দৌড়িতে দিল না। সেই যাতনা বা ক্লেশ আবার কুকুরকে যোগী করিল। কুকুরের সমগ্র মন সেই যাতনায় অভিনিবিষ্ট হইল। কুকুর পুনরায় যোগী হইয়া, নিস্তব্ধ ও নীরব হইয়া, সেই যোগ সাধন করিতে লাগিল। অর্থাৎ সেই বেদনায় একাগ্রচিত্ত হইয়া স্থির হইয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিল। সে যোগ-সাধনে কি সিদ্ধিলাভ করিবে না? তাহার যোগফল কি ফলিবে না?

ঐ দেখ, স্বয়ং ভগবতী মা অন্নপূর্ণা দেবী আসিয়া, ঐ কুকুরের নিকট আবির্ভূত হইয়া কি বলিতেছেন শুন;—

"বাবা! তোমার কি হয়েছে? অশ্রুপাত করিতেছ কেন? আমি তোমার বেদনা ভাল করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি যথাসাধ্য চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! আবার কিছুক্ষণ পরেই দেখ, কুকুর সুস্থ হইয়া আহারের অন্বেষণে পূর্ব্ববৎ ভ্রমণ করিতেছে!

কেমন, তুমি কুকুরের এই যোগসাধন বুঝিতে পারিলে কি? আবার কি ভাবিতেছ? ও! বুঝিয়াছি। তুমি মনে মনে ভাবিতেছ, আমি ত কুকুরের নিকট কোন দেবতাকেই

আসিতে দেখিলাম না! ভগবতী মা অন্নপূর্ণা দেবী কোথায় কখন আসিয়া কুকুরকে সুস্থ করিলেন?

আমি এখানেও আবার ভুলিয়াছি। কেবল সাধনা দ্বারাই যে চক্ষুলাভের সম্ভাবনা, সে চক্ষু যে তোমার এখন নাই, ইহা আমার মনে ছিল না। তোমার ইহাতে দোষ কি? ইহা ঘোর কলির দোষ। তুমি ভগবতী জননী অন্নপূর্ণাকে কখনও দেখ নাই কি? তোমার চক্ষুতে একটী বালুকণা পড়িয়া যখন তোমাকে ক্লেশে অস্থির করে, তখন সেই বালুকণাকে তোমার চক্ষু হইতে অপসারিত করে কে? এম্ ডি ডাক্তার মহাশয় আসিয়া কি সেই বালুকণা উদ্ধৃত করিয়া দেন? হা অন্ধ! তুমি এমন প্রত্যক্ষ দেবতাকে দেখিতে পাও না!? যে দেবতা তোমার চক্ষু হইতে বালুকণা অপসারিত করিয়া তোমাকে যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করেন, তিনিই অন্নপূর্ণা নামে বিশ্বেশ্বরের সহিত কাশীতে বাস করেন। এই ভগবতী জননী অন্নপূর্ণার অপর নাম **প্রকৃতি**। এই বিশ্বেশ্বরের অপর নাম **ঈশ্বর**। এই কাশীর অপর নাম **দেহ**। কাশীস্থিত অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য যে জানে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না।

যাহাহউক, পরের কথা এখন থাক্। এখন কুকুরের যোগসাধনই আরও একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্।

এ জগতে একাগ্রচিত্তে যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। ইহা অতীব আশ্চর্য্য রহস্য বটে, কিন্তু ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য। এই জন্যই একটী প্রবচন আছে যথা;—

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

কিন্তু এখানে ভাবনা শব্দে সমাধি বা একাগ্রতাই বুঝিতে হইবে। অতএব বুঝিয়া রাখ যে, মনোযোগ দ্বারা এ সংসারে অতি দুর্লভ বস্তুও লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি যেরূপ উদ্দেশ্য লইয়া যোগসাধন করে, সে ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে।

কুকুরের যোগসাধনের উদ্দেশ্য কি? ক্ষুধার শান্তি। ইতর জন্তুগণের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কয়টী? আহার-নিদ্রা-মৈথুন। ইতর জন্তুরা এই তিনটী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যোগসাধন করে। সুতরাং তাহারা সকলেই এ জগতে সিদ্ধিলাভ করে।

কিন্তু এই সিদ্ধি কিরূপ? আশু ক্লেশের নিবারণ। এই সিদ্ধি দ্বারা স্থিরতর বা স্থায়ি সুখের সম্ভাবনা নাই। সকল জীবই এ সংসারে ক্ষুধায় কাতর হইয়া যোগসাধন করিলেই অন্ন প্রাপ্ত হয়; যেহেতু এ সংসার অন্নপূর্ণারই রাজত্ব। কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়া কতক্ষণ থাকে? অদ্য সমস্ত দিন ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যোগসাধনে তৎপর হইয়া ক্ষুধার শান্তি হইল। রাত্রিতেও নিদ্রা হইল; কিন্তু তৎপরদিনই আবার ক্ষুধার ক্লেশ উপস্থিত হইল, আবার যোগসাধনে প্রবৃত্ত করিল। অতএব এই যোগসাধন যে ক্ষণিক দুঃখ নিবারণের উপায়মাত্র তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আবার কেবল ক্ষুধাই যে একমাত্র ক্লেশ তাহা নহে, এ সংসারে ক্লেশের সীমাসংখ্যা নাই। দেখ, বেচারি কুকুর ক্ষুধার জন্য কাতর হইয়া যোগসাধনে কৃতকার্য্য হইল, আহার প্রাপ্ত হইল, কিঞ্চিৎ সুখের মুখ দেখিল, কিন্তু দৈব

আসিয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। কুকুরের এক নূতন ক্লেশ উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রকৃতির সন্তান পুনরায় যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া মাতার অনুগ্রহ লাভ করিল; প্রকৃতির চিকিৎসায় আবার আরোগ্য প্রাপ্ত হইল। কিন্তু স্বয়ং অন্নপূর্ণাও কি এই কুকুরকে স্থায়ি সুখের ব্যবস্থা করিতে পারেন? কিরূপে পারিবেন! যে জীব যতটুকু সাধনা করে, তিনি তাহাকে ততটুকু ফল দিতে পারেন, তদতিরিক্ত ফল দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সেই জন্য এই কুকুর আবার তিন খানি পা লইয়াই ক্ষুধাশান্তির জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইবে; কিন্তু কে বলিতে পারে যে, তাহার আর একখানি পা কখনও ভগ্ন হইবে না? ঐ দেখ, কুকুর লোভবশে গৃহস্থের রসুই ঘরে প্রবেশ করিয়া কিরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে! গৃহস্থ ক্রোধের বশে কুকুরের আর একখানি পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন! আবার কুকুর কেঁউ—কেঁউ—কেঁউ করিতে করিতে কোনরূপে প্রাণপণ চেষ্টায় পলাইয়া পথিপার্শ্বে পড়িয়া যন্ত্রণায় মনোযোগ দিল। এবারও অন্নপূর্ণা আসিয়া তাহার ক্লেশ দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু কুকুর দুই খানি পা লইয়া ক্ষুধার শান্তির জন্য যোগাভ্যাসে অশক্ত হইল। যোগাভ্যাসে অশক্ত হইলে, অন্নপূর্ণাও তাহাকে অন্ন দিতে অশক্ত হইলেন। যে জন্য যেরূপ যোগাভ্যাসের প্রয়োজন, সেই জন্য ঠিক্ তদ্রূপ যোগাভ্যাস করিতেই হইবে। নতুবা এ সংসারে কেহই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না। কুকুরের কথা দূরে থাক্, স্বয়ং বিশ্বেশ্বরও অন্নলাভের চেষ্টায় তদনুযায়ী যোগাভ্যাস না করিলে, অন্নলাভে বঞ্চিত হইবেন

এবং তাঁহাকেও অন্নের জন্য কাতর হইয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে।

যাহাহউক, কুকুর অন্নলাভের জন্য যোগাভ্যাসে (যোগ-সাধনার্থ যত্ন বা চেষ্টা করিতে) অসমর্থ হইলে, তাহাকে ক্ষুধায় কাতর হইতে হইল। কিন্তু অন্নপূর্ণা সেই ক্লেশ-যোগেও তাহাকে কোনরূপে ক্লেশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। তখনও তিনি তাহার নিকট আসিয়া তাহার ক্ষুধাশান্তির জন্য তাহার জঠরাগ্নিতে তাহা-রই শরীরের সমস্ত রসভাগ আহুতি দিতে লাগিলেন। ক্রমে জঠরাগ্নি সেই রস সমস্ত ভক্ষণ করিয়া আবার প্রজ্বলিত হইল। অন্নপূর্ণা তখন তাহার শরীরের রক্তও জঠরাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। ক্রমে রক্তও নিঃশেষিতপ্রায় হইল; সুতরাং তখন তাহার প্রাণস্বরূপ বীর্য্য বা ওজঃ নিরবলম্ব হইয়া তাহার প্রাণকে অন্তিম দশায় উপস্থিত করিল।

এই অন্তিম দশায় কুকুর ক্লেশেরও অন্তিম সীমায় উপ-স্থিত হইল। এই ক্লেশযোগেও সে তখন চূড়ান্ত যোগী হইল। তাহার শরীরের স্পন্দন পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ হইল; শ্বাস-প্রশ্বাসও রহিত হইল! এখন সে প্রায় নিরুদ্ধচিত্ত মহাযোগীর অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন অভয়া অন্নপূর্ণা আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কিরূপ আশ্বাস দিতেছেন, শুন;—

"বাবা, ভয় কি? কাতরতা ত্যাগ কর। তোমাকে আবার নূতন শরীর প্রদান করিব।"

কুকুর আবার নূতন দেহ লাভ করিল! মা তাহাকে কত

আদর করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাহার অস্তিত্বযোগের ফলেই সে এত আদর পাইতে লাগিল। সে মাতৃগর্ভে মাতার শোণিতে পালিত এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃ-স্তন্যে লালিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার এই যোগৈ-শ্বর্য্য কত দিন থাকিবে? শীঘ্রই তাহাকে আবার নূতন যোগাভ্যাসে ব্রতী হইতে হইবে। আবার তাহাকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দেহত্যাগকরতঃ আবার নূতন দেহ লাভ করিতে হইবে। এই চক্রাবর্ত্তের নিবৃত্তি কোথায়? এই অনন্ত ক্লেশের নিবৃত্তি কোথায়?

যাহাহউক, আমাদের উদ্দেশ্য হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখান হইতে চল।

আমার এত কথা বলিবার প্রধান উদ্দেশ্য যে, যোগ বা মনোযোগ দ্বারা ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। এই মনোযোগ ইতর জন্তুদেরও মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের যোগ নিতান্ত তামসিক। সেই জন্যই তাহাদের যোগফলও তদনুরূপ। মনুষ্যেরা ইতর জন্তুগণের নিকট হইতে এই তামসিক যোগসম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছে। কুকু-রের পা ভাঙ্গিয়া গেলে কুকুর নিস্তব্ধ হইয়া থাকে; ইহা দেখিয়াই ডাক্তার মহাশয়ের গুরুমহাশয়, মানুষের তদ্রূপে হাত-পা ভাঙ্গিলে ভগ্নস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রোগীকে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কুকুর চারি খানি পা লাভ করিয়াও, দুই খানির কার্য্য-কারিতা হারাইয়া শেষে খাদ্যাভাবে মরিয়া যায়, ইহা

দেখিয়া মানুষ স্বতঃই বুঝিতে পারে যে, এরূপে খাদ্যাভাবে আমারও মৃত্যু ঘটিতে পারে। সেই জন্যই মানুষ পিপীলিকা ও ইঁদুরের নিকট খাদ্য-সঞ্চয়-যোগ শিক্ষা করিয়াছে। এই পিপীলিকা ও ইঁদুরের যোগ শিক্ষা করিয়াই, মানুষ সেই যোগের উৎকর্ষ সাধন করতঃ ধনী, জমীদার, রাজা, মহারাজ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

কিন্তু কুকুরের অপেক্ষা পিপীলিকা ও ইঁদুর কিছু উন্নত যোগা বলিয়া কুকুরের অপেক্ষা পিপীলিকা ও ইঁদুরের ক্লেশও কিছু অল্প। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, ধনী, জমীদার ও রাজা মহাশয়েরা এই পিপীলিকা ও ইঁদুরের অপেক্ষা কি পরিমাণে উন্নত? এই পিপীলিকা ও ইঁদুরের ক্লেশের অপেক্ষা ধনী, জমীদার ও রাজা মহাশয়দের ক্লেশ কি পরিমাণে ন্যূন?

যাহা হউক, আমি তোমার কাছে আমার এ প্রশ্নের উত্তর চাই না। ইহা এ স্থানের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কিন্তু তুমি এই প্রশ্নের উত্তর মনে মনে চিন্তা করিয়া রাখিবে, কেননা যদি কখনও আবশ্যক হয়, তখনই উত্তর দিতে পারিবে। অথবা এখন তোমার সে চিন্তা করিবারও প্রয়োজন নাই; কেননা কি জানি, যদি হিতে বিপরীতই ঘটে! যদি তুমি এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া নিরাশ হও! তাই বলি, তুমি এখন মনে কর, ধনী, জমীদার, রাজা, বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত, ও বাগ্মী ইঁহারাই মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য বা আদর্শ মনুষ্য। তুমি যে লক্ষ্য স্থির করিয়া আসিয়াছ, তাহা ইঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে অবস্থিত নহে। অর্থাৎ তুমি যে

স্মরণশক্তির উৎকর্ষ চাও, সেই উৎকৃষ্ট স্মরণশক্তি তোমাকে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত করিতে পারিবে, বহু শাস্ত্রজ্ঞ দিগ্‌বিজয়ী করিতে পারিবে, মহাবাগ্মী করিতে পারিবে; সুতরাং তাহাই তোমাকে মহাসম্ভ্রান্ত, ধনী, জমীদার ও রাজা করিতে পারিবে। এই রাজা হওয়া পর্য্যন্তই তোমার উচ্চতম লক্ষ্য। কেমন হে? এই কথাই ঠিক্ কি না?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রাজা, মহারাজ হইবারই বা উদ্দেশ্য কি? ক্লেশনিবারণ বা সুখলাভই উদ্দেশ্য। অতএব স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধনের চরম লক্ষ্য কি? সুখ বা ক্লেশ-নিবারণ। যোগসাধনে সেই সুখ লব্ধ হয় বা ক্লেশ নিবৃত্ত হয়। সেই জন্যই যোগীরা রাজত্ব বা মহারাজত্ব তুচ্ছ করিয়া থাকেন। রাজা বা মহারাজ হইয়াও যে সুখ লাভ করা যায় না, যোগীরা সেই সুখ লাভ করেন। ইহার একটী জীবন্ত জ্বলন্ত উদাহরণ দিতেছি ;—

শুন শুন ;—কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বারে যে মহাযোগ উপস্থিত হয়, সেই যোগের সময় অনেক যোগী—বিস্তর উলঙ্গ সন্ন্যাসী হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানের জন্য হিমাদ্রি-শিখর হইতে অবতরণ করেন। সেই সময় ভারতবর্ষীয় মহারাজ-গণ, যথা,—জয়পুরের মহারাজ, যোধপুরের মহারাজ, উদয়পুরের মহারাণা, মহারাজ সিন্ধিয়া, মহারাজ হোলকার, মহারাজ গাইকোয়ার, পাতিয়ালার মহারাজ, মহারাজ কাশ্মীরাধিপতি, ইত্যাদি ইত্যাদি বহুসংখ্যক নৃপতি, সেই উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের পদরজঃ গ্রহণমানসে তাঁহাদের আগমন-পথ মহার্হ কাশ্মীরি শাল দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন॥

সেই সকল মহারাজ, সেই উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের পদধূলিকে রাজভাণ্ডার অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান্ মনে করেন! সেই পদধূলি অপেক্ষা পবিত্রতর পদার্থ এ সংসারে আর কিছুই নাই, এইরূপ মনে করিয়াই সেই মহারাজগণ সেই পদধূলি প্রাপ্তির আশায় লালায়িত হন! এ রহস্যের মর্ম্ম কি? তুমি কিছু চিন্তা করিয়া বলিতে পার কি?

তুমি যেন মনে করিও না, যে এই সকল সন্ন্যাসীদের পথ একটু সুগম করিবার জন্যই অর্থাৎ পথক্লেশ কিছু নিবারণ করিবার জন্যই পরম দয়ালু মহারাজগণ সন্ন্যাসীদের পথে শাল-রুমাল বিছাইয়া রাখেন। এরূপ মনে করিলে তুমি মহাভ্রমে পতিত হইবে। সন্ন্যাসীদের ক্লেশ নিবারণ করা মহারাজগণের অসাধ্য। কিন্তু শত শত মনঃক্লেশে ক্লিষ্ট মহারাজগণ সেই সন্ন্যাসীদের পদরজঃ মস্তকে গ্রহণ করিয়া আপনাদের ক্লেশ দূর করিয়া থাকেন! যোগীদিগের পদ-ধূলিরও যখন এমন মাহাত্ম্য! তখন যোগসাধনে যে ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, তাহা কি আর বলিতে হইবে? তবে এক্ষণে যোগের বিষয়ই বলা যাউক্, শুন ;—

গুণভেদে যোগভেদ।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটী চিত্তের গুণ। এই গুণত্রয়ের বিভিন্নতাহেতু যোগেরও বিভিন্নতা আছে। চিত্ত এবং চৈতন্য এই দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থের যোগেই জীবের সৃষ্টি। গুণভেদে এই দুই স্বতন্ত্র পদার্থের সংযোগ-জন্য জীব-জগতে যে অনন্ত বিচিত্রতা সূক্ষ্মরূপে প্রত্যক্ষ

করা যায়, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য বা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য, স্থূল প্রত্যক্ষ কোন দুই পদার্থের তুলনা করা নিতান্ত আবশ্যক। উপমান ও উপমেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিক হইলেও, সহজে বুঝাইবার জন্যই উপমান ও উপমেয়ের কল্পনা করা হয়।

এক্ষণে চৈতন্য পদার্থের সহিত কাহার তুলনা করিব? এবং চিত্তক্ষেত্রের সহিতই বা কাহার উপমা দিব? পরম যোগী বলিয়াছেন ;—

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ।

সূর্য্যে চিত্তসংযম করিলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান উপলব্ধি করা যায়।

তবে দেখা যাউক্, সূর্য্যরশ্মির সহিত চৈতন্যের এবং প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ এই পৃথ্বিক্ষেত্রকে চিত্তক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিয়া আমরা কতটুকু জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

দেখি, সূর্য্যরশ্মিই এই জগতের বিচিত্রতার কারণ। সূর্য্যরশ্মি অতি উজ্জ্বল, নির্ম্মল এবং একমাত্র শ্বেতবর্ণ। কিন্তু সেই একমাত্র শ্বেতবর্ণ তিনটী পৃথক্ বর্ণের মিলনে উৎপন্ন। যথা,— নীল, পীত ও লোহিত। আবার এই তিন বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সম্মিলনে অসংখ্য অনন্ত বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। আমরা এই পৃথিবীতে সেই অনন্ত বর্ণ দেখিতে পাই। আমরা দেখি, একই বৃক্ষের প্রত্যেক পত্র স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে! আবার একই পত্রের প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্র বর্ণ প্রকাশ করে! সুতরাং এই জন্যই বলিয়াছি, তিন বর্ণের

মিলনে অনন্ত বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। তবে বুঝিয়া দেখ, যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত যোগী অনন্ত যোগসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

এক্ষণে একটী সূক্ষ্ম কথার প্রতি মনোযোগ দাও। এইমাত্র যে বলিলাম, শুভ্র সূর্য্যরশ্মি তিনটী বর্ণের মিলনে উৎপন্ন এবং সেই তিনটী বর্ণের যোগেই অনন্ত বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে ; একথা যদিও ঠিক্ বটে, কিন্তু চৈতন্যের সহিত সেই সূর্য্যরশ্মির তুলনা করিতেছি বলিয়া সূর্য্যরশ্মিকে অনন্ত বর্ণের আধার মনে করিলে চৈতন্যকেও অনন্ত গুণের আধার বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু তদ্রূপ প্রতীতি হইলে ভ্রম জন্মিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গুণসকল চিত্তেরই, চৈতন্যের নহে। অতএব সূর্য্যরশ্মিকে বর্ণহীন বলিয়াই মনে কর। পার্থিব ক্ষেত্রেই এই বর্ণের আরোপ কর। পার্থিব বস্তু সকলের স্বতন্ত্র প্রকৃতিই তাহাদের স্বতন্ত্র বর্ণ গ্রহণের বা বর্ণ-বিকাশের হেতু। ইহা নিতান্ত আরোপিত নহে। কেননা, কেবল সূর্য্যকিরণই বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ নহে। যাহা হউক, সেই সূক্ষ্মতর্কের প্রয়োজন নাই।

চিত্তক্ষেত্রের তিনটীমাত্র গুণ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই তিন গুণের অনন্তরূপ মিলনে অনন্ত গুণের উদ্ভব হইয়াছে। সেই অনন্ত চিত্তক্ষেত্রে একমাত্র, অবিকৃত, অচঞ্চল, স্থির, সনাতন এবং সত্যস্বরূপ চৈতন্য প্রতিফলিত হইয়া অনন্ত কর্ম্মের উদ্ভব করিতেছেন!! ইহাই মহাযোগীর মহাধ্যানের বিষয়! যাহাহউক, এখন আমাদের বড় কথায় কাজ নাই। এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ যে, মানুষের চিত্ত

তিনটীমাত্র গুণের আধার হইলেও, সেই তিন গুণের বিভিন্ন-সমবায়বশতঃ বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করে এবং তজ্জন্যই মনুষ্যের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মসকল বিভিন্ন প্রকার হয়। তজ্জন্যই একই পিতার দুইটী যমজ সন্তানও আকৃতিগত সাদৃশ্য ধারণ করিয়াও প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য ধারণ করে। মনুষ্যের কথাও ছাড়িয়া দাও। ঐ যে দুইটী এক-গর্ভজ বিড়াল-শাবক দেখিতেছ, উহাদেরও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহাদের একটী যাহা ভালবাসে অন্যটী তাহা ভালবাসে না! উহাদের একটী মাছ খাইতে ভালবাসে, কিন্তু দুধ খাইতে ভালবাসে না; আর একটী দুধ খাইতে যত ভালবাসে, মাছ খাইতে তত ভালবাসে না। উহাদের মধ্যে একটী যাহার অনুগত, অন্যটী তাহার অনুগত নহে। যদি মনোযোগ দিয়া পরীক্ষা কর, তবে উহাদের প্রকৃতিগত এইরূপ প্রভেদ বিস্তর দেখিতে পাইবে।

শরীরস্থ বায়ুপিত্তকফের ন্যূনাধিক্য বিচার করিয়া চিকিৎসকেরা যে ঔষধের ব্যবস্থা করেন, সেই ঔষধ সকলের পক্ষে সমান কার্য্যকারী হয় না কেন? যেহেতু সকল মনুষ্যের শরীরে উক্ত বায়ুপিত্তকফের সমবায় একরূপ নহে। তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ধাতুই স্বতন্ত্র। কিন্তু সেই অনন্ত সমবায়ের বিচার করিয়া কোন্ চিকিৎসক ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারেন? তদ্রূপ বিচার মনুষ্য-চিকিৎসকের অসাধ্য। সেইজন্য ধন্বন্তরির ব্যবস্থাও পাত্রবিশেষে ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

চিত্তগুণের প্রভেদহেতুই জগতে মতভেদ দেখা যায়।

এই জন্যই নানা মুনির নানা মত, বিবিধ শাস্ত্রের বিবিধ বিধান।

যাহাহউক, যেমন চিকিৎসকেরা চিকিৎসাকার্য্যের সুবিধার জন্য বায়ুপিত্তকফের সমবায়কে কতিপয় প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন, তদ্রূপ যোগের সুবিধার জন্য সত্ত্বরজস্তমোগুণের সমবায়কেও কতিপয় প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক। তজ্জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে যেমন বাত-পৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, কফ-বাতিক প্রভৃতি ধাতুর বিভাগ করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে; আমরাও তেমনই সত্ত্বরজস্তমঃ প্রকৃতি-সমবায় অনুসারে যোগের বিভাগ করিতেছি; যথা;—

যোগবিভাগ।

(১) তমোরাজসিক। (২) রজস্তামসিক।
(৩) রজঃসাত্ত্বিক। (৪) সত্ত্বরাজসিক।

(১) যে চিত্তে তমোগুণ অতিরিক্ত, রজোগুণ তদপেক্ষা অল্প এবং সত্ত্বগুণ তদপেক্ষাও অল্পতর, সেই চিত্তকেই তমোরাজসিক বলিয়া জান।

(২) যে চিত্তে রজোগুণ অতিরিক্ত, তমোগুণ তদপেক্ষা অল্প এবং সত্ত্বগুণ তদপেক্ষাও অল্পতর, সেই চিত্তকেই রজস্তামসিক বলিয়া জান।

(৩) যে চিত্তে রজোগুণ অতিরিক্ত, সত্ত্বগুণ তদপেক্ষা অল্প এবং তমোগুণ তদপেক্ষাও অল্পতর, সেই চিত্তকেই রজঃসাত্ত্বিক বলিয়া জান।

(৪) যে চিত্তে সত্ত্বগুণ অতিরিক্ত, রজোগুণ তদপেক্ষা অল্প এবং তমোগুণ তদপেক্ষাও অল্পতর, সেই চিত্তকেই সত্ত্বরাজসিক বলিয়া জান।

যে চারি প্রকারে চিত্তের বিভাগ করা হইল, তদপেক্ষা অতিরিক্ত বিভাগের প্রয়োজন নাই। * উক্ত চারি প্রকার চিত্তের মধ্যে প্রথম প্রকারই নিকৃষ্ট এবং শেষ প্রকারই উৎকৃষ্ট। অথবা প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় এবং তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ, ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট।

তমোরাজসিক চিত্তকেই শূদ্রপ্রকৃতি বলা যায়।

রজস্তামসিক চিত্তকেই বৈশ্যপ্রকৃতি বলা যায়।

রজঃসাত্ত্বিক চিত্তকেই ক্ষত্রিয়প্রকৃতি বলা যায়।

সত্ত্বরাজসিক চিত্তকেই ব্রাহ্মণপ্রকৃতি বলা যায়।

উক্ত চারি প্রকার চিত্তগুণ অনুসারেই লোকে কর্ম্ম করে; এবং সেই কর্ম্মানুসারেই তাহারা চারি বর্ণে বিভক্ত হয়। এখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিম্নলিখিত বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর। যথা;—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

---

* অতিরিক্ত বিভাগ যে নাই, এরূপ মনে করিও না। এস্থলে দুইটী বড় বড় বিভাগ পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যথা;— তমঃসাত্ত্বিক এবং সত্ত্বতামসিক। বালোন্মত্তপিশাচবৎ যোগীদিগের চিত্ত তমঃসাত্ত্বিক বলা যায়। আর ঊর্দ্ধবাহুস্থাণু প্রভৃতি কৃচ্ছ্রতপাঃ যোগীদিগের চিত্ত সত্ত্বতামসিক বলা যায়। কিন্তু ইঁহারা সংসারের বহির্ভূত (এক রকম সৃষ্টি-ছাড়া জীব) বলিয়া গণনারও বহির্ভূত হইয়াছেন। তবে জানা উচিত যে, তমঃসাত্ত্বিকগণের স্থান রজঃসাত্ত্বিকগণের নিম্নে; কিন্তু সত্ত্বতামসিকগণের স্থান, রজঃসাত্ত্বিকগণের উপরি। ফলতঃ সত্ত্বগুণের ন্যূনাধিক্যই স্থানের ইতর-বিশেষ জ্ঞাপন করে।

সত্ত্বরজস্তমোগুণের কর্ম্মবিভাগ অনুসারেই অথবা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ এবং তাহাদের অনুবর্ত্তি কর্ম্ম-বিভাগ অনু-সারেই আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।

যাহাহউক, বর্ণপরিচয় এখন আমাদের অনাবশ্যক। যোগপরিচয়ই আবশ্যক, অতএব শুন ;—

তমোরাজসিক যোগ।

যোগের মধ্যে এই যোগ নিকৃষ্ট। কিন্তু ইহা দ্বারাও সাংসারিক অশেষ উন্নতি লাভ করা যায়। এই যোগ কিরূপ? ইহা বুঝিবার জন্য উদাহরণস্থলে ভীষণ তমো-গুণান্বিত সর্পকে প্রথমে গ্রহণ করা যাউক্।

সর্পের প্রকৃতি কিরূপ? ইহা হিংস্র! জীবগণের সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ, মারাত্মক।

সর্প হিংস্র ও সর্ব্বজীবের মারাত্মক বলিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু। যে, যে পরিমাণে হিংস্র, সে সেই পরিমাণে স্বীয় প্রাণের আশঙ্কা করে; সুতরাং সে সেই পরিমাণে ভীরু হয়। ফলতঃ যাহাকে দেখিলেই সকলে ভীত হয়, সেও সকলকেই দেখিলে তদ্রূপ ভীত হইয়া থাকে। সেই জন্যই সর্প অতি নিভৃত স্থানে বাস করে, অত্যন্ত দ্রুত গমন করে এবং যথাসাধ্য সকলের অগোচরে ভ্রমণ করে। সর্প নিজের প্রাণের জন্যই যোগী। সে স্বীয় সন্তানগণকেও ভক্ষণ করে! বোধকরি সে মনে করে যে, "ইহারাও কালক্রমে বিষদন্তাঘাতে আমাকে প্রাণে বধ করিবে।" তবে অবশ্য সর্পের মনের কথা ঠিক্ জানি না। জগদীশ্বরের মহিমা অতি বিচিত্র ও অনন্ত! মনুষ্যবুদ্ধি তাহার কতটুকু

ধারণা করিতে সমর্থ ? যাহা হউক, সর্পের প্রকৃতি এইরূপ জঘন্য বলিয়াই লোকে সর্পকে ক্রূর, হিংস্র প্রভৃতি আখ্যা দিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করে। এই সর্পও কিন্তু স্বীয় প্রাণের জন্য মহাযোগী! এই সর্প বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া অথবা কুম্ভক নামক যোগ দ্বারা বহুকাল অনাহারেও প্রাণরক্ষা করিতে পারে। ফলতঃ অনাহারেও কিরূপে প্রাণরক্ষা করা যায়, এই তত্ত্ব যোগীরাও ভেক ও সর্পের নিকটই শিক্ষা করিয়াছেন।

যাহাহউক, যোগীরা এই সর্পের নিকট কেবল যে অনশনেও প্রাণরক্ষা করিতে শিখিয়াছেন, আর কিছু শিখেন নাই, তাহা মনে করিও না। যোগীরা যোগসাধনের সর্ব্বপ্রথম সাধনও এই সর্পের নিকট হইতেই শিখিয়াছেন। সেই প্রথম সাধন অহিংসা। একটী চলিত কথা আছে, "আদব্ শিখিলে কোথায় ?" উত্তর, "বেয়াদবের কাছে।" অর্থাৎ অজ্ঞান ও মূর্খের নিকট হইতেই জ্ঞান শিক্ষা করা যায়। পাপের ফল কি, যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তবে পাপীর নিকট হইতেই ভালরূপে শিক্ষা পাইবে। যদি মদের দোষ জানিতে চাও, তবে মাতালের নিকট হইতেই ভাল শিক্ষা পাইবে। এস্থলে সহসা এই উপদেশ অতি বিচিত্র ও বিপরীত বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর তদ্রূপ বোধ হইবে না। তবে এই উপদেশের মধ্যে যেখানে "নিকট হইতে" এই কথা আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, "নিকট হইতে, কিন্তু দূরে থাকিয়া" অর্থাৎ পাপীর সংস্রবে না গিয়া দূর হইতে তাহার কর্ম্ম-ফল-ভোগ দর্শন করিবে। ক্রূর সর্পের নিকটে

যাওয়া যেমন বিধেয় নহে, তেমনই পাপীর নিকটে যাওয়াও বিধেয় নহে। অথচ তাহাদের কর্ম্মফলভোগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই পাপের ফল কিরূপ, তাহা অবধারণ করা বিধেয়।

সর্পের নিকট যোগীরা যোগসম্বন্ধীয় আরও সূক্ষ্ম অতি অদ্ভুত যোগতত্ত্বও শিক্ষা করিয়াছেন। এখানে সে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিবার অবকাশ নাই; তবে ইঙ্গিতে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, যে "মেস্‌মেরিজম্" লইয়া অধুনা পাশ্চাত্য জগতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সেই "মেস্‌মেরিজম্ বিদ্যার" প্রথম আবিষ্কর্ত্তা "মেস্‌মার সাহেব" প্রথমে সর্পের নিকট হইতেই উক্ত বিদ্যার আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, অবকাশক্রমে সূক্ষ্ম যোগতত্ত্ব প্রকাশ করিব, এবং যোগের অসাধ্য-সাধন-শক্তিও সেই সময় ব্যক্ত করিব। এখন স্থূল বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক্। তমো-রাজসিক যোগের বিষয় এখন মনুষ্য-গুরুর নিকট কিরূপ শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই দেখা যাউক্।

পূর্ব্বকালে কোন গ্রামে শ্রীচরণ বাগ্‌দির ভীমচরণ নামে একটী পুত্র হয়। ভীমচরণ অল্পবয়সেই অতি দুষ্ট ভীমে বলিয়া পল্লীর সকল বালকের নিকট পরিচিত হইল। ভীম স্বভাবতঃই অন্যান্য বালকের অপেক্ষা বলবান্। সে অত্যন্ত পেটুক ছিল। তাহার ক্ষুধা অল্পে নিবৃত্ত হইত না। সে প্রতিবেশীর বাগান হইতে সর্ব্বদাই ফল-মূল শাকসব্‌জি চুরি করিত। সঙ্গী বালকদের হাত হইতে খাবার জিনিষ কাড়িয়া খাইত; সুতরাং তজ্জন্য ভীমকে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ প্রহার সহ্য করিতে হইত। কিন্তু ভীম প্রহারকে

তত ভয় করিত না। ক্রমশঃ সে অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া গ্রাম-বাসী অনেককেই জ্বালাতন করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহার বন্ধুরও অভাব ছিল না। যে তাহাকে কিছু খাবার জিনিষ দিত, ভীম প্রাণপণে তাহার উপকার করিত; সুতরাং তাহাকে অনেকে ভাল বাসিয়া খাইতে দিত। ভীম ক্ষুধার জ্বালাতেই অত্যাচার করিত, অন্য কোন কারণে কথনও অত্যাচার করিত না। কিন্তু এই ক্ষুধার জন্য অত্যাচার করিয়া সে মধ্যে মধ্যে পিতার নিকট, জমীদার রামচাঁদ চৌধুরীর নিকট এবং দারোগা মহাশয়ের নিকট, বিলক্ষণ শিক্ষা পাইত। সে সকল আদ্যোপান্ত পরিচয় দিতে গেলে একখান বড় নভেল লিখিতে হয়। যাহা হউক, শেষে একদিন কোন গুরুতর অত্যাচারের জন্য জমীদার মহাশয় তাহাকে ধরিতে চারিজন পেয়াদা পাঠাইয়া দেন। ভীম তাহাদিগকে বিশেষরূপ উত্তম-মধ্যম দিয়া বিদায় করিয়া দেয়; কিন্তু স্বয়ং একখান ছোরা লইয়া কোথায় পলাইয়া যায়। দুই চারি দিন পরেই ভীম রামচাঁদ চৌধুরীর নিকট স্বেচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হুজুর আমাকে আপনি প্রতিদিন খেতে দিন্, আমি বিনা বেতনে আপনার পেয়াদা-গিরি করিব। আর যদি ইহাতে সম্মত না হন, তবে এখনই আপনার সাক্ষাতে আমি এই ছোরা বুকে বসাইয়া আত্ম-হত্যা করিব।" জমীদার মহাশয়, তাহাকে বলিলেন, "তুই যত খেতে পারিস্, আমি তোকে তত খেতে দিব; আরও তোরে মাসিক দুই টাকা করিয়া বেতন দিব। তুই আজ হইতে আমার চাকর হইলি।"

জমীদার মহাশয় নিজের চারি জন পেয়াদার দুর্দ্দশা দেখিয়া ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আর ভীমকে শাস্তি না দিয়া তাহাকে গ্রামের পাইকের কাজ দিলেন।

আজ হইতে ভীমচরণ আর ভীমে নহে। অদ্যাবধি তাহার নাম হইল ভীমসর্দ্দার। আজ হইতে ভীমের ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত হইল। ভীম যত অধিক ভোজন করিতে পারিত, জমীদার ততই অধিক সন্তুষ্ট হইতেন বরং অধিক ভোজনের জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার দিতেন। এখন ভীম-সর্দ্দারের আহারের চেষ্টা গেল; কিন্তু পরাক্রম-প্রদর্শনের চেষ্টা হইল। ভীমসর্দ্দার জমীদারের বাড়ী এক বৎসর কাজ করিয়াই একজন লাঠিয়াল ও পালোয়ানের সর্দ্দার হইলেন। তাহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র, কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিয়া কেহই বয়স অনুমান করিতে পারিত না।

ভীমের বয়স যখন ২৫ বৎসর, তখন কোন দিগ্বিজয়ী পালোয়ান বা খেলোয়াড় আসিয়া ভীমকে পরাস্ত করিতে পারিত না। ভীমের সাক্‌রেদ্ (শিষ্য) অনেক জুটিল। অর্থাৎ ভীম বহুশিষ্যের গুরু বা একজন প্রধান দলপতি হইলেন।

ভীম অতি দ্রুতবেগে দৌড়িতে ও সাঁতার দিতে পারিত। ফলতঃ যাবতীয় পরাক্রমের কার্য্যেই ভীম একজন অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইল।

ভীম ২৫ বৎসর বয়সের সময় এক সুন্দরী যুবতীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইল। ভীম এখন তাহার সহিত আদি-রসে মত্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার বীররস একটু কমিয়া

আসিল। এক বৎসর পরেই ভীমের পরাক্রমের অর্দ্ধেক নষ্ট হইল।

ভীমের পরাক্রমের জন্য জমীদার রামচাঁদ রায়চৌধুরী মহাশয় আপনাকেও গৌরবান্বিত মনে করিতেন। এই ভীমের সাহায্যে তিনি কত প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সহজে বশীভূত করিয়াছেন। কত দাঙ্গাহাঙ্গামায় জয়ী হইয়াছেন। অধিক কি, অনেক স্থানে ডাকাতি করিবার জন্যও ভীমকে প্রেরণ করিয়া অনেক অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছেন। ভীমও তজ্জন্য বেশ সম্পত্তিশালী হইয়াছে। কিন্তু সম্পত্তিশালী হইয়াই ভীম বিবাহ করিয়া বিলাসী হইয়া অর্দ্ধেক পরাক্রম হারাইয়াছে। বিবাহ করিবার একবৎসর পরেই ভীমের একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রটী ক্রমে এক বৎসরের হইল। এখন একদিন ঘটনাক্রমে রামচাঁদ রায়-চৌধুরীর সহিত অন্য এক পালচৌধুরী জমীদারের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পর কথাবার্ত্তায় পরস্পর প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রায়চৌধুরী স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন "আমার ভীমসর্দ্দারের অপেক্ষা পরাক্রান্ত বীর দ্বাপর যুগে ছিল, এখন আর নাই।" পালচৌধুরী বলিলেন, "আমার তুফান খাঁ আপনার তিনটা ভীমকে গিলিয়া খাইতে পারে।" উভয়ের এই বাগ্‌বিতণ্ডা শেষে এইরূপ পণে মীমাংসিত হইল যে, ভীমের সহিত যুদ্ধে যদি তুফান পরাস্ত হয়, তবে পালচৌধুরী এক হাজার টাকা দিবেন, আর যদি ভীম পরাস্ত হয়, তবে রায়চৌধুরী এক হাজার টাকা দিবেন।

যুদ্ধের জন্য সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু যুদ্ধে ভীম পরাস্ত হইল। রায়চৌধুরী হাজার টাকা হারিলেন। কিন্তু তিনি দশ হাজার টাকার জন্যও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। ভীমকে তিনি নিজেরই গৌরব-স্তম্ভ মনে করিতেন। ভীমের পরাজয়ে অভিমানী রায়চৌধুরীর হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া বলিলেন, "ভীমে, আজ তুই আমার মুখে কালীচুন দিলি। আমি আর তোর মুখদর্শন করিতে পারিব না, তুই শীঘ্র আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যা। তুই আর আমার গ্রামে থাকিস্ না।"

ভীমের আজ কি দুর্দ্দশা! ভীম কখনও এত মনঃকষ্ট পায় নাই। সে জমীদারের জন্য অনেক বার জেলে রুদ্ধ হইয়া মিয়াদ খাটিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাহার মনে আনন্দের বৃদ্ধি হইত, কখনও অপমানবোধ হইত না। কিন্তু আজ তাহার মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইল। সে তাহার পরাজয়ের কারণ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিল। স্ত্রীর প্রতি তাহার বিষম বিদ্বেষ জন্মিল। সংসারে স্বীয় দোষে সকলেই অন্ধ হয়, অন্যকেই বিপদের কারণ মনে করে, সেই জন্য ভীম তাহার স্ত্রীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু শিশুপুত্রের মুখ দেখিয়া স্ত্রীহত্যা করিল না। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া একবৎসর-বয়স্ক পুত্রটীকে লইয়া ভীম গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ভীম গ্রামান্তরে গিয়াও একজন দলপতি হইলেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি একটী ডাকাইতের দলের সর্দ্দার হইলেন।

এদিকে রায়চৌধুরী মহাশয় ভীমকে বিদায় দিয়া কোনরূপ প্রলোভনের বশীভূত করিয়া তুফান খাঁকে নিজের গৌরব-স্তম্ভ করিলেন। এই সংবাদও ভীমের হৃদয়ে শেল-বিদ্ধ করিয়াছিল।

দুই বৎসর পরেই ভীমসর্দ্দার গ্রামান্তর হইতে রায়-চৌধুরী মহাশয়কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিল ;—

"হুজুর, আগামী পরশ্ব পূর্ণিমার রাত্রিতে আমি আপ-নার বাড়ীতে গিয়া অতিথি হইব। আমার সঙ্গে চারিজনমাত্র লোক যাইবে। তুফান খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনি তাহাকে অতিথি-সেবার জন্য সতর্ক করিয়া দিবেন। আপনার অন্য কোন ভয় নাই। যেহেতু আমি আপনার নিমকের চাকর শ্রীভীমসর্দ্দার।"

পত্র পাইয়াই রায়চৌধুরী তুফান খাঁকে সতর্ক হইতে বলিলেন। তুফান খাঁ মহাতর্জ্জনগর্জ্জন করিতে লাগিল। জমীদার মহাশয় কিন্তু তাহার সাহায্যের জন্য প্রায় একশত লাঠিয়াল যোগাড় করিয়া রাখিলেন।

নির্দ্দিষ্ট পূর্ণিমার রাত্রিতে ভীমসর্দ্দার ৪জন সঙ্গীর সহিত উপস্থিত হইলেন। এই ৪ জনকে পৃষ্ঠরক্ষক করিয়া ভীমসর্দ্দার ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তুফানকে আক্রমণ করি-লেন। তুফান শত-সংখ্যক সহকারী লইয়া সাধ্যানুসারে আত্মরক্ষা করিয়াও ভীমকে নিবারণ করিতে পারিল না। এক ঘণ্টার মধ্যেই তুফানের মুণ্ড লইয়া শোণিতসিক্ত-কলে-বরে ভীম রায়চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

রায়চৌধুরী ভীমের তদানীন্তন মূর্ত্তি দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভীম অনেক যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া দিলেন। রায়চৌধুরী তখন কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ভীম, তুমি আমাকে প্রাণে বধ করিও না। তুমি যা চাও, আমি তোমাকে তাহাই দিব।"

ভীম রায়চৌধুরীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার নিমকের চাকর, আপনি কেন আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছেন? আমি এখন ডাকাইত বটে, কিন্তু ডাকাইত কখনও নিমক-হারাম হয় না। তবে আমি আপনার কাছে একটী ভিক্ষা চাই, তাহা আমাকে দিতে হইবে। আমা দ্বারা আপনি অনেক সম্পত্তি * * *

ভীমের কথা শেষ না হইতেই রায়চৌধুরী বলিলেন, "তুমি আমার কাছে কি সম্পত্তি চাও?"

ভীম। "আজ্ঞে আপনার কাছে আমি কোন সম্পত্তি চাই না। আপনি নিঃসন্তান। পোষ্যপুত্র গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমি পছন্দ করিয়া আপনাকে একটী ভাল পোষ্যপুত্র দিব।"

রায়। "বেশ বেশ, উত্তম কথা। আমি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। কল্যই তুমি পছন্দ করিয়া আমাকে একটী ভাল পোষ্যপুত্র দিবে। আমি তাহাকে যথাবিধি গ্রহণ করিব।"

ভীম স্বীয় পুত্রটীকে এক কাপালিক ব্রাহ্মণের নিকট রাখিয়াছিল। রায়চৌধুরী তাহাকেই ব্রাহ্মণপুত্র মনে করিয়া মহা-উৎসবে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ভীমের

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। গ্রামের সকলেই জানিল, রায়-চৌধুরী একটী তিনবৎসর-বয়স্ক ব্রাহ্মণসন্তানকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উৎসবান্তে ভীম রায়চৌধুরীকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন।

রায়চৌধুরী যখন জানিলেন, একটী বাগ্‌দীর ছেলেকে পোষ্যপুত্র লইয়াছেন, তখনই তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিবার নয়। নানা কারণেই ইহা গোপন রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ভীমসর্দ্দার তখন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন "আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি যত দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমিই ছেলেকে প্রতিপালনাদি করিব। কিন্তু আপনার পরে এই পুত্রই আপনার বিষয়াধিকারী হইবে। আমি ছেলেকে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখিয়াই শিক্ষা দিব। আমিই ব্রাহ্মণকে খরচ দিব, ব্রাহ্মণের অন্নেই সে পালিত হইবে এবং ব্রাহ্মণ দ্বারাই তাহার উপনয়ন-সংস্কার প্রভৃতি করাইব। আপনার এখন তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই।"

রায়চৌধুরী আশ্বস্ত হইলেন। এবং বলিলেন, "না না, আমিই সমস্ত খরচ দিব, তবে আমি তাহার সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিতে পারিব না, এই আমার বড়ই ক্লেশ থাকিল। আমি তাহাকে পুত্র বলিয়া লইয়াও তাহাকে ঠিক্ পুত্রের মত ব্যবহার করিতে পারিব না বলিয়াই আমি দুঃখিত হইতেছি। যাহা হউক্, আমিই তাহাকে প্রতি-পালন করিব এবং শিক্ষা দিব।"

কিন্তু রায়চৌধুরীর এ প্রস্তাবে ভীম স্বীকৃত হইলেন

না। তিনি স্বীয় পুত্রের শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন। ভীম রায়চৌধুরীকে আপনার অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন না। বরং ভীম রায়চৌধুরীকে অতিপাপাত্মা বলিয়াই জানিতেন। তবে "যাহার লুন খাওয়া যায় তাহাকে ভক্তি করিতে হয়" এই জ্ঞান থাকাতেই ভীম রায়চৌধুরীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। রায়চৌধুরীর সমস্ত ভীষণ দুষ্কার্য্য এবং নারকীয় চরিত্রের বিষয় ভীমের অজ্ঞাত ছিল না। ভীম আপনাকে এই রায়চৌধুরী অপেক্ষা পুণ্যবান্ বলিয়া জানিতেন। এই রায়চৌধুরীর সংস্পৃষ্ট অন্ন খাইলেও স্বীয় সন্তানের চরিত্র নষ্ট হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ভীম স্বীয় পুত্রকে রায়চৌধুরীর নিকট রাখিতে স্বীকৃত হইলেন না।

যাহাহউক, ক্রমে এক দুই তিন করিয়া তের বৎসর অতীত হইল। ভীম স্বীয় পুত্র রঘুনাথের ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাহাকে অভিষিক্ত কুলীন করিতে ইচ্ছা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, রঘুনাথও ষোড়শবৎসর বয়সের সময়ই প্রায় ভীমের তুল্য পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অদ্যাপি কুলীনরূপে দীক্ষিত হন নাই।

দস্যুরা আপনাদিগকে কুলীন বলে। তাহারা মহাকালীর সাক্ষাতে পিশাচ-সিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অভিষিক্ত হইয়াই কুলীন নাম ধারণ করে। এই কুলীনরূপে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি আচার শিক্ষা করা আবশ্যক। ভীম রঘুনাথকে সেই আচার শিক্ষা দিতেছেন। সেই শিক্ষার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইতেছে, শুন;—

দস্যু-দলপতির উপদেশ।

হে পুত্র, তুমি এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং পরাক্রান্ত হইয়াছ। তজ্জন্য তোমাকে সত্বরই অভিষিক্ত হইতে হইবে। অতএব তোমাকে যে সকল আচরণ শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শুন।

আমরা মহাশক্তি মহাকালীর সন্তান। অন্যে আমাদিগকে দস্যু বলে, কিন্তু আমরাই মাতার যথার্থ সুসন্তান। আমরা জগতের হিতের জন্যই জন্মিয়াছি।

এ জগতে কেহ স্বর্ণপাত্রে চর্ব্বচূষ্যলেহ্যপেয় সুখে আহার করে, আর কেহ বা জঠরানলে দগ্ধ হইয়া ক্লেশ পায়। জগতের এই বিষম অবস্থা দূর করিয়া সমান অবস্থা স্থাপন করাই আমাদের মায়ের উদ্দেশ্য। আমরাই তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত। সেই জন্যই আমরা মায়ের নিকট যথেষ্ট শক্তি পাইয়াছি। মা আমাদের শক্তিরূপিণী। যথারীতি তাঁহার পূজা করিলেই যথেষ্ট শক্তি লাভ করা যায়। এ জগতে যে শক্তিবিহীন, সে মায়ের কু-সন্তান। আমরা মহাশক্তির সাধক। অতএব যাহাতে শক্তির হানি হয়, তদ্রূপ আচরণ করা আমাদের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কিরূপ আচরণে শক্তির হানি হয়, বলিতেছি শুন।—

১। স্ত্রীলোকমাত্রেই শক্তিরূপা। অতএব স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টি অর্থাৎ কামভাবে দৃষ্টিপাত করিলেই মহাশক্তি শক্তি হরণ করিয়া থাকেন। সেজন্য স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও কুভাবে দৃষ্টিপাত করিবে না।

২। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, উদাসীন, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, অতিথি, আতুর, বাতুল, আশ্রিত বা শরণাগত এবং উপকারী ব্যক্তি, প্রতিবেশী এবং অভিষিক্ত কুলীন, ইহাদের কাহারও প্রতি কখনও কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না। ইহাদের উপকার করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। ইহাদের কাহারও প্রাণে কিছুমাত্র বেদনা দিলেই ইহাদের প্রাণ মায়ের কাছে নালিশ করে, সে জন্য মা অত্যাচারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শক্তি হরণ করেন। অতএব কদাপি তদ্রূপ গর্হিত আচরণ করিবে না।

৩। উল্লিখিত ব্যক্তিদের নিকট কখন মিথ্যা কথা বলিবে না। যাহারা ভীরু কাপুরুষ, তাহারাই মিথ্যাকথা বলে।

৪। জগতের কাহারও কোন সম্পত্তি কখনও চুরি করিয়া লইবে না। অতি ভীরু কাপুরুষেরাই চুরি করিয়া থাকে। যখনই আবশ্যক হইবে, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে।

৫। লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত অগ্রে মায়ের নিকট উৎসর্গ করিয়া কুলীনগণের মধ্যে বিভাগ করিতে হইবে। মায়ের কাছে উৎসর্গ করিয়া দিলেই কুলীনের সকল পাপ দূর হয়। সকল সম্পত্তিই আমাদের মায়ের সম্পত্তি।

৬। কুলীনগণ নিজ নিজ প্রাপ্ত ভাগ কেবল নিজে-নিজেই ভোগ করিবেন না। পরিবারবর্গের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত অংশ দুঃখী কাঙ্গাল, অভুক্ত ও অতিথি ব্যক্তিদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবেন।

৭। কুলীন অপেক্ষা সংসারে কোন মনুষ্যই অধিক

মান্য নহে। কুলীনের প্রাণরক্ষার জন্য অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করা যায়। যদি কোনস্থানে সত্যকথা বলিলে কুলীনের প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে, তবে সেস্থানে সত্যকথাও বলিবে না। কুলীনের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের প্রাণও অকাতরে উৎসর্গ করিবে।

উক্ত সাতটী নিয়ম যাহারা সাধ্যমত পালন করে, তাহারাই যথার্থ কুলীন। তাহারাই মায়ের সুসন্তান।

রঘুনাথ পিতার নিকট উক্ত আচরণ শিক্ষা করিয়া অনতিবিলম্বেই কুলীনরূপে দীক্ষিত হইলেন। কুলীন হইবার কয়েক বৎসর পরেই রামচাঁদ রায়চৌধুরীর মৃত্যু হওয়াতে রঘুনাথ কুলীন, ব্রাহ্মণ, এবং জমীদার হইয়া "রাজা রঘুনাথ রায় চৌধুরী" নামে বিখ্যাত হইলেন।

রঘুনাথ স্বীয় প্রজাদিগকে যথার্থই সন্তানবৎ দেখিতেন। তাঁহার জমীদারী বা রাজত্বের মধ্যে কেহ কোন দিন দৈন্য বশতঃ উপবাসী থাকে নাই। প্রবল প্রজা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে নাই।

ভীম সর্দ্দারের পরবর্ত্তী জীবনের বৃত্তান্ত বলিতে ইচ্ছা করি না। রাজা রঘুনাথ চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তপস্যার্থ বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন।

যাঁহাহউক, এক্ষণে আমরা ভীম সর্দ্দারের চরিত্রের একটু সমালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইতে যোগ সম্বন্ধে কিছু শিখিতে পারি কি না। ইতর জন্তুরাও যখন আমাদের শিক্ষক-স্থানীয়, তখন ইতর মনুষ্যেরাও যে শিক্ষক-স্থানীয় হইবার উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব আমরা

ভীমের তমোরাজসিক যোগের বিষয় সমালোচনা করিয়া দেখি।

দেখ, ভীম তমোরাজসিক যোগ অবলম্বন করিয়া সংসারে কেমন উন্নতি লাভ করিয়াছিল! সে অতি নীচ বাগ্দির ঘরে জন্মিয়াও আপনার ছেলেটাকে শেষে বামন করিয়া রাখিয়া গেল। আর তাহাকে রাজা করিয়া গেল! ইহা অপেক্ষা ভীমের আর অধিক কর্ত্তব্য সাধন কি হইতে পারে?

পাটনী ভগবতী অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই বর চাহিয়াছিল, "মাগো! আমার ছেলে-মেয়ে যেন দুধে-ভাতে থাকে।" পাটনী ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক আশা করিতে পারে?

অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভীম সাধনা দ্বারা তাহার চূড়ান্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু ভীম এমন উৎকৃষ্ট যোগ শিখিল কেমন করিয়া? ভীমের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত একটু সৌভাগ্য ছিল; সেইজন্যই সে তাহার কর্ত্তব্য পথ ঠিক্ নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিল। তাহার পরম সৌভাগ্য যে, সে ন্যায়দর্শন পড়ে নাই! তাহার পরম সৌভাগ্য যে, সে পুরাণ তন্ত্র স্মৃতি অধ্যয়ন করে নাই! তাহার পরম সৌভাগ্য যে, জ্ঞানে তাহাকে দিশে-হারা করে নাই। তাহার পরম সৌভাগ্য যে, সে জানিতেও পারে নাই, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।"

সেই জন্যই সে সহজ সরল যোগে তাহার সরল পথ সহজেই আবিষ্কার করিয়াছিল। সে ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিয়া

অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল। সে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছিল। কেবল যে বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল, তাহা নহে; সে বুঝিয়াই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া অসীম বীর্য্য লাভ করিয়াছিল। নতুবা কেবল বুঝিলে কোন উন্নতিই লাভ করা যায় না। পণ্ডিতেরা জগতের কোন্ তত্ত্ব বুঝিতে না পারেন? এম্ এ মহাশয়েরা জগতের কোন্ জ্ঞানে বঞ্চিত আছেন? না, শাস্ত্রী মহাশয়দিগের বুঝিতে কিছুই বাকি নাই। কিন্তু "কর্ম্মীকা ঘর্ দূর্।"

যাহাহউক, উন্নতিলাভ করিতে হইলেই কাজ করা চাই, কেবল বুঝিলে হইবে না। অভ্যাস না করিলে স্মরণ থাকে না, অভ্যাস না করিলে যোগ-সাধন হয় না। ভীম সর্দ্দার ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়াছিল। সেই জন্যই সে দুই বৎসরে এতই শক্তি লাভ করিল যে, তখন আপনাকে তুফান খাঁ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরাক্রমশালী মনে করিতে লাগিল। কেবল মনে করিল না, দৃঢ় বিশ্বাসের অনুসারে কাজ করিয়া সে তুফানের শিরশ্ছেদ করিতে সমর্থ হইল!

যাহাহউক, দস্যুপতি ভীম, একজন সংহিতাকারের ন্যায় স্বীয় পুত্রকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতে সমর্থ হইল কিরূপে? ভীম ত স্মৃতি-সংহিতা পড়ে নাই! সে ত কৌন্সিলের মেম্বরও হয় নাই! তবে সে ব্যবস্থা-প্রণয়ন করিল কিরূপে? কৌলীন্য প্রথার কর্ত্তব্য-নিচয় সে শিখিল কোথায়? সে নিজের কাছেই নিজে সকলই শিখিয়াছে। সে যতই ইতর বা অন্ত্যজ হউক্, তাহার চিত্তে যে কণামাত্র সত্ত্বগুণ ছিল,

তদ্দ্বারা সে সহজেই বুঝিয়াছিল যে, শক্তি লাভ করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল বা অশক্তের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য। ব্যাঘ্র অপেক্ষা সিংহের একটু সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে বলিয়াই, সিংহ কখনও ছুঁচো ইঁদুর মারে না। নিবীর্য্য খেঁকি কুকুর যেমন খেউ-খেউ করে, বলবীর্য্যশালী বৃহৎ কুকুর তদ্রূপ করে না। অতএব সকল জীবেরই অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণেরও আভাস পাওয়া যায়। সেই সত্ত্বগুণের প্রভাবেই দস্যুপতি ভীম উপলব্ধি করিয়াছিল যে, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতির প্রতি অত্যাচার করা কর্ত্তব্য নহে।

দস্যুপতি ভীম, অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া, অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়াই স্বীয় বিন্দুপরিমিত স্বত্ত্বগুণের প্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, "অন্ততঃ স্বীয় দলস্থ ব্যক্তিদের অর্থাৎ কুলীনদের নিকটও সত্যবাদী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।" নতুবা কাজ চলে না।

দস্যুপতি ভীম, অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া, অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়াই স্বীয় বিন্দুপরিমিত সত্ত্বগুণসহকারে উপলব্ধি করিয়াছিল যে, "অন্ততঃ স্বীয় দলস্থ ব্যক্তিদের অর্থাৎ কুলীনদের দ্রব্যও চুরি করা বা অপহরণ করা অকর্ত্তব্য।" এরূপ করিলে ব্যবসায় চলে না, বা কাজ চলে না।

দস্যুদলপতি ভীম, মর্ম্মে আঘাত পাইয়াই ব্রহ্মচর্য্যের গুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। সে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়া যে ফললাভ করিয়াছিল, তাহা তাহার প্রত্যক্ষ। সে সহজেই বুঝিয়াছিল যে, শক্তিসাধনার জন্য ব্রহ্মচর্য্য নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা কাজ চলে না।

দস্যুদলপতি ভীম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল যে, ভোগ্যবস্তু অপর পাঁচজনকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং উপভোগ করিলে অপর পাঁচজনকে বশে রাখা যায় না; সুতরাং কাজ চলে না।

অতএব এক্ষণে বুঝিয়া দেখ যে, দস্যুপতি ভীমের কাজ চালাইবার জন্যই অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহের প্রয়োজন। সুতরাং কাজ চালাইবার জন্যই দস্যুপতি ভীমের যম-সাধনের প্রয়োজন।

এখন তুমি বুঝিতেছ যে, কোন্ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট কোন্ টোলে ভীম স্মৃতিসংহিতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখন তুমি বুঝিতেছ যে, কোন্ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ভীম এম্ এ পাস করিয়াছিলেন। এখন তুমি অবশ্যই বুঝিয়াছ যে, কোন্ লাট্‌সাহেবের কৌন্সিলে থাকিয়া ভীম ব্যবস্থাপ্রণয়ন শিখিয়াছিলেন। যদি না বুঝিয়া থাক, তবে বলি শুন ;—

সেই টোলের নাম মনোযোগ।
সেই কলেজের নাম মনোযোগ !!
সেই কৌন্সিলের নাম মনোযোগ !!!

মনোযোগ দিয়া যদি স্বীয় চিত্তক্ষেত্র পরীক্ষা কর, তবে শিক্ষার জন্য অন্য ক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিতে হয় না।

ভীমসর্দ্দার স্বীয় চিত্তক্ষেত্র পরীক্ষা করিয়াই যোগসাধন শিখিয়াছিল। কিন্তু ভীমসর্দ্দারই কি আদর্শমনুষ্য? ছি, ছি, একথা মনেও করিও না। সে অতি নিকৃষ্ট যোগী। তাহার ধর্ম্মসাধন অতীব সঙ্কীর্ণ। অনেক ব্রাহ্মণভট্টাচার্য্য

অপেক্ষাও ভীম শ্রেষ্ঠ, অনেক এম্ এ বি এ অপেক্ষাও ভীম শ্রেষ্ঠ, অনেক ব্যবস্থাপক হাকিম অপেক্ষাও ভীম শ্রেষ্ঠ, একথা যদিও স্বীকার্য্য, কিন্তু ভীম আদর্শ মনুষ্য নহে ; ভীম যথার্থ মনুষ্যোচিত ধর্ম্মের অধিকারীও নহে !! ভীম যে ধার্ম্মিক নহে, একথাও বলিতে পারি না। কিন্তু যথার্থ মনুষ্যের লক্ষ্য যে ধর্ম্ম, ভীম তাহার অত্যন্ত অন্তরে অবস্থিত !

ধর্ম্ম কি ?

ধর্ম্ম কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে বলিয়া যাহা বলিতেছি, শুন ;—

ধর্ম্ম শব্দটী ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহাতে ধৃত বা নিহিত, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। অথবা লোকসকল যাহাকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। শেষোক্ত অর্থে ধর্ম্ম শব্দে অবলম্বন বা আশ্রয় বুঝায়। ফলতঃ, যাহাকে ধরিলে পতন হয় না বা পড়িয়া যাইয়া আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাই ধর্ম্ম। যাহাকে অবলম্বন করিলে ক্লেশ হয় না, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব ক্লেশ নিবারণের জন্য যে যাহা অবলম্বন করে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। সুতরাং সকলের ধর্ম্ম সমান নহে। প্রথম অর্থে ধর্ম্ম একই বটে ; কিন্তু শেষোক্ত অর্থে ধর্ম্ম অসংখ্য। শেষোক্ত অর্থই আমাদের বিবেচ্য। প্রত্যেক জীবের গুণ যেমন বিভিন্ন, তেমনই প্রত্যেক জীবের ধর্ম্মও বিভিন্ন। সেই জন্য কখন কখন গুণই ধর্ম্ম বলিয়া

অভিহিত হয়। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মশাস্ত্রও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মশাস্ত্রের যুক্তিও স্বতন্ত্র।

জীবহিংসা করাই ব্যাঘ্রের ধর্ম্ম। যেহেতু জীবহিংসা না করিলে ব্যাঘ্র ক্লেশের হস্ত হইতে নিস্তার পায় না। "আমি জীবহিংসার উপযোগী নখদন্তাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, জীবহিংসা না করিলে আমার চলে না; অতএব জীবহিংসাই আমার ধর্ম্ম।" ব্যাঘ্রের ধর্ম্মশাস্ত্র এই যুক্তি-মূলক।

পৃথক্ পৃথক্ মনুষ্যের বা মনুষ্যসম্প্রদায়েরও ধর্ম্মশাস্ত্র উক্ত প্রকার যুক্তি-মূলক। ফলতঃ যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেহই অযৌক্তিক কোন কার্য্য বা কোন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না। যে কোন ব্যক্তি যে কার্য্যই করুক্, সুখের প্রত্যাশাতেই সে সেই কাজ করিয়া থাকে। কিছু না বুঝিয়া অর্থাৎ কিছু যুক্তি স্থির না করিয়া কেহই কোন কর্ম্ম করে না। এই জন্যই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র যুক্তিমূলক হইয়াছে।

ভীমসর্দ্দারের ধর্ম্ম কি, এবং তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র কি, আর সেই ধর্ম্মের যুক্তিই বা কি, তাহা ইতঃপূর্ব্বে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছি। ইহাও বলিয়াছি যে, ভীমসর্দ্দারের ধর্ম্ম ভীমেরই উপযুক্ত, কিন্তু তাহা আদর্শমনুষ্যের উপযুক্ত নহে। যদি বল কেন তাহা আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত নহে? ভীমও ত অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ-রূপ পঞ্চাঙ্গ যম-সাধন করিয়া পৃথিবীতে উন্নতিলাভ করিয়াছিল! সে ত উত্তম ধর্ম্মই প্রতিপালন করিয়াছে! তবে তাহার ধর্ম্ম আদর্শমনুষ্যের উপযুক্ত নহে কেন?

ভীমের ধর্ম্মসাধন বা যমসাধন অতি সঙ্কীর্ণ, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শক্তিসাধক ভীমের ব্রহ্মচর্য্য অতি উৎকৃষ্ট বটে, তাহা আদর্শ মনুষ্যেরও উপযুক্ত বলিলেও বলা যায় বটে; কিন্তু ভীমের অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-অপরিগ্রহ অতি অল্প পাত্রেই নিহিত। তাহার অহিংসাদি প্রধানতঃ কুলীনের জন্য। ভীম, কুলীনকে হিংসা করাই অকর্ত্তব্য বলিয়া জানে; কুলীনের প্রাণরক্ষার জন্য গো-হত্যা ব্রহ্মহত্যা নরহত্যা প্রভৃতি কিছুই অকর্ত্তব্য বলিয়া তাহার জ্ঞান নাই। কেবল কুলীনের সহিতই ভীম সত্যবদ্ধ। অন্য কাহারও সহিত ভীম সত্য বলিতে বাধ্য নহে। ইত্যাদি। ফলতঃ, ভীমের যমসাধন কুলীনে অবচ্ছিন্ন বা কুলীনে লীন। অতএব ভীমের এই যমসাধন নিতান্তই জঘন্য। ইহা তমোরাজসিক যোগেরই উপযুক্ত, তবে আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত যমসাধন কিরূপ? সত্ত্বরাজসিক যোগের উপযোগী যমসাধন বা ধর্ম্মসাধন কি প্রকার? ইহার উত্তরে ভগবান্ পরম ঋষি কি বলিতেছেন, শুন;—

এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ
সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্।

অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহ এই পঞ্চাঙ্গ যমসাধনরূপ মহাব্রতের জাতি-দেশ-কাল-সময়-ভেদে অবচ্ছেদ নাই অর্থাৎ বিশেষ বিধি নাই। আদর্শ যমসাধন সার্ব্বভৌম অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী।

ভীমসর্দ্দারের সঙ্কীর্ণ যমসাধন যেমন কুলীনে লীন,

সার্ব্বভৌম মহাব্রত স্বরূপ আদর্শ যমসাধন তদ্রূপ কোন জাতিবিশেষে, কোন দেশবিশেষে, কোন কালবিশেষে বা কোন সময় (অবস্থা বা প্রয়োজন) বিশেষে, লীন বা অবচ্ছিন্ন নহে।

সাত্বিক যমসাধনে কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী, কি পতঙ্গ, কি সরীসৃপ, কি কীট, কোন প্রাণীর প্রাণে বেদনা দেওয়া অকর্ত্তব্য। কায়মনোবাক্যে তদ্রূপ হিংসা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণকে ক্লেশ দেওয়া নিষিদ্ধ; কিন্তু চণ্ডালকে ক্লেশ দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। এ ব্যবস্থা সাত্বিক যমসাধনের ব্যবস্থা নহে। গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ; কিন্তু ছাগমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। এ ব্যবস্থা সাত্বিক যমসাধনের ব্যবস্থা নহে। ছাগমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ; কিন্তু মৎস্যমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে; এ ব্যবস্থা সাত্বিক যমসাধনের ব্যবস্থা নহে। স্বয়ং মৎস্যের প্রাণ বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ; কিন্তু মৃত মৎস্য ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ নহে। এ ব্যবস্থা সাত্বিক যমসাধনের ব্যবস্থা নহে। কাশীতে মৎস্য ভোজন নিষিদ্ধ; কিন্তু বঙ্গদেশে মৎস্য ভোজন নিষিদ্ধ নহে। ইহা সাত্বিক যমসাধনের ব্যবস্থা নহে। রবিবারে মৎস্য-ভোজন অকর্ত্তব্য; কিন্তু অন্য বারে মৎস্য-ভোজন অকর্ত্তব্য নহে। ইহা সাত্বিক যমসাধনের ব্যবস্থা নহে। ব্যাঘ্র সর্প মূষিক মশক দংশক মৎকুণ উৎকুণ প্রভৃতি অনিষ্টকারী জীব বিনষ্ট করিলে দোষ নাই। ইহা সাত্বিক যমসাধনের ব্যবস্থা নহে। মিত্রকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শত্রুকেও বধ করা কর্ত্তব্য।

ইহা সাত্বিক যমসাধনের ব্যবস্থা নহে। প্রতিমার সম্মুখে পশুবধ নিষিদ্ধ, কিন্তু ইক্ষু কদলী প্রভৃতিকে পশুরূপে কল্পনা করিয়া বলি দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। এ ব্যবস্থা সাত্বিক যমসাধনের ব্যবস্থা নহে।

এক্ষণে সাত্বিক যমসাধনের অহিংসা-সাধন কি প্রকার তাহা হৃদয়ঙ্গম কর। যদি উক্ত অহিংসা-সাধন হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তবে সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ সাধনও কিরূপ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

তুমি যে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলে!? বুঝিয়াছি' তোমার মনে যুগপৎ অসংখ্য প্রশ্নের উদয় হইতেছে। কিন্তু যাহা বলিতেছি শুন, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত প্রশ্নের নিরাস হইবে।

এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ
সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্।

ইহাই যমসাধন-সূত্র বা ধর্ম্মসূত্র।

সূত্র কাহাকে বলে?

স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।

যাহা স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত, অসন্দিগ্ধ, সসার, বিশ্বতোমুখ (সার্ব্বভৌম), অবাধ বা সার্থক, এবং অনিন্দনীয়, তাহাই সূত্র। এখন বুঝিয়া দেখ, উল্লিখিত ঋষিবাক্য সূত্র কি না।

অথবা তোমার বুঝিবার প্রয়োজন নাই। উহা, ধর্ম্মসূত্র বলিয়া অবশ্য-স্বীকার্য্য। কিন্তু তুমি এই সুমহৎ ধর্ম্মসূত্র সহজে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না বলিয়া, তোমাকে তোমার পরিচিত গণিত-সূত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, শুন ;—

"যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই, তাহাকে বিন্দু বলে।"

"যাহার দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু বিস্তার নাই, তাহাকে রেখা বলে।"

"যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান।"

এই সকল জ্যামিতিক "সংজ্ঞা" বা "স্বতঃসিদ্ধ সত্য," সূত্রেরই অন্তর্গত।

এই সকল জ্যামিতিক সূত্রের মধ্যে অনেকের বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয় না। হইবার কথাও নহে। "যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই, তাহাকে বিন্দু বলে", এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা হৃদয়ের অসাধ্য! স্থূলবুদ্ধির ত কথাই নাই, অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিও এই সূত্রের মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে কি এই সূত্র অকার্য্যকর? ইহা কি খ-পুষ্প ও শশ-বিষাণবৎ বৃথা বিকল্প? ইহা কি বাতুলের প্রলাপ? না না না; ইহা অত্যন্ত কার্য্যকর, অত্যন্ত হিতকর,

ইহাই পরিমিতি-শাস্ত্রের প্রথম সূত্র।

এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই ক্ষেত্রের পরি-

মাণ করিতে হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে যে পরিমাণে এই সূত্রের সূক্ষ্মতা রক্ষা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই তোমার পরিমাণ-গণনা সূক্ষ্ম হইবে। উদাহরণ দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম কর।

মনে কর, তোমাকে কোন ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য মাপিতে হইবে। তুমি এই মাপের সময় প্রথমেই ক্ষেত্রের দুই প্রান্তে দুইটী শঙ্কু অর্থাৎ গোঁজ পুঁতিয়া থাক। এই দুইটী গোঁজ পুঁতিয়া কার্য্যতঃ তুমি দৈর্ঘ্য মাপের দুই সীমায় দুইটী বিন্দু স্থাপন করিয়া থাক। কিন্তু ক্ষেত্রে দুইটী গোঁজ পুঁতিলে বাস্তবিক দুইটী বিন্দু স্থাপন করা হইবে না; দুইটী ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রই স্থাপন করা হইবে। তোমার গোঁজ দুইটী যদি গোলাকার হয়, তবে পরিমেয় ক্ষেত্রে তুমি দুইটী ক্ষুদ্র বৃত্তক্ষেত্র চিহ্নিত করিবে। বৃত্তক্ষেত্রের সহিত বিন্দুর কি প্রভেদ, তাহা তুমি জান। তোমার গোঁজ দুইটী যত মোটা হইবে, তোমার চিহ্নিত বৃত্তক্ষেত্র দুইটীও তত বড় হইবে। কিন্তু তোমার গোঁজ দুইটী যত সূক্ষ্ম হইবে, তোমার বৃত্তক্ষেত্রও তত সূক্ষ্ম হইবে। এই বৃত্তক্ষেত্র দুইটী সঙ্কীর্ণ করিয়া বা সূক্ষ্ম করিয়া যদি কেবল মাত্র কেন্দ্রাকারে পরিণত অর্থাৎ দুইটী অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিন্দুতে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি ক্ষেত্রের যথার্থ দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে পার; নতুবা তোমার গোঁজে যদি ক্ষেত্রের অংশ গ্রাস করিয়া ফেলে, তবে তুমি প্রকৃত দৈর্ঘ্য অবধারণ করিবে কিরূপে? কিন্তু জগতে এমন সূক্ষ্ম বস্তু কি আছে, যাহা ক্ষেত্রে প্রোথিত করিলে বৃত্ত উৎপন্ন না

করিয়া কেবলমাত্র কেন্দ্র উৎপন্ন করিবে? এরূপ সূক্ষ্ম বস্তু জগতে নাই। এত সূক্ষ্ম গণনারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার প্রয়োজন থাকুক্ বা না থাকুক্, সাধারণ গণিত-সূত্রকার নিজের সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সেই সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ করিলেই সূত্রের সূত্রত্ব নষ্ট হয়। তোমার প্রয়োজনমত তুমি ক্ষেত্রের দুই প্রান্তে দুইটী স্থূল স্তম্ভ স্থাপন করিতে পার, অথবা দুইটী সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা দুইটী সূক্ষ্ম চিহ্ন স্থাপন করিতে পার। কিন্তু সাধারণ সূত্রকার স্তম্ভ বা সূচী কিছুরই ব্যবস্থা দিবেন না। তিনি অটলভাবে স্বীয় বিন্দুর ব্যবস্থাই দিবেন। তুমি স্বপ্রয়োজন সাধনের জন্য বিশেষ সূত্রকার হইতে পার, তাহাতে সাধারণ সূত্রকারের নিষেধও নাই, অনুমতিও নাই।

তোমার সুবিধা ও সাধ্য অনুসারে দৈর্ঘ্য মাপের জন্য তুমি জাহাজ-বাঁধা শিকলই ব্যবহার কর, অথবা লূতা-সূত্রই ব্যবহার কর, তাহাতে সাধারণ রেখা-সূত্রকারের নিবারণও নাই, অনুমোদনও নাই। তিনি বলিবেন, "বিস্তারবিহীন দৈর্ঘ্যের নাম রেখা।" জাহাজের শিকলও রেখা নহে, লূতাতন্তুও রেখা নহে।

"কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ,
বিশ গণ্ডা কাঠায় প্রমাণ।"

রৈখিক কাঠার পরিমাণকে রৈখিক কাঠা-পরিমাণ দ্বারা গুণ করিলে যে গুণফল হয়, তাহাকে ধূল বা গণ্ডা বলে; তাহার ২০ গণ্ডায় এক বর্গ কাঠা হয়। ইহাই সাধারণ ভূমি-পরিমাণ সূত্র।

কিন্তু তুমি যদি এত সূক্ষ্ম সূত্রের প্রয়োজন বোধ না কর, তবে তুমি নিম্নলিখিতরূপ বিশেষ সূত্রের সৃষ্টি করিতে পার, যথা,—

"কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ,
দশ বিশ গণ্ডা কাঠায় যান।"

তুমি যদি দশ গণ্ডা ও বিশ গণ্ডাকে সমান বলিয়াই গ্রহণ কর, তাহাতে সাধারণ গণিত-সূত্রকারের আপত্তিও নাই, অনুমতিও নাই। কিন্তু সাধারণ গণিত-সূত্রকার কখনও বলিবেন না যে, দশ আর বিশ একই সংখ্যা।

"বিশ গণ্ডা কাঠার প্রমাণ" ইহা সর্ব্বদেশ-মান্য, সর্ব্ব-কাল-মান্য এবং সর্ব্বজনমান্য ব্যবস্থা। কিন্তু "দশ বিশ গণ্ডা কাঠায় যান।" এই ব্যবস্থা স্বয়ং শুভঙ্করের বা দ্বিতীয় শুভঙ্করের হইলেও ইহা উক্তরূপ সর্ব্বমান্য নহে। ইহা বনজঙ্গলময় সাঁওতাল পরগণায় মান্য হইতে পারে, কিন্তু কলিকাতা নগরে মান্য হইতে পারে না।

এখন তুমি বোধ করি গণিত-সূত্র ও তাহার ব্যবহার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। তবে এখন এস, ধর্ম্মসূত্র ও তাহার ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম কর।

ধর্ম্মসাধন-সূত্র কি, তাহা জানিলে; এখন ইহাও জান যে, এই সূত্রেই ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে। সূত্রমাত্রই অতি সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ বলিয়া সকলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সেই জন্যই,—

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

"ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত।" এইরূপ প্রচলিত কথা আছে।

এস্থানে গুহা শব্দের বিস্তর অর্থ সঙ্গত হইতে পারে। প্রধানতঃ গুহা শব্দে অতি গোপনীয় স্থান, পর্ব্বতকন্দর ও হৃদয় বুঝায়। ধর্ম্মরহস্য অতি দুর্ব্বোধ; ধর্ম্মতত্ত্ব পর্ব্বত-কন্দরস্থ পরম যোগীরই বিদিত; ধর্ম্মতত্ত্ব হৃদয়ে নিহিত! এ সমস্ত কথাই সঙ্গত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার শেষোক্ত অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত। স্বীয় হৃদয়েই ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত; ইহা যথার্থ কথা।

"আমায় কেহ হিংসা করুক্" এ কথা কে বলে? কোন জীব, কোন স্থানে কোন কালে কোন অবস্থাতেই হিংসা চাহে না। সুতরাং হিংসা ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে। এ কথা কে না স্বীয় হৃদয়ে বুঝিতে পারে? অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব যে হৃদয়ে নিহিত, তাহাতে সন্দেহ কি?

স্বীয় হৃদয় পরীক্ষা করিয়াই ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপিত হই-য়াছে। হিংসা, অসত্য, স্তেয়, অব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহের কুফল হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াই পরম যোগী মহর্ষিরা যম-সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই ব্যবস্থা করিয়াই,

এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ
সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্।

এই ধর্ম্মসূত্র সংস্থাপন করিয়াছেন। যিনি সত্ত্বগুণাবলম্বী, স্মৃতিমান্ ও ক্লেশরহিত আদর্শ পুরুষ হইতে ইচ্ছা করেন, সঙ্ক্ষেপে, যিনি ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনিই এই ধর্ম্মসূত্র ধারণ করিবেন। হৃদয়-নিহিত এই ধর্ম্মসূত্রই যথার্থ উপবীত। বাহ্য-সূত্র তাহারই স্মারক চিহ্নমাত্র।

হৃদয়-নিহিত এই ধর্ম্মসূত্র-প্রভাবে অনায়াসে পদব্রজে ভব-সাগর পার হওয়া যায়।

ধর্ম্মসূত্র কি, তাহা বুঝিয়াছ। কিন্তু গণিতসূত্র কার্য্য-ক্ষেত্রে যেরূপে ব্যবহৃত হয়, ধর্ম্মসূত্রও জীবনক্ষেত্রে বা সংসারে প্রায় তদ্রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংসারে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে এই ধর্ম্মসূত্রের সূক্ষ্মতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণেই উন্নত ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ধর্ম্ম কি, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম যে স্বতন্ত্র, তাহাও বলিয়াছি। কুকুরের ধর্ম্ম, সর্পের ধর্ম্ম, ব্যাঘ্রের ধর্ম্ম এবং ভীমসর্দ্দারের ধর্ম্মও বিবৃত করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই ধর্ম্মরহস্য কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়াছি। সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম কি, তাহাও বলিয়াছি; কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে এখনও তোমার বিস্তর সংশয় আছে, তাহাও বুঝিতেছি। অতএব আরও কতকগুলি উদাহরণ দিয়া এ সম্বন্ধে তোমার সংশয় অপনোদন করিতেছি শুন;—

নানা মুনির নানা মত।

ধর্ম্মসূত্র যদিও এরূপ অসন্দিগ্ধ, সসার, বিশ্বতোমুখ, অব্যর্থ ও অনিন্দনীয়, তথাপি নানা মুনির নানা মত হইল কেন? তবে ধর্ম্ম এমন জটিল কুটিল হইয়া পড়িল কেন? তবে অসংখ্য বিচিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল কেন? সেই অসংখ্য ধর্ম্ম-মতের কোন্‌টী হেয় এবং কোন্‌টীই বা উপাদেয়? কি কি গ্রাহ্য? কি কি পরিত্যাজ্য? তোমার এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা এখন কর্ত্তব্য।

গুণ, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, প্রকৃতি, স্বভাব, সংস্কার, প্রায় একার্থ-বাচক। ইহারা পরস্পর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে বিজড়িত। ইহারা অনাদি ও অনন্ত বলিয়া, ইহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপৌর্য্য বা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা দুষ্কর। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, কি বৃক্ষ হইতে বীজের উৎপত্তি, এই প্রশ্নের মীমাংসা নাই। কেননা বীজ ও বৃক্ষ উভয়ই অনাদি ও অনন্ত।

এ সংসারে জীবের চিত্তগুণ অনন্ত, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে সেই চিত্তগুণকেই ধর্ম্মের কারণ বলিয়া মনে কর। সুতরাং ধর্ম্মও যে অনন্ত, তাহা বুঝিতে পারিতেছ। তবে নানা মুনির নানা মত হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? ধর্ম্ম যখন অনন্ত, তখন ধর্ম্মের ব্যবস্থাও অনন্ত। তজ্জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্যাঘ্রেরও ধর্ম্মশাস্ত্র আছে এবং তাহারও যুক্তি আছে। এখানে ব্যাঘ্র বলিলে যে কেবল বনের বাঘই বুঝিবে, তাহা নহে; ব্যাঘ্র-প্রকৃতির মনুষ্য বা মনুষ্যাকার ব্যাঘ্রও বুঝিতে হইবে। "মাংস-ভোজন না করিলে, অন্য কিছুতেই প্রাণ-রক্ষার সম্ভাবনা নাই বা ক্লেশমুক্তির সম্ভাবনা নাই।" যাহারা এ কথা বলে এবং তাহার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে নরাকার ব্যাঘ্র বা তাহারা পণ্ডিত হইলে তাহাদিগকে "ব্যাঘ্রাচার্য্য" বলা অসঙ্গত নহে। ইহাতে তুমি যেন মনে করিও না, যে আমি কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া গালাগালি দিতেছি। এই ব্যাঘ্রাচার্য্যেরও চিত্তক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে প্রবৃত্তি প্রদান করিতেছেন; সুতরাং এই ব্যাঘ্রা-

চার্য্যকেও "ভগবান্ ব্যাঘ্রাচার্য্য" বলিলেও অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করা হয় না। অতএব জগতে ঘৃণার্হ বা উপহাসের ভাজন কেহই নহে। ব্যাঘ্রাচার্য্যের প্রবৃত্তির যদি দোষ দাও, তবে সে দোষ তাহার চিত্তক্ষেত্রের—জড়-প্রকৃতির, সে দোষ ভগবান্ চৈতন্য-দেবের নহে।

ধর্ম্মমত অসংখ্য বলিয়াই ধর্ম্মব্যবস্থা সকল জটিল বা কুটিল বলিয়া প্রতীত হয়।

এই সকল ধর্ম্মব্যবস্থার কি হেয়, এবং কি উপাদেয়, অর্থাৎ কি গ্রাহ্য এবং কি পরিত্যাজ্য, তাহা জানিতে হইলে, তোমার হৃদয়ের নিকটেই জানিতে পারিবে। তোমার লক্ষ্য কি? তুমি কোথায় উঠিতে চাও? তোমার উঠিবার সাধ্য কত দূর? এই সকল অগ্রে আত্মচিন্তা দ্বারা অবধারণ কর। পরে আমি বলিব যে, যদি তুমি দশটী সোপানের উপরি উঠিতে চাও, তবে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম সোপান ক্রমশঃ তোমার পরিত্যাজ্য। ১১শ সোপানই তোমার উপাদেয়। অতএব অপর দশটী সোপান তোমার হেয়। কিন্তু প্রথম দশটী সোপান তোমার হেয় বলিয়া, জগতের সকলেরই হেয় নহে। বিশেষতঃ ১১শ সোপান তোমার উপাদেয় বলিয়া, তোমাকে এককালে দশটী সোপান উল্লঙ্ঘন দ্বারা পরিত্যাগ করিতেও বলিতে পারি না। অতএব হেয় কি, এবং উপাদেয় কি, ইহার নির্দ্ধারিত বা নির্দ্দিষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তোমার লক্ষ্য অনুসারেই তুমি স্বয়ং হেয় বা উপাদেয় অবধারণ কর; এইমাত্র ব্যবস্থা বলিতে পারি। যদি ব্রাহ্মণত্ব

তোমার লক্ষ্য হয়, তবে তুমি শূদ্রত্ব পরিত্যাগ কর; বৈশ্যত্ব পরিত্যাগ কর; এবং ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ কর। তুমি তমোগুণ ও রজোগুণের হ্রাস করিয়া সত্বগুণের বৃদ্ধি কর। তোমাকে এই ব্যবস্থা দিতে পারি।

এখন তোমার মনে সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে,—

শূদ্র কি ব্রাহ্মণ হইতে পারে ?

শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না কেন? চিত্তগুণ এবং কর্ম্মের উপরি শূদ্রত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে। সেইজন্যই ভগবানের উক্তি যে,—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ অনুসারেই আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চিত্তগুণ চিরস্থির নহে; ইহা পরিবর্ত্তনীয়। চিত্তগুণ পরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই কর্ম্মও পরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং চিত্তগুণ ও কর্ম্ম উভয়ই পরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বর্ণও পরিবর্ত্তনীয়। অতএব শূদ্রও যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিও না। গুণকর্ম্মের পরিবর্ত্তন সাধন করাই আবশ্যক। তাহা করিতে পারিলেই শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। গুণ কাহাকে বলে, তাহা বলিয়াছি; কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাও এক প্রকার বলিয়াছি; কিন্তু তুমি পাছে ভ্রমে পতিত হও, সেই জন্য কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি।—

কর্ম্ম ।

কর্ম্ম দুই প্রকার ; সৎকর্ম্ম বা সুকৃতি এবং দুষ্কর্ম্ম বা দুষ্কৃতি। সুকৃতি বলিলে সৌভাগ্য এবং পুণ্যও বুঝায় এবং দুষ্কৃতি বলিলে দুর্ভাগ্য বা পাপও বুঝায়। কর্ম্ম বলিলে যেন দাসত্ব, পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধ বা যজন-যাজন প্রভৃতি বুঝিও না। কর্ম্ম বলিলে সাধনাই বুঝিবে। সাত্ত্বিক যমসাধনই সৎকার্য্য বা সুকৃতি এবং তদ্বিপরীতই অসৎকার্য্য বা দুষ্কৃতি ; অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ, এই পঞ্চাঙ্গ যমসাধন বা ধর্ম্মসাধনের নামই সুকৃতি বা সৎকার্য্য ; এবং হিংসা প্রভৃতিই দুষ্কৃতি বা অসৎ-কার্য্য। ভগবান্ পরম ঋষি যখন বলিয়াছেন,—

এতে জাতিদেশকাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ
সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ।

তখন শূদ্রেরও এই যমসাধনে অধিকার আছে। যম-সাধনে যাহার অধিকার আছে, সে অবশ্য সৎকার্য্য বা সুকৃতির অধিকারী। সুতরাং যে সুকৃতির অধিকারী, সে অবশ্যই ব্রাহ্মণত্বেরও অধিকারী। অতএব সাত্ত্বিক যমসাধনে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে এ স্থলে একটী সূক্ষ্ম প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক।

প্রকৃতির পরিবর্ত্তন শক্য কি না ?

একটী চলিত কথা আছে যে,

"টাক প্রকৃতি গোদ ম'লে হয় শোধ।"

অর্থাৎ টাক রোগ, প্রকৃতি এবং গোদ (শ্লীপদ রোগ) মরিলে নিবৃত্ত হয়। এ কথা সত্য কি না ? যদি এ কথা সত্য হয়, তবে প্রকৃতি কথনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কি না ?

"টাক প্রকৃতি গোদ ম'লে হয় শোধ।"

এ কথা সত্য হইলে, অবশ্য প্রকৃতি অন্ততঃ মরণের পরেও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকে বলেন,—

"টাক প্রকৃতি গোদ ম'লেও না হয় শোধ।"

অর্থাৎ প্রকৃতি মরণের পরেও পরিবর্ত্তিত হয় না। এ কথার তাৎপর্য্য কি, শুন ;—

এক মাস ধরিয়া দিবানিদ্রা অভ্যাস করিলে, চিত্তে দিবানিদ্রার যে সংস্কার জন্মে, ইহা পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি। সংস্কার কি, তাহাও বুঝিয়াছ। এক্ষণে জান যে, এই সংস্কার আর প্রকৃতি অভিন্ন। সংস্কারের হেতু অভ্যাস ; প্রকৃতিরও হেতু অভ্যাস। এবং অভ্যাসই প্রকৃতি বা স্বভাবরূপে পরিণত হয়, এ কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। ফলতঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারকেই লোকে সাধারণতঃ প্রকৃতি বা স্বভাব বলে। তুই এক মাসের অভ্যাসবশে যে সংস্কার জন্মে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি বা স্বভাব বলে না। কিন্তু মূলতঃ উভয়ই এক।

যখন স্থূলদেহান্তর্গত জীব, এই স্থূল শরীরকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বোধ করে, তখন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি সহ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া পুনরায় স্থূলদেহ পরিগ্রহ করে, ইহারই নাম জন্মান্তর গ্রহণ।

তুমি যদি ইহ জন্মে ক্রমাগত হিংসা অভ্যাস কর, তবে হিংসাই তোমার প্রকৃতি বা স্বভাব হইয়া পড়িবে। তুমি ইহ জন্মের স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া জন্মান্তর পরিগ্রহ করিলেও তোমার প্রকৃতি বা স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কেননা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিতত্ত্ব তোমার সূক্ষ্ম শরীরকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। সুতরাং তোমার চিত্তজ সংস্কার বা প্রকৃতি জন্মান্তরেও তোমার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। তুমি পরজন্মে সেই সহজাত সংস্কার বা প্রকৃতি বশেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং এক জন্মে হিংসা পাপ অভ্যাস করিলে পরজন্মেও সেই পাপ হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। আবার যে কার্য্যের যে ফল তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অতএব হিংসারূপ পাপের ফলস্বরূপ ক্লেশও অবশ্য ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং যে কাজ করিয়াছ, তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে।

কিন্তু যেমন এক মাসের অভ্যাসের সংস্কারকে তদ্বিপরীত অভ্যাস দ্বারা এক মাসের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত করা যায়, তেমনই এক জন্মের অভ্যস্ত প্রকৃতিকে পরজন্মের অভ্যস্ত প্রকৃতি দ্বারা নিবারণ করা যায়।

সংস্কারের বা স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হইলে পুরুষকারের প্রয়োজন। সুতরাং পুরুষকার দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করা যায়। উৎকট যত্ন বা অভ্যাসেরই নাম পুরুষকার, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন একটী উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইয়া দিতেছি শুন,—

হিংসাই ব্যাঘ্রের প্রকৃতি। ব্যাঘ্র রক্তমাংস দেখিলেই লোলুপ হয়। কিন্তু একটী সদ্যঃপ্রসুত ব্যাঘ্র-শাবককে আনিয়া তাহাকে দুগ্ধ দ্বারা প্রতিপালন কর। একটু বড় হইলেই তাহার নখরগুলি ছিন্ন করিয়া দাও। ক্রমে বড় বড় দন্ত কয়টাও ভাঙিয়া দাও। দুগ্ধ ব্যতীত তাহাকে আর কিছুই খাইতে দিও না। দেখিবে, সে হঠাৎ মরিয়া যাইবে না। তবে সে বনে স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকিলে যতদিন বাঁচিতে পারিত, হয় ত দুগ্ধ খাইয়া ততদিন বাঁচিতে পারিবে না। কিন্তু না পারুক্। ক্ষুধার সময় সে দুগ্ধ দেখিলেই লোলুপ হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও। তাহাকে যদি রক্তের আস্বাদন কোনক্রমে জানিতে না দাও, তবে সে কখনই তাহা জানিতে পারিবে না। এইরূপে ব্যাঘ্রের স্বাভাবিক প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন করা যায়। অন্ততঃ পর-জন্মেও তাহার প্রকৃতি যে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহাহউক, এই ব্যাঘ্রের উদাহরণও কাল্পনিক বলিয়া যদি গ্রাহ্য করিতে না চাও, তবে তুমি স্বয়ং নিজের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিতে পার কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখ। তুমি মৎস্য ও মাংস অত্যন্ত ভালবাস। তোমার প্রকৃতিই মৎস্য-মাংস-লোলুপ। দুগ্ধে তোমার রুচি নাই। কিন্তু তুমি ক্রমশঃ বা এককালেই মৎস্য-মাংস ত্যাগ করিয়া দুগ্ধের উপরই নির্ভর কর। এরূপ করিলে তুমি অবশ্য প্রথমে ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হইবে; কিন্তু তোমার মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। অথবা অসহনীয় কোন ক্লেশ বা পীড়ার

সম্ভাবনাও নাই। দুগ্ধে যদি অরুচি জন্মে তবে মৎস্য-মাংস ব্যতীত জগতে যাহা কিছু খাদ্য আছে, তাহাই খাইয়া রুচির তৃপ্তি কর এবং কোনও রূপে বাঁচিয়া থাক। কিছু দিন পরে—একবৎসর পরেই দেখিবে, মৎস-মাংসের গন্ধ সহ্য করাও তোমার ক্লেশকর হইবে!! অতএব একটু শ্রদ্ধা জন্মিলে অধ্যবসায় সহকারে জন্মজন্মান্তরীণ অভ্যাসও দুই এক বৎসরের অভ্যাস দ্বারাও নিবারণ করা যায়। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না; কেননা ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ সত্য।

প্রতিকূল অভ্যাস যে নিতান্তই ক্লেশকর—প্রাণান্তকর, তাহা কখনই মনে করিও না। যাহারা নিতান্ত কাপুরুষ, তাহারাই তদ্রূপ মনে করিয়া থাকে।

বিশ্বাসের বল অতীব প্রবল; এই বিশ্বাসবলে অসাধ্য সাধন করা যায়। যদি তোমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এই পাহাড়ের বিশ হাত নিম্নে এক লক্ষ সোনার মোহর নিহিত আছে, কিন্তু তাহা পাইতে হইলে অন্য-সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং পরিশ্রম-সহকারে খনন করা আবশ্যক; তাহা হইলে তুমি কি কর? তুমি যতই দুর্ব্বল হও না কেন, স্বর্ণমুদ্রার প্রাপ্তির আশায় নিশ্চয়ই কোমর বাঁধিয়া পরিশ্রম করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক, এবং সেই প্রতিজ্ঞার বলে স্বকার্য্যসাধন বা স্বাভিলাষ পূর্ণ করিতে পার।

"পাঁচ বৎসর যত্ন করিয়া পড়িলেই এন্‌ট্রান্স পাস করা যায়, তৎপরে দুই বৎসরে এল্ এ এবং তৎপরে আর দুই বৎসরে বি এ এবং তদনন্তর আর এক বৎসরে এম্ এ পাস করা যায়। এম্ এ পাস করিলে সংসারে আর কোন

অভাবই থাকে না, কোন ক্লেশই থাকে না। এম্ এ পাস করিলেই একটা মানুষের মত মানুষ বা আদর্শ মানুষ হওয়া যায়। শত শত লোকের নিকট খ্যাতি, মান, সম্ভ্রম, লাভ করা যায়। রাজার নিকটও সমাদৃত হওয়া যায়। অতএব এমন পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য আমি অবশ্যই দশ বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিব। অথবা আমার পুত্রকে আমি যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াও দশ বৎসর পড়াইব।"

এইরূপ বিশ্বাস, আশা ও অধ্যবসায়-সহকারেই লোকে এম্ এ পাস করিয়া থাকে। এই এম্ এ পাস করিবার জন্য অন্ততঃ দশ বৎসর কাল কত যে ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা বর্ণনাতীত। অনেকের পক্ষে এই ক্লেশ শীঘ্রই মৃত্যু-যন্ত্রণাকে আনয়ন করে। এই এম্ এ পাস করিবার জন্য লোকে যে ভীষণ কঠোর তপস্যা করে, তজ্জনিত ক্লেশ কেবল আশার প্রলোভনেই বুঝিতে পারে না।

একজন ক্ষমতাশালী স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর কোন বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষককে বলিলেন, "তুমি যদি এন্‌ট্রান্স পাস করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর করিয়া দিতে পারি।" *

এই কথায় পণ্ডিত মহাশয়ের মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি সেই দিন হইতেই ইংরাজী বর্ণপরিচয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবং গুরুতর সংসার-ভার বহন করিবার জন্য

* উক্ত ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় যখন নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তখন উক্ত বঙ্গ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকটী তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াও স্বয়ং ছাত্ররূপেও কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই অধ্যবসায়ের ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু হায়! তিনি যে বৎসর এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বৎসরই গবর্ণমেণ্ট হইতে নিয়ম হইল যে "গ্রাজুয়েট না হইলে অর্থাৎ এম্ এ বা বি এ পাস না করিলে কেহই এককালে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইতে পারিবেন না।" কিন্তু এই নিয়ম হইলেও, সে বৎসর সব্-ইন্‌স্পেক্টর-পদের সৃষ্টি হইল। শিক্ষক মহাশয় সেই সব্-ইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইলেন। যাহা হউক ইহাতেও তাঁহার মনোবাঞ্ছা কিয়ৎপরিমাণেও সফল হইল। তিনি মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনের পরিবর্ত্তে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। *

যাহা হউক, এরূপ শত সহস্র সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় যে, মানুষ অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলেই নিজের প্রকৃতি বা ভাগ্য নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। কিন্তু আশা না পাইলে, বিশ্বাস না হইলে, কেহই যত্ন ও পরিশ্রম করিতে চায় না, কেহই অধ্যবসায়শীল হইতে পারে না।

এম্ এ পাস করিলে সুখী হওয়া যায়, এই আশাতেই লোকে ক্রমাগত দশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া থাকে।

* বহুদিন সব্-ইন্‌স্পেক্টর থাকিয়া সম্প্রতি তিনি ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছেন।

আশার জন্য সেই কঠোরতার ক্লেশ যেন অনুভব করিয়াও করে না। আমরা কোন উর্দ্ধবাহু মৌনাবলম্বী বা স্থাণুবৎ নিশ্চল যোগীকে দেখিলেই মনে করি, "উ! কি ঘোর কঠোর তপস্বী!" কিন্তু যদি কঠোরতাবিষয়ে তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারি যে, এই উর্দ্ধবাহু যোগী একজন এম্ এ অপেক্ষা দশাংশের একাংশমাত্র কঠোর-তপাঃ! এক বৎসর মাত্র অভ্যাস করিলেই উর্দ্ধ-বাহু যোগী হওয়া যায়। কিন্তু অন্ততঃ দশ বৎসর অভ্যাস না করিলে এম্ এ হওয়া যায় না। তুমি এখন মনে করি-লেই অন্ততঃ পাঁচ মিনিট সময় পর্য্যন্ত তোমার দক্ষিণ হস্ত-খানি উত্তোলন করিয়া রাখিতে পার। ইহাতে তোমার কতটুকু ক্লেশ হইবে? আবার দশ মিনিট হাতখানি নামা-ইয়া রাখিলেই সমস্ত ক্লেশ দূর হইবে। যেমন ক্লেশ দূর হইল, অমনই আবার পাঁচ মিনিট হস্ত উত্তোলন করিয়া রাখ। আবার দশ মিনিট হাত নামাও। এইরূপে প্রতি-দিন যদি তুমি হস্ত উত্তোলন করিয়া রাখিবার অভ্যাস কর, তাহা হইলে দেখিবে, এক মাসের মধ্যেই তোমার এরূপ ক্ষমতা জন্মিবে যে, তখন এক ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত হস্ত উত্তো-লন করিয়া রাখিলেও তোমার অতি সামান্যমাত্র ক্লেশ হইবে। দশ মিনিট মাত্র হস্ত নামাইয়া রাখিলেই সে ক্লেশ নিবারিত হইবে।

এইরূপে দুইমাস অভ্যাস করিলেই তুমি দেখিবে যে, হস্ত উত্তোলন করিয়া রাখিলেই তুমি আরাম বোধ কর, আর নামাইয়া রাখিলেই তোমার কষ্ট হয়। ক্রমশঃ তিন চারি

মাসে দেখিবে, তোমার হস্ত আর সহজে নামিতে চায় না। উহা রসরক্ত-বিহীন হইয়া অস্থিমাত্রে পর্য্যসিত হইয়াছে। সেই অস্থিময় হস্ত নামাইতে গেলে তোমার প্রাণান্ত ক্লেশ হয়! সুতরাং একবৎসরের মধ্যেই তোমার ঊর্দ্ধবাহু যোগ অভ্যস্ত হইবে। কিন্তু তুমি এরূপে একবৎসর মাত্র অভ্যাস করিলেই একজন এম্ এ হইতে পারিবে না। অতএব বুঝিয়া দেখ, যাহাকে আমরা "কঠোর তপস্যা" বলি, তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে "কঠোর তপস্যা" নহে। আমরা সাংসারিক মোহে পড়িয়া যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়া থাকি, প্রকৃত-প্রস্তাবে সেরূপ কঠোর তপস্যা সুখান্বেষী যোগীর পক্ষে নিতান্তই দুঃসাধ্য বা অসাধ্য!! ফলতঃ, আমরা যে হঠ যোগকে অতি দুশ্চর বলিয়া মনে করি, তাহাও একজন এম্ এ পরীক্ষার্থীর তপশ্চর্য্যের তুলনায় অতি যৎসামান্য! অতি অনায়াস-সাধ্য!! যদি অঙ্কপাত করিয়া কঠোরতার সম্বন্ধ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে তাহাও অনায়াসে গণনা করিয়া দেখা যায়। এরূপে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেখিলে অনায়াসেই অবধারিত হইবে যে, দশ এর সহিত এক এর যে অনুপাত, একজন এম্ এ পরীক্ষার্থীর কঠোরতার সহিত একজন হঠযোগীর কঠোরতার সেই অনুপাত। অর্থাৎ একজন হঠযোগী অপেক্ষা একজন এম্ এ দশগুণ কঠোর-তপাঃ!

অতএব নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, যোগসাধন দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করা যায়। এবং যোগসাধনও কিম্ভূত-কিমাকার বা অসাধ্য-সাধন নহে। ইহা অতি অনায়াস-

সাধ্য। অথচ ইহার ফল অসীম! অনন্ত!! একবৎসর মাত্র যোগ-সাধন করিলে যে সুখ অনায়াসে লাভ করা যায়, একজন এম্ এ তাহার সহস্রাংশের বা লক্ষাংশের একাংশ-মাত্র সুখও লাভ করিতে পারেন না। একজন যোগীর লব্ধ সুখের সহিত একজন এম্ এ পরীক্ষোত্তীর্ণের লব্ধ সুখের তুলনা অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করাও অসাধ্য!! তবে সেই সুখ লাভের একটু আভাসমাত্র প্রদান করিতেছি;—

একজন ব্যাধ অতিমাত্র শ্রান্ত হইয়া একটী কাঠ-বিড়াল শিকার করিল! এই কাঠ-বিড়ালটী ধরিবার জন্য তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কত যে কণ্টকে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাকে কত যে দৌড়াদৌড়ি করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সে সেই কাঠ-বিড়ালের চামড়াখানা এক বিলাসিনী বিবিকে বিক্রয় করিয়া চারি আনার পয়সা পাইল!!

কিন্তু এক ব্যক্তি আতপ-তপ্ত দেহ স্নিগ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র-তীরে গমন করিলেন; এবং সমুদ্র-তটে নিরীক্ষণ করিতে করিতে একটী মুক্তা পড়িয়া পাইলেন। মুক্তাটী কোন জহুরির নিকট বিক্রয় করিয়া তিনি চারি হাজার টাকা পাইলেন। এক্ষণে উভয়ের লাভের যদি অনুপাত স্থির করিতে ইচ্ছা কর, তবে চেষ্টা করিয়া দেখ। কিন্তু চারি আনার সহিত চারি হাজার টাকার তুলনা করিলেই যথার্থ অনুপাত স্থিরীকৃত হইবে না। উভয়ের আয়াসের পরিমাণও গণনার মধ্যে ধরিতে হইবে। এখন বুঝিলে কি, একজন এম্ এ পরীক্ষোত্তীর্ণের লব্ধ সুখের সহিত একজন যোগ-সাধকের লব্ধ সুখের অনুপাত কিরূপ?

সাত্ত্বিক যম-সাধনে সিদ্ধ যোগী ইচ্ছামাত্রেই অতি অল্পায়াসে সাংসারিক অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিতে পারেন। অতুল মান মর্য্যাদাও লাভ করিতে পারেন। অথচ হৃদয়ে অতুল সন্তোষের অধিকারী হইয়া প্রাণ শীতল করিতে পারেন।

তবে প্রাণ শীতল করাই যোগীর উদ্দেশ্য। মুক্তা অন্বেষণ করা যোগীর উদ্দেশ্য নহে। সেই জন্যই যোগীরা মুক্তা পান না। তাঁহারা চান না বলিয়াই পান না। কিন্তু তাঁহারা চাহিলেই পাইতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যোগের যদি এত মাহাত্ম্য, তবে সংসারে যোগী দেখা যায় না কেন? যদি স্নানের জন্য গেলেই মুক্তা পাওয়া যায়, তবে লোকে কাঠ-বিড়ালী ধরিবার জন্যই বা প্রাণান্ত পরিশ্রম করে কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক। অতএব শুন;—

লোকে যোগসাধন করে না কেন?

নানা কারণেই যোগসাধনে লোকের প্রবৃত্তি হয় না। লোকমাত্রেই প্রথমে ক্ষুধার ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইতে চায়। ক্ষুধার ক্লেশ নিবারণের উপায় হইলেই তাহারা বিলাসব্যসনে রত হয়। বিলাসব্যসনে রত হইলেই কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি রিপুগণের নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়ে এবং শেষে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া অর্থাৎ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ইহাই সাংসারিক সাধারণ জনগণের সাধারণ গতি। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

পুরুষ প্রথমে বিষয়ের ধ্যান করে, এই ধ্যানে তাহার বিষয়াসক্তি জন্মে, বিষয়াসক্তি হইতেই কাম উৎপন্ন হয়, কাম হইতে ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতে মোহ জন্মে, মোহ জন্মিলেই স্মৃতি বিনষ্ট হয় আর স্মৃতি বিনষ্ট হইলেই বুদ্ধি-ভ্রংশ হয় এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইলেই সম্পূর্ণ বিনাশ বা অধঃ-পতন বা সর্ব্বনাশ হয়।

শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ উদাহরণ দেখিয়া ভগবানের এই বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুকৃতি-শালী ব্যক্তিরা বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য আশ্রয় করেন; এবং সেইখানেই যোগাভ্যাস করিয়া থাকেন। অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সাধারণ মনুষ্যের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, কোন তীর্থ স্থান আশ্রয় করিয়া, সেই স্থানেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। কিংবা সংসারে থাকিলেও বিষয়-বিরাগ-বশতঃ নিতান্ত দীনভাবাপন্নের ন্যায় অবস্থিতি করেন, এবং যেন গুরুতর দোষীর মত বিরলে আত্মগোপন করিয়া—প্রচ্ছন্নভাবে ইহলোক হইতে বিদায়ের অপেক্ষা করেন।

সুতরাং এ সংসারে জনক-রাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী রাজযোগ-সম্পন্ন মহাত্মার নিতান্তই অভাব। আর আদর্শের অভাব বলিয়াই যোগসাধনের উন্নতিরও অভাব দেখা যায়। লোকে যদি দেখিতে পায় যে, যোগ-সাধনে অতি সহজে

ধনমানসুখ অর্জ্জন করা যায়, লোকে যদি তাহার জীবন্ত আদর্শ দেখিতে পায়, তাহা হইলে এই যোগপথে পঙ্গপালের ন্যায় লোক-সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আদর্শের অভাবে, পথ-প্রদর্শকের অভাবে, কেহই অনিশ্চিত পথে যাইতে ইচ্ছা করে না, সাহস করে না। সেই জন্যই সংসারে যোগসাধনে লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায় না।

কুদৃষ্টান্তের জন্য ও কুসংস্কারের জন্যও লোকে যোগপথের পথিক হয় না। ধর্ম্মধ্বজী বা কপট ধার্ম্মিকগণ, ভণ্ড যোগিগণ, সন্ন্যাসী নামের নিতান্ত অযোগ্য অথচ বাহ্য সন্ন্যাসবেশধারিগণ, এই কুদৃষ্টান্ত। যাহারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে চুরি বা ডাকাইতি করিতে পারে না, এরূপ অলস ভীরু কাপুরুষগণ, ধার্ম্মিকের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, কোনরূপে লোককে মোহিত করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, আপনাদের উদরপূর্ত্তি করে এবং পরিবার প্রতিপালন করে। যাহারা বেদিয়া অর্থাৎ চুরি করাই যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা বহুরূপী সাজিয়া লোকের নিকট অর্থোপার্জ্জন করে; কিন্তু দেখে যে, বহুরূপীর মধ্যে সন্ন্যাসিরূপী হইলেই অধিক অর্থ উপার্জ্জন করা যায়; সেই জন্য তাহারা প্রায়ই কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর বেশেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং লোক সকলকে জ্বালাতন করিয়া মারে।

খুনে আসামী অর্থাৎ পুলিসের হস্ত হইতে বা কারাগার হইতে পলায়িত হত্যাকারী ব্যক্তিরাও এই সন্ন্যাসবেশ ধারণ করে। ইহাই অধুনা শাস্তির হাত এড়াইবার সহজ উপায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ও পরীক্ষা করিয়া

লোকের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যোগসাধনেরই এই সকল ফল ! ! অথবা যোগ-সাধন বা যোগী বলিলেই, পূর্ব্বোক্ত ছদ্মবেশী ও কপটাচার ব্যক্তিদের কথাই তাহাদের মনে উদিত হয়। সুতরাং যোগের প্রতি এই কারণে সহজেই বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা জন্মে। এজন্য লোকের যথার্থ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকিলেও, পাছে দস্যুতস্করের দলে মিশিতে হয় বা দস্যুতস্কর বলিয়াই গণ্য হইতে হয়, এই ভয়েও যোগসাধনে প্রবৃত্তি হয় না।

কুসংস্কারবশতঃ অনেকে যোগসাধন করে না। অনেকেই মনে করে, যোগসাধন করা সংসারী ব্যক্তির নিতান্তই অসাধ্য। যোগসাধন করিতে হইলেই হিংসা ত্যাগ করিতে হয়, অসত্য পরিত্যাগ করিতে হয় ; কিন্তু ইহা সংসারী ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কেহ মনে করে, যোগী হইতে হইলেই ধার্ম্মিক হইতে হয়, আর ধার্ম্মিক হইতে হইলেই সংসার ত্যাগ করিতে হয়, স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিতে হয়, বনে গিয়া বাস করিতে হয়, অর্থাৎ যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বাঘভালুকের হাতে প্রাণটী সমর্পণ করিতে হয় ! কেহ বা মনে করে, যোগসাধন করিতে হইলে আসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয় অর্থাৎ ভালরূপ জিম্‌ন্যাষ্টিক ও বেদিয়া-বালিকার মত কুম্ভক শিক্ষা করিতে হয়, ইহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে গেলেই শ্বাস কাস যক্ষা হইতে পারে। বিশেষতঃ সংসারে যোগী নাই, যোগ শিক্ষা দিবার গুরুও নাই, সুতরাং যোগসাধন নিতান্ত উপহাসের কথা। এইরূপ শত শত কুসংস্কার বশতঃ লোকে যোগসাধন করে না।

বৃথা জ্ঞানাভিমানও এই যোগসাধনে লোককে নিবৃত্ত করে। এ কথাটী একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি, শুন ;—

হরলাল মিত্র মহাশয় বি এ পাস করিয়াছেন। কিন্তু উপার্জ্জন করিবার পন্থা শিক্ষা করেন নাই। সুতরাং অলঙ্কারের জন্য গৃহিণীর গঞ্জনা নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে, হরলাল আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হরলাল দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি একগাছি দড়ি ও একটী কলসী লইয়া গঙ্গার অভিমুখে নিশীথসময়ে গমন করিতেছেন। দৈবাৎ কোন মহাপুরুষ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ওহে বাপু! আত্মহত্যা করিয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিবে কেন? যোগাভ্যাস করিয়া পুণ্যসঞ্চয় কর। ইহজন্মেই অভিলষিত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে। আত্মহত্যা করিলে পরজন্মেও এই আত্মহত্যার সংস্কার তোমার মনে থাকিবে এবং পরজন্মেও দুঃখে পড়িয়া আত্মহত্যা করিবে। এইরূপে অনন্তকাল তোমাকে ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; অতএব বাপু, এ পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

হরলাল একটু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। এ লোকটা কিরূপে আমার মনের ভাব জানিতে পারিল? এই প্রশ্নই তাহার বিস্ময়ের কারণ। তাহার পরক্ষণেই হরলাল যুক্তি অবলম্বন করিয়া বুঝিলেন যে, এত অধিক রাত্রিতে কলসী লইয়া গঙ্গা-অভিমুখে যাওয়াতেই এ লোকটা সহজে অনুমান করিয়াছে যে, আমি আত্মহত্যা করিব। যাহা হউক,

লোকটার কাছে জানাই যাউক্, যোগাভ্যাস ব্যাপারটা কি ? এইরূপ মনে করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, যোগাভ্যাস কিরূপে করিতে হয় ?"

ম। যোগাভ্যাসের প্রথমে যমসাধন করা আবশ্যক। অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রত পালন করা আবশ্যক।

হ। মহাশয়, আমি নিতান্ত শিশু বালক নহি। আমি একজন গ্রাজুয়েট ! আমি বি এ পাস করিয়াছি !

"কাহাকেও কুবাক্য বলিও না।"

"মিথ্যা কথা বলিও না।"

"পরের দ্রব্য চুরি করিও না।"

এ সকল শিশুদের পাঠ্য। আমি যখন মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করি নাই, তখনই স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে ঐ সকল কথা শিখিয়াছিলাম। অতএব আপনি আমাকে অজ্ঞান বালক মনে করিবেন না।

ম। বাপু, শিশুপাঠ্য পুস্তকেও যে যম-সাধনের কথা লেখা আছে, তাহা আমি জানি। কিন্তু সেই উপদেশ অনুসারে সাধনা করিয়াছ কি ? সাধনা ত কর নাই ! অভ্যাস ত কর নাই !

হ। মহাশয়, অভ্যাস করিতে করিতেই চিরটা কাল কাটাইয়াছি। আমি নিম্ন-প্রাইমারি হইতে আরম্ভ করিয়া বি এ পর্য্যন্ত কেবল অভ্যাস করিয়াই পরীক্ষা দিয়াছি। আর এখন আমি আপনার নিকট অভ্যাসের পরীক্ষা দিতে চাই না।

এই বলিয়া হরলাল বেগে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। মহাপুরুষ তাহার দুরবস্থা দেখিয়া করুণার্দ্র হইলেন। কিন্তু এই জ্ঞানাভিমানী মহামূর্খকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা সহজ নহে দেখিয়া, তিনি স্বীয় প্রভাব দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিলেন "দাঁড়াও! দাঁড়াও!!!"

হরলাল মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—

"আমার দিকে তাকাও!"

হরলাল যোগীর চক্ষুতে চক্ষু মিলাইলেন। অমনি তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল।

যোগী দেখিলেন, একটা প্রেত তাহার স্থূলদেহান্তর্গত সূক্ষ্ম শরীরকে যথাশক্তি আকর্ষণ করিতেছে! ভীষণ প্রতি-হিংসার জন্য প্রেত অত্যন্ত উন্মত্ত ও ব্যস্ত হইয়াছে! তখন মহাপুরুষ সমস্ত বৃত্তান্তই বুঝিলেন। হরলালের সমস্ত চরিত্রই তাঁহার নখদর্পণে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তিনি অরিষ্ট-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, হরলালের পরমায়ুঃ আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে! সুতরাং কালের সহিত সংগ্রাম নিতান্ত অনুচিত মনে করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন,—

"যাও। আশীর্ব্বাদ করি, পরজন্মে তোমার জ্ঞানোদয় হইবে।"

তখন হরলাল দ্রুতবেগে গঙ্গায় গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতছে যে, যোগ-সাধনের

কথা নিতান্ত সামান্যজ্ঞানে বৃথা জ্ঞানাভিমানীরা গ্রাহ্যও করে না।

একজন হোমিওপেথিক ডাক্তার সামান্য লবণ দ্বারা ত্রিংশৎক্রমের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পুরাতন জ্বরে রোগীকে সেবন করিতে দিতেন। রোগীরা মহামূল্য জ্ঞানে সেই ঔষধ লইয়া যাইয়া সেবন করিত এবং উপকার পাইত। কিন্তু যখনই লোকে কোন প্রকারে জানিতে পারিল যে, যে লবণ আমরা অন্নব্যঞ্জনের সহিত নিত্য প্রচুর-পরিমাণে ব্যবহার করি, ডাক্তার মহাশয় তাহারই কণামাত্র বা অণুমাত্র দিয়া থাকেন। তখন আর কেহই তাঁহার নিকট ঔষধ লইতে যাইত না।

এইরূপ, যখনই আধুনিক বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা জানিতে পারেন যে, যোগসাধনের প্রথমে অহিংসা-সত্য-অস্তেয় প্রভৃতি অভ্যাস করিতে হয়, তখনই মনে করেন, সে অভ্যাস ত বাল্যকালেই করিয়াছি, আবার এখন বুড়ো বয়সে কি অভ্যাস করিব? "হা অদৃষ্ট! চুরি করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না, এ কি চিরকালই অভ্যাস করিতে হইবে?" বিদ্যাবাগীশগণের দৃঢ়সংস্কার যে, অভ্যাস বলিলেই মুখস্থ করা বুঝায়। সুতরাং এইরূপ বুঝিবার দোষেও অনেকে যোগাভ্যাস করে না। অধিক কি, অনেকে বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি-পুরাণ-সংহিতা-তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত পড়িয়াও বুঝিতে পারেন না যে, ধর্ম্মসাধনের বর্ণপরিচয়মাত্রও তাঁহাদের অভ্যস্ত হয় নাই, বরং ইহার ঠিক্ বিপরীত সংস্কার বা বিপরীত বুদ্ধিই জন্মিয়া থাকে। তাঁহারা মনে

করেন, "আমাদের কোন ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে আর বাকি নাই।" এই ঘোর মোহান্ধতাই ধর্ম্মসাধনের বা যোগ-সাধনের বিষম অন্তরায়।

পুনঃ, লোক-সকল আপাত-প্রলোভনেই মোহিত হয়। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ যখন হিন্দুরাজগণের অধীন ছিল, তখন রাজারা যোগীদের পরম সমাদর করিতেন। যোগীরা নিস্পৃহ ও বীতরাগ বলিয়া রাজাদের নিকট কোন উপকার-প্রাপ্তির আশা বা ইচ্ছা করিতেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহারা রাজাদিগকে কর্ত্তব্য উপদেশ দিবার জন্য অর্থাৎ সাধারণ প্রজাগণের হিতসাধনের জন্য সর্ব্বদা রাজসভায় গমন করিতেন। রাজারাও তাঁহাদের আগমনমাত্রেই সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিতেন। এই সম্মান ও সমাদর দেখিয়াও অনেকের যোগী হইবার জন্য ইচ্ছা জন্মিত। অনেকে হয়ত যোগের প্রকৃত গৌরব বা প্রকৃত মাহাত্ম্য না বুঝিয়াই কেবল এই সমাদরের প্রলোভনে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রবৃত্ত হইয়া শেষে তাঁহারাও বুঝিতে পারিতেন যে, রাজসম্মান অতি তুচ্ছ বিষয়, ইহা যোগীদিগের নিতান্ত হেয়। যোগীদিগের রাজসভায় গমনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র!

বর্ত্তমান সময়ে যোগীর রাজসম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। বরং যোগীকে রাজার নিকট বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এখন ফলমূলাশী হইয়া যে কেহ নিশ্চিন্ত-চিত্তে যোগসাধন করিবেন, তাহার সুবিধা নিতান্ত অল্প হইয়াছে। এখন ট্যাক্স না দিলে দেহটী রাখিবার একটু

স্থান পাইবার যো নাই!! বনে গিয়াও নিস্তার নাই; বনেরও একটী ফল বা একটী পাতা পাড়িলে বনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ অমনই জেলে পুরিবেন। সুতরাং এখন যোগ-সাধনে রাজ-বিড়ম্বনাই ভোগ করা যায়; রাজসম্মান লাভের সম্ভাবনা নাই!

আপাততঃ সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য যেন রাজার একটু উৎসাহ-দান দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই উৎসাহদানের উদ্দেশ্য যখন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তখনই অনেকে সংস্কৃতের চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া অন্ন-সংস্থানের নিমিত্ত এম্ এ পরীক্ষার জন্যই কঠোর ক্লেশ সহ্য করিতে উদ্যত হইবেন। কিন্তু শেষে দেখিবেন, এম্ এ পাস করিলেও অন্নের সংস্থান বা ক্লেশনিবারণ হইবে না।

যখন ইংরাজগণ প্রথমে এদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন পরস্পরের ভাষাবোধ বা মনোভাব-বোধ নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছিল। সুতরাং রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থেই এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়াও নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। সে সময় যাঁহারা অতি সামান্য-মাত্র ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলেন, তাঁহারাও রাজসম্মান পাইয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। এই জন্যই ইংরাজী ভাষা শিখিতে লোকের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছিল এবং তজ্জন্যই এখন বহু ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছেন। এখন আর রাজকার্য্যের জন্য ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নাই। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থাৎ রাজশক্তি পরিচালনের জন্যই রাজভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

সুতরাং রাজভাষা শিক্ষা করিলেই সেই রাজশক্তি পরিচালনের জন্য শক্তি লাভ করা যায়। এই রাজশক্তির প্রভাব বা প্রতাপ অত্যন্ত অধিক। এই রাজশক্তির বিন্দুমাত্র লাভ করিলেও সাধারণ প্রজাগণের যে কোন ব্যক্তিকেই সহজে বশীভূত, পরাজিত, আয়ত্ত বা বিধ্বস্ত করা যায়। এই শক্তিলাভের জন্য অর্থাৎ জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হইবার জন্য দলে দলে লোক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, এখনও চেষ্টা করিতেছে। এম্ এ হইবার জন্য কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য এই রাজশক্তি লাভ। এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এই রাজভাষা সম্যক্ আয়ত্ত হয়।

কিন্তু এক্ষণে রাজকার্য্যের প্রয়োজন নিঃশেষিত হইয়াছে। সুতরাং অনেক এম্ এ বি এ এখন তপস্যার ফলে বঞ্চিত হইয়া নিরাশ হইতেছেন। নিরাশ হইয়া অনেকে যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। অনেকে যন্ত্রণা অসহ্য বোধ করিয়া আত্মহত্যা করিতেও সঙ্কুচিত নহেন।

বিদেশীয় বিজাতীয় ভাষা অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা-সাপেক্ষ। সেই তপস্যার ফল যে কিছুই হয় না, ইহা অসঙ্গত কথা। কোন জাতির ভাষা অভ্যাস করিলে, সেই জাতির ভাবও অভ্যস্ত হইয়া পড়ে; সেই সঙ্গে, যদি প্রাকৃতিক কোন বিশেষ বাধা না থাকে, তবে সেই জাতির দোষ গুণ সমস্তই অভ্যস্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমস্ত লোকের পক্ষে ইংরাজদের সমস্ত দোষগুণ অভ্যাস করা সম্ভাবিত নহে; যেহেতু তাহাতে প্রাকৃতিক বাধা আছে। ইংরাজেরা বা ইউরোপীয়েরা সহজে অর্থাৎ

প্রাকৃতিক কারণে যে যোগ সাধনের অধিকারী হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয়েরা সহজে সে যোগ-সাধনের অধিকারী হইতে পারেন না। ইংরাজেরা সহজেই রজস্তামসিক যোগী। কিন্তু ভারতবর্ষীয়গণের পক্ষে উক্ত যোগ নিতান্ত সহজ নহে। ইহার কারণ পশ্চাৎ সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইতেছে ;—

রজস্তামসিক যোগ।

ইংরাজগণ এই রজস্তামসিক যোগে সাংসারিক এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা শীতপ্রধান দেশের লোক। শীতপ্রধান দেশে কামরিপু স্বভাবতই অল্প থাকে। সেই জন্যই শীতপ্রধান দেশে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে যৌবন-চিহ্নাদি প্রকাশ পায়। শীত-প্রধান দেশের লোক স্বভাবতই পরিশ্রমী হইয়া থাকে ; যেহেতু সেখানে পরিশ্রম না করিলে বাঁচিবার যো নাই। যে দেশের লোক অধিক পরিশ্রমী সেই দেশের লোকের ক্ষুধাও অতিরিক্ত। অতিরিক্ত ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যও আবার অতিরিক্ত পরিশ্রমেরও প্রয়োজন। স্বদেশে প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন না হইলে বিদেশ হইতে খাদ্য আহরণের প্রয়োজন। যাহারা নিয়ত পরিশ্রমে ব্যাপৃত, তাহারা পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট অবকাশ পায় না ; সুতরাং স্বতঃই তাহারা বীর্য্যবান্ ও ওজস্বী হয়। এই সকল কারণেই ইংরাজগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী, বাণিজ্য-প্রিয়, বলবান্ এবং নিয়ত কার্য্যব্যস্ত। ক্ষণমাত্র সময়কেও তাঁহারা অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করেন। অসত্যাচরণ করিলে বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়, এমন কি

ভিন্নদেশীয়ের সহিত বা স্বদেশীয়ের সহিত বাণিজ্য চলিতেই পারে না; এই কারণেই তাঁহারা সাধারণতঃ সত্যবাদী। তাঁহারা সংসারে অর্থকেই পরমার্থ বলিয়া মনে করেন; সেই জন্যই তাঁহারা কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনের ধ্যানেই নিমগ্ন। অধিক কি, কোটিপতিও আপনাকে যেন নিতান্ত দরিদ্র মনে করিয়া, মানাপমান বা সুখদুঃখের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়াও অর্থসঞ্চয়ে লালায়িত! এই অর্থনাশ-ভয়েই তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, মিষ্টভাষী ও সভ্য। অর্থসঞ্চয়ের জন্য তাঁহারা সমস্ত ক্লেশই সহ্য করিতে পারেন। এই অর্থের জন্যই তাঁহাদিগকে প্রকৃত যোগী বা মহাযোগীও বলা যায়। সাধারণতঃ ভদ্র ইংরাজের প্রকৃতি এইরূপ।

প্রাকৃতিক কারণেই ইংরাজেরা উক্তরূপ রজস্তামসিক যোগী হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, সুতরাং এখানে নিতান্ত কৃত্রিম উপায় অবলম্বন না করিলে, এইরূপ যোগসাধনের সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য অনেকে ইংরাজী ভাষা ও রীতিনীতি সম্যক্ শিক্ষা করিয়াও ঠিক্ ইংরাজদের গুণ অনুকরণ করিতে পারেন না। অনেকে ভ্রান্তবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া মনে করেন যে, ইংরাজেরা মদ্য-মাংসাশী বলিয়াই এত তেজস্বী ও পরিশ্রমী এবং সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজের দোষ অনুকরণ করিতে গিয়া অতি সত্বরই অধঃপতিত ও বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

ফলতঃ এদেশীয়গণ ইংরাজের ভাষা আয়ত্ত করিয়াও প্রাকৃতিক বাধার জন্যই ইংরাজগণের গুণ আয়ত্ত করিতে

পারেন না। আসিয়ার অন্তর্গত জাপানদ্বীপের লোকেরা ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজের গুণ উভয়ই আয়ত্ত করিয়াছেন; যেহেতু সেখানে উক্ত গুণ আয়ত্ত করিবার প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাধা নাই।

অনেকে ইংরাজী ভাষা ও ভাব আয়ত্ত করিয়া কৃত্রিম তেজস্বিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইংরাজের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহাদের বিদ্বেষভাজন হইতেছেন। সেই জন্যই এখন ইংরাজরাজও উচ্চশিক্ষার প্রতিকূল হইয়াছেন। আর রাজ-কর্ম্মচারীর অভাব নাই; সুতরাং এখন আর ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিয়া এদেশীয়দিগকে স্পর্দ্ধান্বিত করা অনুচিত বলিয়া ইংরাজ-রাজপুরুষগণের বিলক্ষণ ধারণা জন্মিয়াছে।

ইংরাজগণ দেখিতে পান যে, যাহারা ইংরাজী ভাষা না জানে, তাহারা নিতান্ত ভালমানুষ বা গো-বেচারা। সুতরাং ইংরাজী ভাষা শিক্ষার অনুরাগ প্রশমিত করিবার জন্যই এখন রাজপুরুষগণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তবে পাদ্রী সাহেবদের ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই বাইবেল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; সুতরাং তজ্জন্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক। বিশেষতঃ মিশনরিগণের মধ্যে অনেকেই রজঃসাত্বিক যোগী। তাঁহাদের মধ্যে সত্বগুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক মিশনরি প্রকৃতই পরদুঃখ দূর করিতে লালায়িত। ইংরাজগণের মধ্যে ইহাঁরাই যথার্থ রাজগুণসম্পন্ন বা প্রকৃত ক্ষত্রিয়। এই মিশনরিগণই ইংরাজ-রাজত্বের প্রধান শক্তি। এই মিশনরিগণের ধর্ম্মপ্রভাবেই ইংরাজেরা পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছেন।

যাহা হউক, অতঃপর আমাদের কর্ত্তব্য কি? পৃথিবীর আদর্শ স্বরূপ ভারতভূমিতে—আর্য্যভূমিতে এক্ষণে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাড়োয়ারি ও পার্শীরা বৈশ্য বটে, কিন্তু ইংরাজগণের তুলনায় তাহারাও নিতান্ত হীনাবস্থ। এই বিশাল বঙ্গভূমিতে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ, তিন বর্ণেরই অত্যভাব! অর্থাৎ এখানে দ্বিজপদবাচ্য ব্যক্তির নিতান্ত অভাব।

এখন আমাদের আবশ্যক কি?

আর্য্যভূমির স্বাধীনতা ও আর্য্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য কতকগুলি ক্ষত্রিয় আবশ্যক। আর সকলের পক্ষে সাধ্যানুসারে বৈশ্যত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্যই চেষ্টা করা আবশ্যক। ফলতঃ শূদ্রত্ব পরিহারের চেষ্টা করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বা আবশ্যক। অতএব আমাদের রজঃসাত্বিক যোগের প্রয়োজন এবং সত্বরাজসিক যোগেরও প্রয়োজন। এই যোগসাধন ব্যতীত আমাদের আর সুখশান্তিলাভের আশা নাই; উপায়ও নাই।

ইংরাজী ভাষার গুণে, এবং রেলওয়ে, ডাকঘর প্রভৃতির সুব্যবস্থার গুণে, এখন সমগ্র ভারতভূমি যেন একটী রাজ্য বা একটী পল্লীর ভাব ধারণ করিয়াছে। ইংরাজীভাষাবিৎ, এই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারেন; সর্ব্বত্রই স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। কেবল ভারতবর্ষ কেন, ইংরাজীভাষাবিৎ পণ্ডিত এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপে ভ্রমণ করিতে পারেন। অতএব ইংরাজী

ভাষা শিক্ষা করাও আবশ্যক। কিন্তু রজঃসাত্বিক এবং সত্ব-রাজসিক যোগী এই ইংরাজী ভাষা অতি অল্প দিনেই আয়ত্ত করিতে পারেন। এমন কি, দশ বৎসর পড়িয়া অন্য সাধারণে যে পরিমাণে ইংরাজীভাষায় জ্ঞানলাভ করেন, রজঃসাত্বিক বা সত্বরাজসিক যোগী এক বৎসরেই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। যোগসাধনে যে শক্তি লাভ করা যায়, সেই শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর যে কোন ভাষা হউক্, অনধিক এক বৎসরেই আয়ত্ত করা যায়। যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন, কেবল তাঁহাদেরই পক্ষে এই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। নতুবা ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা নিতান্ত অনাবশ্যক।

প্রকৃত ওজস্বিতা বা তেজস্বিতা না থাকিলে, প্রকৃত পরাক্রম ও শক্তি না থাকিলে, মুখের কৃত্রিম আস্ফালনে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করা অসম্ভব। অতএব ক্ষত্রিয় হইবার জন্যও যোগসাধনের প্রয়োজন। যদিও এই ক্ষত্রিয়ত্ব মনুষ্যত্বের আদর্শ নহে, তথাপি প্রবৃত্তিবশে যাঁহারা স্বদেশের রাজা হইতে অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা ভলান্‌টিয়ার হইতে লালায়িত, তাঁহাদের জন্যই এই ক্ষত্রিয়ত্বের প্রয়োজন। ফলতঃ এখন দাসত্ব বা শূদ্রত্ব পরিহারের জন্যই আমাদের সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা আবশ্যক।

এখানে কিন্তু ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণের প্রভেদ কিঞ্চিৎ বুঝিয়া রাখা উচিত।

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট। যদিও

ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অতি প্রশস্ত, কিন্তু সাধারণ ক্ষত্রিয়প্রকৃতি তাদৃশ প্রশস্ত নহে। ক্ষত্রিয়ের প্রেম স্বদেশনিষ্ঠ বা জন্মভূমি-নিষ্ঠ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় স্বীয় দেশ বা জন্মভূমির প্রতিই অত্যন্ত পক্ষপাতী। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই ক্ষত্রিয়ের যেন প্রধান উদ্দেশ্য। স্বদেশবাসীর স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষাই যেন ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় স্বদেশের রাজা হইতে ইচ্ছা করেন, অথবা স্বদেশের জন্যই পৃথিবীর রাজা হইতে ইচ্ছা করেন। ক্ষত্রিয়ের শত্রু ও মিত্র আছে; জাতিভেদ আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি এরূপ সঙ্কীর্ণ নহে। ব্রাহ্মণের প্রেম বিশ্বব্যাপী। ব্রাহ্মণ জগতের কীটাণুকেও আপনার সহিত অভেদাত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার নিকট সকলেই প্রেমময়; সকলেই পবিত্র; সকলেই মিত্র। তাঁহার শত্রু নাই। তাঁহার জাতিভেদ নাই। এই ব্রাহ্মণ বিশ্বের অধিপতি। জগতের গুরু ও পিতা। ফলতঃ এই ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য অনন্ত।

আমি অনেক বড় বড় কথা অতি সঙ্ক্ষেপে, এমন কি ইঙ্গিতমাত্রে প্রকাশ করিয়াছি। চিন্তা করিয়া সেই সকল কথাকে পল্লবিত করিয়া লও। তাহা হইলেই সম্যক্ বুঝিতে পারিবে যে, কি অর্থ-সম্পদ্, কি শক্তিসামর্থ্য, কি রাজ্য, কি ঐশ্বর্য্য, কি সুখশান্তি, কি পরম নির্ব্বৃতি, সমস্তই যোগসাধন দ্বারা লাভ করা যায়।*

* যোগসাধন দ্বারা কিরূপে বৈশ্যত্ব অর্থাৎ ধনসম্পদ্ লাভ করা যায়, কিরূপে ক্ষত্রিয়ত্ব অর্থাৎ রাজ্য-সম্পদ্ লাভ করা যায় এবং কিরূপেই বা ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ পরমার্থ লাভ করা যায়, তাহা যথাসময়ে গ্রন্থান্তরে ক্রমশঃ অতি বিস্তৃত ও বিশদরূপে প্রকাশিত হইবে।

এক্ষণে যোগসাধনের প্রয়োজনসম্বন্ধে যাহা যাহা বলা আবশ্যক, সমস্তই বলা হইল। অতএব আর অন্য কথায় কাজ নাই, অতঃপর যোগসাধনের জন্য সার কথার আলোচনা করা যাউক্।

যোগসাধন।

যে বিষয়ে যিনি উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, সেই বিষয়টী তাঁহাকে অগ্রে অতি যত্নসহকারে নিয়ত মনে ধারণা করিতে হইবে, পরে একাগ্রচিত্তে তাহা ধ্যান করিতে হইবে।

কিন্তু চিত্তের ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থা নিবারণ করিতে না পারিলে একাগ্র অবস্থা হইতে পারিবে না। তজ্জন্য কোন বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইতে হইলেই, অগ্রে চিত্তের ক্ষিপ্ত এবং মূঢ় অবস্থা দূর করা কর্ত্তব্য। চিত্তের চঞ্চল অবস্থাকেই চিত্তের ক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলে এবং চিত্তের জড়তাকেই বা আলস্যকেই মূঢ়তা বলে। অতএব ধারণা ও ধ্যানের জন্যই একাগ্র অবস্থার প্রয়োজন, এবং সেই একাগ্র অবস্থার জন্যই মনের চাঞ্চল্য ও আলস্য দূর করা আবশ্যক।

মনের চাঞ্চল্য ও মূঢ়তা দূর করিতে হইলে, সেই চাঞ্চল্য ও মূঢ়তার কারণ বর্জ্জন করাই আবশ্যক। অর্থাৎ মন কি কি কারণে চঞ্চল ও বিমূঢ় হয়, অগ্রে সেই কারণগুলি জানিয়া, সেই কারণগুলি পরিবর্জ্জন করিতে হয়। কারণ পরিত্যাগ করিলে আর কার্য্যের সম্ভাবনা থাকে না, ইহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। অতিভোজন করিলে

উদরাময় হয়, অতএব অতিভোজন না করিলে উদরাময় হইতে পারে না। ইহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। এইরূপ উদরাময়ের যে যে কারণ আছে, সেই সমস্ত কারণ বর্জ্জন করিলে আর উদরাময় হইবার সম্ভাবনা নাই; ইহা সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তদ্রূপ যে যে কারণে মন অস্থির বা অলস হয়, সেই সেই কারণ বর্জ্জন করিলেই মন একাগ্র হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্ত অগাধ জ্ঞান-সম্পন্ন পরম ঋষিগণ অবধারণ করিয়া গিয়াছেন যে, রজোগুণের আধিক্যে মন অস্থির হয়, তমোগুণের আধিক্যে মন বিমূঢ় হয়, এবং সত্ত্বগুণের আধিক্যে মন একাগ্র হয়।

অতএব মন একাগ্র করিতে হইলে, যাহাতে রজোগুণের ও তমোগুণের বৃদ্ধি না হয়, তদ্রূপ করাই কর্ত্তব্য; এবং যাহাতে সত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ করাই কর্ত্তব্য। এখানে কর্ত্তব্য শব্দ দুইবার উল্লেখ করাতে যেন দুইটী কর্ত্তব্য বুঝিও না। রজোগুণ ও তমোগুণের হ্রাস করিতে পারিলেই সত্বগুণের বৃদ্ধি স্বতঃই হয়। অথবা সত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে স্বতঃই রজোগুণ ও তমোগুণ হ্রস্ব হয়। অতএব প্রকৃত কর্ত্তব্য একটী। শরীরে বায়ুপিত্তকফের একটী নির্দ্দিষ্ট সমবায় আছে, সেই সমবায়ের হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই। (অথবা সেই সমবায়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হইলেই মৃত্যু হয়) কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটী বা দুইটীর বৃদ্ধি হইলে অপর দুইটী বা অপরটী হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সত্ত্বরজস্তমঃ সম্বন্ধেও তদ্রূপ মনে করিতে হইবে।

যাহাহউক, আমরা সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণকে দেখিতে পাই না। তাহাদের কার্য্য দেখিয়াই তাহাদের অস্তিত্ব বা হ্রাসবৃদ্ধি অনুভব করিয়া থাকি। যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হিতাহিত-জ্ঞানরহিত হইতে দেখি, তখনই বুঝিতে পারি যে, এই ব্যক্তির তমোগুণ ও রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যেহেতু ক্রোধ এবং তজ্জনিত অজ্ঞানতা বা মূঢ়তা, রজোগুণ ও তমোগুণেরই কার্য্য বলিয়া মহাত্মারা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বাহ্য লক্ষণ দেখিয়াই যেমন বায়ু-পিত্ত-কফের আধিক্য নির্ণয় করা যায়, তদ্রূপ বাহ্য লক্ষণ দেখিয়াই সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণের আধিক্য নির্ণয় করা যায়। বায়ু-পিত্ত-কফ শারীরিক গুণ বা দোষ, আর সত্ত্বরজস্তমঃ মানসিক গুণ। বায়ু পিত্ত কফ এই তিন ধাতুকে অবলম্বন করিয়াই যেমন শারীর স্বাস্থ্যের বিধান হইয়াছে, তেমনই সত্ত্বরজস্তমোগুণ অবলম্বন করিয়াই মানস স্বাস্থ্যের বিধান হইয়াছে। **নিদান-পরিবর্জ্জন** উভয় বিধানেরই মূল সূত্র। এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে এবং এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই যোগশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে।

নিদান কি ? কার্য্যের কারণকেই নিদান বলে।

তবে কারণ শব্দটী সাধারণ, আর নিদান শব্দটী বিশেষ। সামান্যতঃ দুঃখের বা রোগের কারণকেই নিদান বলে। "কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না", ইহা সাধারণ সূত্র। "নিদান পরিবর্জ্জন করিলে রোগ এবং দুঃখ হয় না।" ইহা

বিশেষ সূত্র। এই বিশেষ সূত্রই চিকিৎসাশাস্ত্রের এবং যোগশাস্ত্রের প্রধান অবলম্বন।

গাত্রদাহ, পিপাসা, মুখশোষ প্রভৃতি পিত্তপ্রকোপের লক্ষণ। অত্যন্ত রৌদ্র বা উত্তাপ ভোগ করিলেই এরূপ লক্ষণ হয়। অতএব চিকিৎসক ব্যবস্থা লিখিলেন ;—

"রৌদ্র এবং উত্তাপ ভোগ করিও না, করিলে পিত্ত-বৃদ্ধি হইবে এবং পিত্তজ সমস্ত রোগেরই নিদান হইবে।"

আঘাত মাত্রেরই প্রতিঘাত আছে ; ইহা জড়জগতের সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারেই পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লিখিলেন,—

"আঘাত করিও না, করিলে প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে।"

হিংসামাত্রেরই প্রতিহিংসা আছে, ইহা অন্তর্জগতের সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারেই মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লিখিলেন,—

"হিংসা করিও না, করিলে প্রতিহিংসা সহ্য করিতে হইবে।"

সমাহিত মহাযোগী এই মনস্তত্ত্বের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, সেই জন্যই তিনি ঋষি নামে বিখ্যাত। পরম ঋষি ব্যবস্থা করিলেন,—

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

অহিংসারূপ মহাব্রত সাধন কর, জগতের কেহই তোমার শত্রুতাচরণ করিবে না।

জগতের কেহই যদি তোমার শত্রুতাচরণ না করে, তবে তোমার উদ্বেগের কারণ বহুপরিমাণেই তিরোহিত হইবে। উদ্বেগের কারণ তিরোহিত হইলেই চিত্ত বা মন একাগ্র অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কেমন সুন্দর ব্যবস্থা! এক-বার হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝ। ঋষিবাক্যের তুল্য সহজ, সরল, যুক্তিমূলক, সত্য ও অব্যর্থ বাক্য জগতে আর নাই। এই ঋষিবাক্যে যতই শ্রদ্ধা জন্মিবে, ততই দিব্যজ্ঞানের উদয় হইবে। তখন জগতে যেন কোথাও অন্ধকার নাই বলিয়া বোধ হইবে। ঋষিবাক্যে বিশ্বাস জন্মিলে, জগতে কিছুই অসাধ্য বলিয়া বোধ হইবে না। কিন্তু "অন্ধবিশ্বাস" বলিয়া জগতে যে একটা কাল্পনিক কথা আছে, ঋষিবাক্যে তদ্রূপ "অন্ধ বিশ্বাসের" প্রয়োজন হয় না। ঋষিবাক্য প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য। এই পরীক্ষা যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে যে কোন স্থানেই করিতে পারে।

"আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়।" ইহা যেন এখন সকলেরই সহজ সত্য বলিয়া বোধ জন্মিয়াছে; অনেকে মনে করেন যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও যেন "অন্ধ-বিশ্বাসের" বশীভূত হইয়াই এ কথা বিশ্বাস করে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা অন্ধবিশ্বাস নহে; ইহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসিদ্ধ বিশ্বাস। তুমি তোমার শিশুপুত্রকে যদি সহস্রবার অত্যন্ত আগ্রহসহকারে সহস্র ভীতি-প্রদর্শন করিয়াও বল, "বাবা আগুনে হাত দিও না, হাত পুড়িয়া যাইবে।"

তুমি নিশ্চয় জানিও, "বাবা" কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করিবে না! "বাবা" যখন হউক্, যেরূপে হউক্, একবার আগুনে

হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেই দেখিবে। এবং হাত পোড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তোমাকে বলিবে, "বাবা, আগুনে আমার হাত পুড়িয়া গিয়াছে, জ্বালা করিতেছে।" তখন "বাবার" কথা শুনিয়া এবং দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার মনে যুগপৎ কতগুলি ভাবের উদয় হইবে, বুঝিয়া দেখ দেখি। তুমি যদি ক্রুদ্ধ-স্বভাব অর্থাৎ তমোগুণে মোহান্ধ হও, তবে তখনই সেই অগ্নিদগ্ধ রোরুদ্যমান পুত্রকে প্রহার বা তাড়না করিবে। পুত্র কিন্তু তোমার প্রহার বা তাড়নার বিন্দুমাত্র কারণও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। তোমাকে বাঘভালুকের মত শত্রু বলিয়াই জ্ঞান করিবে। এবং তুমি চিরকালই পুত্রের অযোগ্য পিতা বা পিতৃনামের অযোগ্য থাকিবে। পুত্র চিরদিন তোমার বিপক্ষ হইয়া তোমার শত্রুতাচরণ করিবে। তুমি তখন ইহার কারণ বুঝিবে না, জগৎ ইহার কারণ বুঝিবে না। আর যদি তুমি শান্ত-স্বভাব হও, অর্থাৎ সত্ত্বরাজসিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট হও, তাহা হইলে তুমি বলিবে, "বাবা, আগুনে হাত দিলে ত হাত পুড়িবেই, এ কথা ত আমি তোমাকে পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। এস, আমি ঔষধ দিয়া হাতের জ্বালা সারাইয়া দিতেছি, কিন্তু সাবধান, আর যেন কখনও আগুনে হাত দিও না। আবার যদি আগুনে হাত দাও, তবে তখন আর ঔষধ দিলেও জ্বালা সারিবে না। সারাদিন ধরিয়া কেবল হাতের জ্বালায় কাঁদিতে হইবে।"

এই বলিয়া তুমি যথোচিত আদর ও যত্ন করিয়া পুত্রের জ্বালা নিবারণ করিবে। পুত্র তখন সহজেই বুঝিবে যে,

"বাবার কথা না শুনিয়া আমি যথার্থই কুকাজ করিয়াছি। আর এমন কাজ করিব না। বাবার কথাই ঠিক্। বাবা মিথ্যা কথা বলেন নাই। আমি কষ্ট পাইয়া কাঁদিলেই বাবাও কষ্ট পান। এখন হইতে বাবা যা বলিবেন, আমি তাই করিব।" পুত্রের মনে উক্তরূপ সঙ্কল্প সহজেই জন্মিবে। কিন্তু তাহার সকল সময় সঙ্কল্প স্মরণ থাকিবে না। সেই জন্যই সে পুনঃ পুনঃ তোমার বিস্তর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কষ্ট পাইবে। কিন্তু প্রত্যেক বার কষ্ট পাইয়াও সে শিক্ষালাভ করিবে এবং যতই শিক্ষা পাইবে, ততই তাহার কষ্টের লাঘব হইবে।

অতএব তুমি যে তোমার পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা, তোমার পুত্রের মনে এই বিশ্বাসটুকু জন্মাইতেই চেষ্টা করিবে। অধিক নীতি উপদেশ দিতে চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। যদি তোমার কথায় তোমার পুত্রের বিশ্বাস জন্মে, তবে তুমি পুত্রকে সহজেই শিক্ষা দিতে পারিবে। এই শিক্ষা দিয়াও তুমি পুত্রের নিকটই বিস্তর শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। তুমি পিতৃ-বাক্যের মহিমা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। "ঋষিবাক্য" এই পিতৃবাক্য হইতে স্বতন্ত্র নহে। তুমি যদি পুত্রহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পুত্রকে ঠিক্ শিক্ষা দিতে পার, তাহা হইলে পুত্র অপেক্ষা তুমি যে কত নীচ ও অধম, তাহাও হৃদয়ঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে।

তুমি পুত্রকে একবার বা দুইবার অথবা তিনবার নিষেধ করিলেই কোন একটা গর্হিত কাজ হইতে পুত্র যখন

নিবৃত্ত হইবে, তখন তুমি মনে করিও যে, শতবার, সহস্র-বার, লক্ষবার বলিলেও আমি ঋষিবাক্য গ্রাহ্য করি নাই। এবং তজ্জন্য আমি অনন্ত যাতনা ভোগ করিয়াও কিছুমাত্র শিক্ষা পাই নাই। অতএব আমি আমার পুত্র অপেক্ষা শতগুণে যে নিকৃষ্ট তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুত্রের নিকট এইরূপে ঋষিবাক্যের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে বলিয়াই আমি তোমাকে বলিতেছি যে, পুত্রকে শিক্ষা দিয়া তুমি তাহার নিকট শিক্ষালাভ কর। তুমি এখন অহিংসা মহাব্রতের মাহাত্ম্য কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না। কেননা শত সহস্র হিংসা করিয়া তোমার মন হিংসাপাপে অভ্যস্ত হইয়াছে, হিংসাজনিত প্রতিহিংসা সহ্য করিতেও অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি সহস্রবার প্রতিহিংসার অসহ্য অনলে দগ্ধ হইয়াও, অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াও, হিংসারূপ অগ্নিকে চিনিতে পার নাই। যদি এখন তুমি হিংসাকে চিনিতে চাও, যদি অহিংসার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তবে তোমার দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তানকে শিক্ষা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ এবং সেই শিশু পুত্রের নিকটই অহিংসার প্রভাব দেখিয়া শিক্ষা কর।

বালকের চিত্তই যোগশিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র।

যে চিত্তক্ষেত্র সন্দেহ, সংশয় বা অবিশ্বাসরূপ ক্ষার দ্বারা উষরতাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাই যোগসাধনের প্রশস্ত বা উর্ব্বর-ক্ষেত্র।

পিতা যদি সত্ত্বগুণসম্পন্ন উপযুক্ত শিক্ষক হন, তাহা হইলে তিনি পুত্রকে অনায়াসেই দেবতা করিতে পারেন।

পিতামাতার গুণ সহজেই পুত্রের হৃদয়ে সংক্রামিত হয় বলিয়া পুত্রও প্রায় পিতামাতার মিশ্রগুণ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা সুকৃতিশালী, তাঁহারা জন্মান্তরে সত্ত্বগুণান্বিত মাতাপিতাই প্রাপ্ত হন। যাহা হউক সে সকল দুর্ব্বোধ বিষয়ের আলোচনা এখন থাক। তুমি যেরূপ গুণবিশিষ্ট হও, পুত্রকে তুমি স্বভাবতই ভালবাসিতে বাধ্য। পুত্রের হিত এবং পুত্রের উন্নতি তোমার একান্ত প্রার্থনীয়। তজ্জন্যই বলিতেছি যে, তুমি স্বয়ং সাবধান থাকিয়া পুত্রকে যোগ শিক্ষা দাও। সাবধান থাকিতে বলিতেছি এই জন্য যে, যেন তোমার পুত্র তোমার উদাহরণ দেখিয়া যোগের প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত না হয়।

কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ কোন প্রাণীর প্রাণে আঘাত করিও না। মনুষ্যের ত কথাই নাই, সামান্য ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গেরও প্রাণকে স্বীয় প্রাণের ন্যায় অথবা স্বীয় পুত্রের প্রাণের ন্যায় দেখিতে অভ্যাস কর। পুত্রকেও তদ্রূপ করিতে শিক্ষা দাও। তাহা হইলে তুমি স্বয়ং শত শত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশ হইতে সহজেই উদ্ধার পাইবে, তজ্জন্য তোমার চিত্ত উদ্বেগ-রহিত ও একাগ্র বা সমাহিত হইবে। তোমার পুত্রও সহস্র সহস্র বিপদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে। পরে তুমিই প্রত্যক্ষ দেখিবে যে, তোমার পুত্রের ঔরসে এমন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি স্বভাবতঃ ক্রুর সর্পের সহিত সহাস্যবদনে ক্রীড়া করিতেছেন। তাহা হইলেই তুমি ঋষিবাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাইবে! তখন,—

অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

এই বাক্যের স্বার্থকতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইবে। হায়! এমন দিন পৃথিবীতে কবে আসিবে, যে দিন ঋষিবাক্যে লোকের সন্দেহ উপস্থিত হইবে না! *

হিংসা পাপের অপকারিতা এবং অহিংসার উপকারিতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সহজেই হিংসার প্রতি ঘৃণা এবং অহিংসার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। কিন্তু এই পুস্তকে তাহা সবিস্তর বর্ণনা করিবার অবকাশ নাই। পুস্তকান্তরে প্রকাশিত হইবে। তথাপি এখানে অহিংসা প্রভৃতির ভাব কিরূপ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক; নতুবা অনেক প্রকার বিতর্ক বা সন্দেহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য এস্থলে অতি সঙ্ক্ষেপে আরও কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

অহিংসা-বিবৃতি ও শাস্ত্রসমন্বয়।

কোন প্রাণীর প্রাণে আঘাত করিলেই যে হিংসা করা হয়, তাহা নহে। যে হিংসায় প্রতিহিংসার উদ্রেক হয়, তাহাই প্রকৃত হিংসা। যাহাতে প্রতিহিংসার উদ্রেক হয় না,

---

* অধিক দিনের কথা নহে, দাক্ষিণাত্য দেশে এক ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষীয় শিশু সন্তান ভীষণ সর্প লইয়া ক্রীড়া করিতেন। শিশুকে সকলেই শিবের অবতার বলিয়া মনে করিয়াছিল। দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে শিশু বাল্যকালেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মিরার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রে এই সংবাদটী প্রচারিত হইয়াছিল।

তদ্রূপ আঘাতকে হিংসা বলে না ; তাহাকে সামান্য আঘাত বলাই সঙ্গত। মনে কর, তোমার পুত্রের অঙ্গে একটী ফোড়া হইয়াছে ; তাহা ডাক্তার ডাকিয়া কাটিয়া দেওয়া উচিত ; নতুবা শেষে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে ! তুমি ডাক্তার ডাকিয়া পুত্রের সেই ফোড়া কাটাইলে। তাহাতে পুত্রের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু সেই আঘাত হিংসা বলিয়া গণ্য নহে। এই আঘাতের জন্য তোমার এবং সহৃদয় ডাক্তারেরও প্রাণে প্রতিঘাত লাগিবে বটে, কিন্তু তুমি বা ডাক্তার কেহই পুত্রের প্রতিহিংসার ভাজন হইবে না। বরং কৃতজ্ঞতার ভাজন বা ভক্তির ভাজন হইবে।

সিংহের পায়ে কাঁটা ফুটিয়া যাওয়াতে সিংহ অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিতেছিল। একজন লোক সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিল। কাঁটা বাহির করিবার সময় অবশ্য সিংহ অত্যন্ত যাতনা পাইল ; কিন্তু তথাপি সিংহ কৃতজ্ঞচিত্তে উপকারীর পদলেহন করিতে লাগিল ! অতএব এরূপ স্থলে প্রাণে আঘাত দিলেও হিংসা করা হয় না।

অতএব অন্তঃকরণের ভাব বুঝিয়াই হিংসা বা অহিংসার ভাব বুঝিতে হইবে। হিতৈষী পিতা পুত্রের হিংসা করিতে পারেন না। সর্ব্বজীবের পিতৃকল্প পরম কারুণিক শাস্ত্রকারগণ যে যজ্ঞে পশুবধের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কেবল পশুদিগের ও যজমানের আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে। ইহাতেও শাস্ত্রকারগণের পক্ষে হিংসা-পাপের অনুমোদন করা হয় নাই। এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে হিংসাপাপে

লিপ্ত হইতেও হয় নাই। কিন্তু যজমানের ইহা অতীব সঙ্কট পরীক্ষা। যজমান যদি অন্তঃকরণে পশুমাংস ভোজনের লালসা করিয়া যজ্ঞার্থেও পশুবধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব সাধারণ জনগণের পক্ষে এ ব্যবস্থা সাঙ্ঘাতিক ব্যবস্থা। কিন্তু সাঙ্ঘাতিক ব্যবস্থা হইলেও শাস্ত্রকারগণের তজ্জন্য পাপস্পর্শও হয় না। কেননা, যাহারা প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনায় জীবহিংসা করিবেই করিবে, তাহাদেরও যদি সেই প্রবল হিংসাকে কিয়ৎপরিমাণেও প্রশমিত করা যায়, তাহাতেও লাভ আছে, এইরূপ মনে করিয়াই শাস্ত্রকারগণ উক্তরূপ সাঙ্ঘাতিক ব্যবস্থারও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শাস্ত্রকারগণ কেবল সত্বগুণ-প্রধান শিষ্যদিগের জন্যই শাস্ত্রপ্রণয়ন করেন নাই। তাহা করিলে এতদিন পৃথিবীতে শাস্ত্রের নাম-গন্ধও থাকিত না; সমস্ত ভস্মীভূত বা সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইত। পশ্চাল্লিখিত উদাহরণ দ্বারাই একথা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংহিতাকার ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন ;—

নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ ॥

* * * *

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ।

প্রাণিহিংসা না করিলে মাংস প্রায় উৎপন্ন হয় না; কিন্তু প্রাণিবধও অস্বর্গ্য অর্থাৎ নরকের হেতু। অতএব মাংস-ভোজন বর্জ্জন করিবেক। শুক্রশোণিত-সংযোগে মাংসের উৎপত্তি; সুতরাং মাংস অতীব ঘৃণার্হ বস্তু; বিশেষতঃ বধবন্ধনাদি অতি নিষ্ঠুর হৃদয়ের কার্য্য, সেই নিষ্ঠুরতা ব্যতীত মাংসের প্রাপ্তি হয় না; এই সকল বিচার করিয়া সর্ব্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি প্রাণিবধ করিতে অনুমতি দেয় বা অনুমোদন করে, যে প্রাণিবধ করে, যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা প্রাণি-দেহ ছেদন করে, যে মাংস বিক্রয় করে এবং যে ক্রয় করে, যে মাংস পাক করে, যে পক্ব মাংস পরিবেশন করে এবং যে তাহা ভোজন করে, তাহাদের সকলেই ঘাতক বা হিংস্রক। এই সকল ব্যবস্থা লিখিয়াই নিখিল মানবের পিতৃস্থানীয় ভগবান্ মনু যখন চিন্তা করিলেন, আমার এই ব্যবস্থা আমার কয়জন সন্তান প্রতিপালন করিবে? প্রবৃত্তির উত্তেজনা নিবারণ করিয়া কয় জন পিতৃ-আজ্ঞা পালনে সমর্থ হইবে? আমার তামসিক সন্তানগণ যদি এ ব্যবস্থা পালন করিতে না পারে, তবে তাহাদের দোষই বা কি? প্রকৃতির দোষে—প্রবৃত্তির দোষে যদি তাহারা মাংসভক্ষণ করে, তাহা হইলেই বা তাহাদিগকে দোষ দিব কি বলিয়া? এই সকল চিন্তা করিয়াই ভগবান্ লিখিলেন;—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে,
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

মাংস-ভক্ষণে, মদ্যপানে এবং মৈথুনে দোষ কি? যখন

এই সকল বিষয়ে প্রাণিগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহাতে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু বলিতে পারি, এই সকল হইতে নিবৃত্ত হইলে মহাফল লাভ করা যায়।

এখন ভগবান্ মনুর হৃদয় পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝ। এবং এই মনুবাক্য অনুসারে সাক্ষাৎ শিবতুল্য যে সকল মহাযোগী অতি অদ্ভুত কৌশলে তন্ত্রে পঞ্চ-মকারের ব্যবস্থা বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মাহাত্ম্য একবার হৃদয়-ঙ্গম কর।

অধিক আর কি বলিব, যে কোন মহাত্মা আপনাকে সাধারণ জনগণের পিতৃস্থানীয় মনে করিয়া যে কোন শাস্ত্রে যে কোন ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই দোষস্পর্শশূন্য এবং পাপশূন্য মনে করিবে। অতএব কি বেদ, কি দর্শন, কি সংহিতা, কি তন্ত্র, কি পুরাণ, কি বাইবেল, কি কোরাণ, জগতে কোন শাস্ত্রই অগ্রাহ্য বা ঘৃণার্হ নহে। তবে একটী চিরপ্রচলিত চির-প্রসিদ্ধ প্রবচন আছে যে,—

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

মুনিদিগেরও মতিভ্রম হয়। এ কথাও যথার্থ। কিন্তু ভ্রম হইলেই যে মহাদোষ হয়, তাহা নহে। পূর্ণ স্মরণশক্তির কিঞ্চিৎ অভাব হইলেই বা বিশেষ হানি কি? মনেকর; তোমার কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজন। তোমার পথ-দর্শক যদি তোমাকে ঠিক্ সোজা পথে না আনিয়া কিঞ্চিৎ

বক্রপথেও কলিকাতায় আনিয়া উপস্থিত করেন, তাহাতে তোমার বিশেষ হানি কি ? তুমি তজ্জন্য পথদর্শকের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে পার না। পুনঃ, হয়তঃ তোমার পথদর্শকেরও ইহাতে কিছুমাত্রও বিস্মৃতি বা ভ্রান্তি নাই ; কেবল তোমার সুবিধার জন্যই তিনি তোমাকে বক্রপথে আনিয়াছেন। তুমি হয়ত সোজাপথে চলিতে সমর্থ নও, এই বিবেচনা করিয়াই যেন তিনি ভ্রমক্রমে বক্রপথ অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব তুমি পথপ্রদর্শককে ভ্রান্ত বলিয়া কখনও ঘৃণা প্রকাশ করিও না। যদি সোজা পথে চলিবার জন্য তোমার শক্তিসামর্থ্য থাকে, তবে তুমি অভ্রান্ত পথদর্শকও পাইতে পার। এ জগতে অভ্রান্ত পথদর্শক কে ?

অভ্রান্তঃ কেবলঃ শিবঃ।

একমাত্র শিব অর্থাৎ মঙ্গল-স্বরূপ সমাহিত মহাযোগী বা ঋষিই অভ্রান্ত। সমাহিত মহাযোগীর বাক্যই অভ্রান্ত। সমাহিত মহাযোগীই শিবশব্দবাচ্য এবং সমাহিত মহাযোগীই ঋষিশব্দবাচ্য। এই ঋষি বা শিবই গুরুপদবাচ্য। অতএব গুরুবাক্যই সনাতন সত্যস্বরূপ। পিতৃবাক্য অপেক্ষাও এই গুরুবাক্য গুরুতর। মুনিগণ পিতৃস্থানীয়, তাঁহাদের ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ঋষিবাক্যে বা গুরুবাক্যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। মুনি এবং ঋষিতে প্রভেদ কি ? মুনি যখন সমাধিস্থ হন বা সমাহিত হন, তখনই তিনি ঋষিপদবাচ্য হইয়া থাকেন। অন্য সময় তিনি মুনিপদবাচ্য। ভগবান্ পরম ঋষি বলিয়াছেন ;—

তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা।

সমাহিত অবস্থায় প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানালোক ঋতম্ভরা অর্থাৎ সত্যপূর্ণ হয়। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকে সমাধি-প্রজ্ঞাও বলে। এই সমাহিত অবস্থায় ঋষির চিত্তে যাহা উদিত হয় বা অনুভূত হয়, তাহা সত্যপূর্ণ বা তাহাই সত্যস্বরূপ। অতএব একটী ঋষিবাক্যের তুলনায়, সমগ্র বেদ, দর্শন, সংহিতা, স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণাদিও লঘু হইয়া থাকে। কারণ বেদপুরাণাদির মধ্যে সমস্তই ঋষিবাক্য নহে; তন্মধ্যে মুনিবাক্যও বিস্তর আছে। তজ্জন্যই তন্মধ্যে বিস্তর ঋষি-বাক্য থাকিলেও একটী গুরুবাক্যের তুলনায় সে সমস্তই লঘুবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহার কারণ হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর নহে;—

যথা তুম্বফলালম্বী লৌহোঽপি প্লবতে জলে।

লঘুসঙ্গে থাকিলে গুরু দ্রব্যও যেন লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন তুম্বফলালম্বী লৌহও জলে ভাসিয়া থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র লৌহখণ্ড গুরুত্ববশতঃ জলে নিমগ্ন হয়। অতএব স্বতন্ত্র এক একটী ঋষিবাক্যের বা গুরুবাক্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম কর।

যদি বল, মুনিবাক্য হইতে ঋষিবাক্যের প্রভেদ কিরূপে বুঝিব? এই প্রশ্নের অন্যবিধ উত্তর অসঙ্গত, কেবল "স্বয়ং সমাহিত হইয়া বুঝ" এইমাত্র উত্তরই সঙ্গত। স্বয়ং মনোযোগী হও।—স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন কর।

তাহা হইলেই অন্য বাক্য হইতে ঋষিবাক্য স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারিবে।

অতঃপর যোগসাধনসম্বন্ধে এখনও অনেক বক্তব্য আছে, কিন্তু সে সমস্ত আর বিস্তৃতরূপে বলিবার অবসর হইবে না, তজ্জন্য সঙ্ক্ষেপেই বলিতে হইবে। অতএব মনোযোগ দিয়া শুন ;—

অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের কেবল প্রথমাঙ্গ যমসাধনের প্রথমাংশমাত্র অর্থাৎ অহিংসাসাধন কিঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে ; অতএব তৎসম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই। এক্ষণে যম-সাধনের অপর চারিটী অংশ অর্থাৎ সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে, শুন ;—

সত্যসাধন।

কায়মনোবাক্যে অসত্য পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে যে কোন বিপদ্ আসিতে হয় আসুক্, যত কষ্ট সহ্য করিতে হয় করিবে। সত্যের ফল যখন অনন্ত ও অমূল্য, তখন তৎসাধনের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করাও অতি তুচ্ছ কথা, অন্য স্বার্থের কথা আর কি বলিব ? সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বার্থ যখন আর কিছুই নাই, তখন সেই পরমার্থ-সাধনের জন্য সামান্য নীচ বা জঘন্য স্বার্থ অম্লানবদনে, অক্ষুন্নচিত্তে পরিত্যাগ করিবে।

সত্যের মহিমা সর্ব্বদা অনুধ্যান করিবে। যাহাতে সত্যের মহিমা বর্ণিত আছে, তাহা অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে। সত্যের মহিমা অনেক গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল, যথা ;—

রামায়ণে সত্যের মহিমা এইরূপ লিখিত আছে ;—

আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো জনাঃ।
সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্ ॥
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেবহি মেনিরে।
সত্যবাদীহি লোকেঽস্মিন্ পরঙ্গচ্ছতি চাক্ষয়ম্ ॥
ধর্ম্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্ব্বস্য চোচ্যতে।
সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্ম্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্ব্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥
দত্ত মিষ্টং হুতঞ্চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানা স্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলেন। সত্যই প্রণব-স্বরূপ ব্রহ্ম, সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্যই অক্ষয় বেদ-স্বরূপ, সত্যই পরমার্থ লাভের উপায়স্বরূপ। ঋষি ও দেবগণ একমাত্র সত্যকেই মান্য করেন। ইহলোকে যিনি সত্যবাদী, তিনিই অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। জগতে সত্য-প্রধান ধর্ম্মই সকলের মূলস্বরূপ, সত্যই ঈশ্বর ; ধর্ম্ম সত্যেরই আশ্রিত।

যে বেদে দান, যজ্ঞ, হোম, তপস্যাদির বিধান আছে, সেই বেদ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব সত্যই সকলের মূল। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।

মহাভারতে সত্যের মহিমা এইরূপ লিখিত আছে, যথা ;—

বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরম্ ॥

অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বা স্যান্নবা সমম্ ॥
নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥

অর্থাৎ শতকূপ অপেক্ষা একটী পুষ্করিণী শ্রেষ্ঠ; শত পুষ্করিণী অপেক্ষা একটী যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; শত যজ্ঞ অপেক্ষা একটী পুত্র শ্রেষ্ঠ; কিন্তু শত পুত্র অপেক্ষাও সত্য শ্রেষ্ঠ।

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিতও তুলনা করিলে সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়।

সমস্ত বেদের অধ্যয়ন এবং সমস্ত তীর্থে অবগাহন অপেক্ষাও বোধ করি সত্যের ফল অধিক।

সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। এ জগতে মিথ্যা অপেক্ষা ভীষণ বা ক্লেশকর আর কিছুই নাই।

তন্ত্রে সত্য-মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—

সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যধর্ম্ম-পরায়ণাঃ।
কুলসাধন-সত্যা যে নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥
প্রকটেঽত্র কলৌ দেবি! সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ ॥
সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে!
নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপ মনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥

সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থ মূষরে বপনং যথা॥
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি॥
অতএব ময়া প্রোক্তং দুষ্কৃতে প্রবলে কলৌ।
কুলাচারোঽপি সত্যেন কর্ত্তব্যো ব্যক্ত-ভাবতঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা সত্যরূপ মহাব্রত পালন করেন, সত্যে যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সত্যই যাঁহাদের পরম আশ্রয়, কুলসাধনকে যাঁহারা সত্যধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, কলি (অধর্ম্ম) তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে পারে না।

হে দেবি! জগতে কলি প্রবল হইলে সকল ধর্ম্মই দুর্ব্বল হইবে। কেবল একমাত্র সত্যই স্থির থাকিবে। অতএব সত্যময় হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। অয়ি সুব্রতে! তুমি ইহা সত্য জানিও যে, মনুষ্য সত্যরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে কোন কাজ করে, তাহাতেই সে সফলতা লাভ করে।

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই; এবং মিথ্যা অপেক্ষাও পাপ আর নাই। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। মরুক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন বৃথা হয়, তেমনই সত্যহীন পূজা, জপ ও তপঃ সকলই বৃথা হয়।

সত্যই পরম ব্রহ্মস্বরূপ, সত্যই পরম তপস্যা, সমস্ত সুকৃতিই সত্যমূলক, অতএব সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।

অতএব পাপপূর্ণ কলি প্রবল হইলেও সত্য-অনুসরণ

করিয়া (বা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই) আমার কথিত কুলাচারও প্রকাশ্যভাবে কর্ত্তব্য।

মনুসংহিতায় আছে ;—

সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি॥

অর্থাৎ সত্যরূপ ধর্ম্মে আর্য্যোচিত আচরণে এবং শৌচে অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিতে রত থাকিবেক। জল দ্বারা বাহ্য শরীর শোধিত হয়, সত্য দ্বারাই অন্তঃকরণ পবিত্র হয়।

ফলতঃ আর্য্যধর্ম্মের যে কোন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিবে, তাহাতেই সত্যের মাহাত্ম্য বর্ণিত দেখিতে পাইবে। অতএব এস্থানে আর অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

জগতে এই একটী বিচিত্র রহস্য দেখা যায় যে, যাহারা অহিংসারূপ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জানে না, তাহারাও সত্যের মাহাত্ম্য জানে। অর্থাৎ অনেক অসভ্য বন্যজাতি হিংসা-পরায়ণ হইলেও সত্য-পরায়ণ হইয়া থাকে। অতএব সত্যের মহিমা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এমন মহিমান্বিত সত্যকেও যাহারা পরিত্যাগ করে, তাহাদের অপেক্ষা ঘোর মূর্খ জগতে আর কে আছে? তাহাদের অপেক্ষা হতভাগ্য, পাপী এবং দুঃখী জগতে আর কে আছে? ফলতঃ,

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

এই গুরুবাক্য অমোঘ এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত।

আর্য্যশাস্ত্রে অনন্ত কাল-প্রবাহ যে চারি যুগে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সত্যযুগই সর্ব্ব প্রধান।

আর্য্যশাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ড যে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত হইয়াছে, সত্যলোক তাহার সর্ব্বোপরি স্থিত।

অতএব সত্যের মহিমা আর অধিক কি বলিব? পূর্ব্বে যে ঋষিবাক্য বা গুরুবাক্যের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সত্য বলিয়াই তদ্রূপ মহিমান্বিত। অতএব যাহা সত্য, তাহাই ঋষিবাক্য বা গুরুবাক্য, একথাও বলা যায়। ফলতঃ গুরুবাক্যের মহিমা হইতে সত্যের মহিমা অভিন্ন জানিবে।

সত্যের মহিমা যেমন অনুধ্যান করা কর্ত্তব্য, তেমনই মিথ্যারও নীচতা ও অপকারিতা অনুধ্যান করা কর্ত্তব্য। মিথ্যাপাপ অত্যন্ত নীচ। কেহই মিথ্যা চাহে না; ঘোর মিথ্যাবাদীও স্বয়ং মিথ্যাকথা শুনিতে চায় না, সত্যই শুনিতে চায়। কিন্তু মিথ্যাবাদী দুইটী ভীষণ বিপদ্ ভোগ করে, এবং তজ্জন্য তাহার চিত্ত নিয়ত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল থাকে। প্রথম বিপদ্ যে, কেহই তাহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, এমন কি সত্য কথা বলিলেও তাহা মিথ্যা বলিয়াই লোকে মনে করে। দ্বিতীয় বিপদ্ যে, মিথ্যাবাদী অন্যের কোন কথাই বিশ্বাস করিতে পারে না; সে সত্য চাহিলেও তাহার মনে হয়, কেহই সত্যবাদী নহে; সকলেই তাহার সহিত মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকে। অতএব বুঝিয়া দেখ, সংসারে এই দুই বিপদ্ কি ভীষণ উদ্বেগ ও যন্ত্রণার কারণ। মিথ্যাবাদী একটী মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কত শত মিথ্যাই বলিয়া থাকে। সুতরাং তাহার পাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যায় এবং তখন লোকে সহজেই তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিয়া রাখে এবং

তাহাকে নিতান্ত পামর ও পাপাত্মা বলিয়াই ঘৃণা করে। যে ব্যক্তি সংসারে বিশ্বাস হারাইয়া থাকে, সে নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও করুণার্হ জীব। তাহার মনের শান্তি চিরদিনের জন্যই নষ্ট হয়। সে স্বীয় পাপের গুরুভারে সংসারে যেন দুরুত্তীর্ণ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া নিরাশপ্রাণে সর্ব্বদাই দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করে। এমন হতভাগ্য জীব জগতে আর আছে কি ? মিথ্যাপঙ্কে নিমজ্জিত মিথ্যাবাদী এতই পাপাত্মা যে, স্বয়ং সত্যও তাহাকে সহজে উদ্ধার করিতে পারেন না।

যে বিশ্বাস-ঘাতকতার তুল্য পাপ দ্বিতীয় নাই বলিয়া প্রথিত, মিথ্যাবাদীই প্রকৃত সেই বিশ্বাসঘাতক। ইহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। শত শত উদাহরণ দেখিয়া মিথ্যাপাপের ভীষণ অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম কর। ফলতঃ এরূপ সর্ব্বস্বার্থবিনাশিনী মিথ্যার আশ্রয় কখনও গ্রহণ করিও না।

সত্যই জগতের প্রাণস্বরূপ। সত্যই বিশ্বের আত্ম-স্বরূপ। সত্য স্বয়ং সুরক্ষিত। সত্য স্বতঃপ্রমাণিত, স্বতঃ-সিদ্ধ। সত্যের সাহায্যের জন্য কদাপি মিথ্যার সহায়তা আবশ্যক হয় না। সত্যই ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মরক্ষার জন্যও মিথ্যার সহায়তা গ্রহণ করিও না। সত্য তোমার অতি সন্নিহিত বন্ধু। অতি ঘোর অন্ধকারেও সত্য জ্যোতিঃস্বরূপ। আর অধিক কি বলিব, এ ব্রহ্মাণ্ডে এক-মাত্র সত্যই সনাতন-স্বরূপে চির-বিদ্যমান থাকিবে, আর কিছুই থাকিবে না। অতএব নিয়ত সত্যে আশ্রিত থাকিবে। তাহা হইলেই যোগসাধনে তোমার সামর্থ্য

জন্মিবে, চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে, মন সহজেই একাগ্র বা সমাহিত হইবে।

সত্যের আশ্রয় ব্যতীত কি ব্যবসায় কার্য্য, কি রাজ-কার্য্য কিছুই সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে না। "আমি এই কাজ করিব" অথবা "আমি তোমাকে অমুক স্থানে বা অমুক সময়ে এই বস্তু দিব" এতদ্রূপ বাক্যকে অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা বলে। এই প্রতিজ্ঞার নামান্তর সত্য। অতএব সত্যপালনার্থ প্রতিজ্ঞাপালন নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই প্রতিজ্ঞাপালন না করিলে বণিকেরও সর্ব্ব-নাশ হইতে পারে, রাজারও রাজ্যনাশ হইতে পারে এবং ব্রাহ্মণেরও ধর্ম্মনাশ হইতে পারে। অতএব কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে এই দৈববাণী বা গুরুবাক্য নিয়ত স্মরণ রাখিবে, যথা ;—

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।

হিমাদ্রি একদিন সামান্য বায়ুবেগে উৎপাটিত হইয়া সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সত্যস্বরূপ উক্ত ঋষি-বাক্য কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। অতএব কি ইহলোক কি পরলোক সত্যই সর্ব্বত্র পরমার্থপ্রদ।

পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে। পূর্ব্বকালে তপস্বীরা কাহাকেও অভিশাপ বা বর প্রদান করিবার সময় বলিতেন, "আমি পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যা বাক্য বলি নাই, অতএব আমার বাক্য কখনও ব্যর্থ হইবে না।" ইহাতেও সত্যের মহিমা প্রকটিত হইতেছে। অতএব এমন মহিমান্বিত সত্যকে প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিও না।

মৌনব্রত।

অধিক বাক্য বলিলে প্রায়ই মিথ্যা বা বৃথা বাক্য বলিতে হয়, এবং বাচিক বিস্তর পাপে লিপ্ত হইতে হয়। তজ্জন্য কার্য্যক্ষেত্রে যথাসম্ভব অল্প বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মৌনাবলম্বন করিলে অনেক সময় মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং মনেরও শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই জন্যই পূর্ব্বকালে মুনিরা অর্থাৎ যোগশিক্ষার্থীরা মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন। ফলতঃ বাগিন্দ্রিয়ের দমন অত্যন্ত শুভফলপ্রদ। যাঁহারা মৌনব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অধিক বাক্য বলিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি উভয়ই নষ্ট হয়; তাহাতে প্রধানতঃ দুইটী মহৎ ফল লাভ হয়। প্রথমতঃ মনের বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয়তঃ নীচসংসর্গ বা পাপসংসর্গ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সাংসারিক তমোগুণান্বিত ব্যক্তিরা পরনিন্দা করিতে এবং শুনিতে বড়ই ভালবাসে; ইহা তাহাদের যেন একটা প্রধান আরাম বা আমোদ। কিন্তু যাঁহারা মৌনাবলম্বী, তাঁহারা পরনিন্দা করেন না; এবং শুনিতে ইচ্ছাও করেন না; আর শুনিলেও তাহাতে উপেক্ষা করেন; কখনই অনু-মোদন করেন না। এই কারণেই মৌনাবলম্বীর সহিত সাধারণ নীচ ব্যক্তিরা মিশিতে চায় না। যেখানে আমোদ নাই, সেখানে তাহারা যাইতে চায় না।

অতএব যমসাধনের জন্য যথাসম্ভব মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া পাপ এবং পাপসংসর্গ ত্যাগ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

সমস্ত পাপই মানসিক বা মনোভব। কিন্তু সাধনার সুবিধার জন্যই যোগীরা সমস্ত পাপকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সমস্ত পাপেরই প্রধান নিয়ন্তা মন বা চিত্ত, তথাপি কায়িক পাপের প্রধান সাধন হস্ত এবং বাচিক পাপের প্রধান বা একমাত্র সাধন জিহ্বা। মনকে দমন করিবার জন্য স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদবেদান্তসম্ভূত জ্ঞান আবশ্যক। এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে মন, হস্ত ও জিহ্বা সকলই দমিত হয় বটে কিন্তু স্বাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত সহজ কথা নহে জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কারবশে মন একটু অসতর্ক হইলেই, হস্ত এবং জিহ্বা পাপ করিয়া বসে। সেই জন্যই বেদবেদান্তপারগ সাধক, মনোনিগ্রহের নিমিত্ত অগ্রে মনের দুইটী প্রধান সাধন অর্থাৎ হস্ত এবং জিহ্বাকে নিগৃহীত করেন। সেই জন্যই অনেক সাধক মৌনাবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকেন। ঊর্দ্ধবাহু মুনিগণের যোগের উদ্দেশ্য ও যুক্তি বুঝিয়া দেখ। কাহাকেও অজ্ঞান বা মূর্খ মনে করিয়া উপহাস করিও না। যাহা হউক্, তোমাকে আমি ঊর্দ্ধবাহু হইবার জন্য উপদেশ দিতেছি না। যাঁহারা শরীরকে তৃণকাষ্ঠবৎ অকিঞ্চিৎকর মনে করেন, যাঁহারা সৎকার্য্য এবং অসৎকার্য্য উভয়কেই হেয় জ্ঞান করেন, যাঁহারা স্বর্গসুখেও বীতরাগ, সেই পরমহংসের সাধনা তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে। তুমি স্বর্গের জন্য, স্বর্গীয় সুখের জন্য লালায়িত, অতএব তোমার পক্ষে তদুপযুক্ত সাধনই কর্ত্তব্য।

তোমাকে চিরমৌনী হইতে বলিতেছি না। জিহ্বাকে

নিগ্রহ করিয়া তাহাকে এককালে অকর্ম্মণ্য করিতেও বলিতেছি না; কিন্তু যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য তাহাকে দমন করিতে বলিতেছি। ইহাতে তুমি স্বর্গীয় সুখেরই অধিকারী হইতে পারিবে।

মৌনব্রতে মনের একাগ্রতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে ইহা পরম সাধন জানিবে। অতএব তর্ক-প্রবৃত্তি ও বাচালতা একেকালে পরিত্যাগ করিবে। শ্রদ্ধান্বিত শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট, ধর্ম্মকথা বলিবার জন্যও মৌনব্রত ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। যেখানে তমোগুণান্বিত সাধারণ মূঢ়জনের সংখ্যাই অধিক, সেখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করা অত্যন্ত অকর্ত্তব্য। যেহেতু তাহাতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা নিতান্ত হীন হয় এবং উপকারের অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অধিক হয়। ফলতঃ সাধারণ্যে বক্তৃতা করিলে নিজেরও সত্বগুণের হ্রাস এবং রজোগুণের বৃদ্ধি হয়। অতএব তদ্রূপ বক্তৃতা করিয়া খ্যাতি-লাভের চেষ্টা করিও না। এরূপ বক্তৃতা-প্রবৃত্তি যোগসাধনের অত্যন্ত অন্তরায় জানিবে। যোগসাধনে এই বক্তৃতা-শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; ইহা যোগের একটী প্রভাব বটে; কিন্তু সেই প্রভাব প্রদর্শন করিলে যোগবিঘ্ন ঘটে। অনেকে সেই শক্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া অধোগামী হইয়া পড়েন। যাহারা বক্তা বলিয়া বিখ্যাত, তাহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে অতি সামান্য যোগী। যাহারা অধুনা পৃথিবীতে প্রধান বাগ্মী বলিয়া খ্যাত, তাহারাও একজন উচ্চ যোগীর তুলনায় তৃণাদপি তৃণ।

ফলতঃ বক্তৃতা শক্তি ত যোগসাধনের সামান্য একটি তুচ্ছ ফল। যোগসাধনে যে সমস্ত অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক প্রভাব বা ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়, যোগীরা সে সমস্তও সাবধানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

তুমি যোগসাধনে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই যোগসাধনের প্রভাব সহজেই বোধ করিতে পারিবে। যাহাহউক এক্ষণে সে সকল কথায় কাজ নাই।

অস্তেয় সাধন।

চৌর্য্যত্যাগের নাম অস্তেয় সাধন। পরদ্রব্য অপহরণ করিলে বা অপহরণের ইচ্ছা করিলেও চুরি করার পাপ হয়। অতএব কায়মনোবাক্যে পরদ্রব্য অপহরণের চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে চিত্ত বহুপরিমাণে উদ্বেগ-বিহীন হইবে এবং যোগসাধনের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। পরদ্রব্য অপহরণ করিলে যে অসংখ্য উদ্বেগ আসিয়া চিত্তকে অস্থির করে, তাহার উদাহরণ আর কি দিব? তুমি লক্ষ লক্ষ প্রত্যক্ষ উদাহরণ সহজেই দেখিতে পাইবে। পরদ্রব্য গ্রহণের আত্যন্তিক অভিলাষ হইতেই মনে অলক্ষিতভাবে ঈর্ষ্যার উৎপত্তি হয়, সেই ঈর্ষ্যা মনকে নিয়ত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অসহ্য যাতনা প্রদান করে; মন তাহাতে নিয়ত অস্থির থাকে। ঈর্ষ্যা হইতে দ্বেষ ও হিংসারও উৎপত্তি হয়। অতএব অস্তেয়সাধন সম্বন্ধে আর অধিক বলা বাহুল্য। নিয়ত চিন্তা করিয়া আমার এই সংক্ষিপ্ত উক্তিগুলিকে পল্লবিত করিয়া লইবে এবং কখনও পরদ্রব্য হরণ বা হরণের অভিলাষ করিবে না।

যিনি কায়মনোবাক্যে স্তেয় বা চৌর্য্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহার অস্তেয় নামক যমসাধন প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই সাধনের প্রভাব বা ঐশ্বর্য্য স্বতঃই তাঁহাকে আশ্রয় করে।

অস্তেয়-প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।

যাঁহার পরস্বাপহরণপ্রবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, জগতের সমস্ত রত্ন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। এই বাক্যটীর দুইটী অর্থ আছে। প্রথমতঃ যাঁহার অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট জগতের সমস্ত লোকই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে স্ব স্ব সম্পত্তি ন্যস্ত রাখিতে পারে। সুতরাং সমস্ত রত্ন তাঁহার নিকট সহজেই উপস্থিত হইতে পারে। ফলতঃ লোকে যাহাকে বিশ্বাস করে, যাহাকে চোর নহে বলিয়া জানে, তাহার কাছে সর্ব্বস্ব ন্যস্ত রাখিতে পারে; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ জগতের সমস্ত রত্ন লাভ করিলে মনে যে তৃপ্তি লাভ করা যায়, অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেই তৃপ্তি লাভ করা যায়।

কোন বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য অনেক সময় অতি হেয়কেও উপাদেয়ের সহিত তুলনা করা হয়। তজ্জন্যই এস্থানে একটী অতি সামান্য বা হেয় উদাহরণ দিয়া এই বিষয়টী বুঝাইয়া দিতেছি, শুন;—

এদেশে যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আন্তরিক ঘৃণাও করে, তাহারাও গবর্ণমেণ্ট-পেপার (কোম্পানির কাগজ) ক্রয় করিবার জন্য লালায়িত হয় কেন? স্বদেশীয় কোন ব্যবসায়ীকে শতকরা ১২ বার টাকা সুদেও টাকা ধার না

দিয়া, তাহারা শতকরা ৩৷৷৹ সাড়ে তিন টাকা সুদে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিয়া থাকে কেন ? ফলতঃ এদেশের যাবতীয় ধনরত্ন ব্রিটিশ রাজভাণ্ডারে ন্যস্ত রহিয়াছে কেন ? আপাততঃ কার্য্য দেখিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কখনই আমাদের ধন অপহরণ করিবেন না। সেই বিশ্বাসের জন্যই লোকে যথাসর্ব্বস্ব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া অতি অকিঞ্চিৎকর লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া আছে।

অতএব তুমি যদি প্রকৃত বৈশ্যের উপযুক্ত ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত ধনরত্নলাভের অভিলাষ কর, তবে এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট অস্তেয়-সাধন শিক্ষা কর। ফলতঃ আমাদের ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত-প্রস্তাবে ক্ষত্রিয় রাজা নহেন। এই ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট যথার্থ বৈশ্যরাজ। বৈশ্যের উপযুক্ত যাবতীয় রাজগুণে এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভূষিত। বৈশ্যের উপযুক্ত যোগসাধন এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, অস্তেয়-প্রতিষ্ঠিত সাত্বিক যোগীর নিকট জগতের সমস্ত রত্ন উপস্থিত হইলেও তিনি তাহা প্রস্তর-লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। পরের ধন ব্যবসায় দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া বর্দ্ধিতাংশ স্বয়ং উপভোগ করা সাত্বিক যোগীর উদ্দেশ্য নহে। অধিক কি, তিনি মণিরত্নকাঞ্চনকে যোগসাধনের ভীষণ অন্তরায় মনে করিয়া তাহা স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করেন না। তবে অস্তেয়-সাধনে যোগীর লাভ কি ? লাভ আছে। পৃথিবীর সর্ব্বরত্ন উপস্থিত হইলে

সামান্য লোকে যে পরিমাণে আনন্দ উপভোগ করে, যোগীও অস্তেয়-প্রতিষ্ঠা দ্বারা সেই পরিমাণে বা তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন। এই অশেষ তৃপ্তি বা সন্তোষই অস্তেয়-সাধনের ফল। যে চিত্তে এই অশেষ সন্তোষ বিরাজিত, তাহাতে ঈর্ষ্যা বা মাৎসর্য্যের কি লেশমাত্র থাকিতে পারে? অতএব এক্ষণে অস্তেয়-সাধনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখ।

অতএব যদি স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা কর, যদি পরম সন্তোষের অধিকারী হইতে চাও, ফলতঃ যদি যোগী হইতে বাসনা কর, তবে কায়মনোবাক্যে পর-দ্রব্য গ্রহণের চেষ্টা পরিহার কর।

চৌর্য্য পাপ বৈশ্যের স্বার্থনাশক, ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা-নাশক এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনাশক। অতএব এমন ঘৃণার্হ পাপকে কদাপি মনে স্থানদান করিও না।

অধুনা এদেশে দেশভক্ত অনেক সহৃদয় ব্যক্তি, দেশের দৈন্য দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া থাকেন। তাঁহারা এদেশীয় লোকের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস দেখিয়া বিস্মিত ও কাতর হন। এদেশে জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানি গঠনের চেষ্টা নিতান্ত বিফল হয় দেখিয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সকল স্বদেশবৎসল, সহৃদয় ব্যক্তিও এই আর্য্যভূমির অধিবাসী হইয়াও আর্য্য ঋষিগণের বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত নহেন। যদি তাঁহারা ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হই-তেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কাতরতা দূরীভূত হইত,

তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইত, তাঁহাদের নৈরাশ্যের কারণ তিরোহিত হইত। সেই অমোঘ সত্যস্বরূপ ঋষি-বাক্য কি ?

অস্তেয়-প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।

তুমি যদি স্বদেশের দৈন্য দেখিয়া কাতর হও, তুমি যদি স্বদেশবাসীর অবিশ্বাস দেখিয়া বিস্মিত হও, তবে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,— সরলপ্রাণে বল-দেখি, তুমি চোর কি না ? হয়ত তুমি উত্তর করিবে, "আমি চোর নহি।" কিন্তু তোমার এ কথা ঠিক্ প্রাণের কথা নহে। তুমি হয়ত শত টাকার লোভ অনায়াসে ত্যাগ করিতে পার, সহস্র টাকার লোভও ত্যাগ করিতে পার, দশ সহস্রের লোভও পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু লক্ষ টাকার লোভ কখনই ত্যাগ করিতে পার না। সুতরাং এরূপ স্থলে তুমিও চোর ! তবে তুমি সামান্য চোর নও, লক্ষ টাকার চোর ! এইরূপ কেহ বা লক্ষ টাকার লোভও ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু দশ লক্ষ টাকার লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব সে দশ লক্ষ টাকার চোর। অথবা তুমি হয়ত আজি দশ লক্ষ টাকারও লোভ ত্যাগ করিতে পার, কিন্তু তোমার মনের কুসংস্কারবশে অসতর্ক হইয়া তুমি কল্য একটী পয়সাও চুরি করিতে পার। কল্য হয়ত একটী পয়সার লোভ ত্যাগ করাও তোমার দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতে পারে। অতএব এরূপ অসতর্ক মন লইয়া তুমি কি স্বদেশবৎসল বা স্বদেশপালক হইতে পার ? তুমি

কি এরূপ চোর চিত্তকে লইয়া স্বদেশের ধন বৃদ্ধি করিতে পার ? তুমি কি এমন চোর চিত্তকে লইয়া কখনও আপনিও আপনাকে বিশ্বাস করিতে পার ? তবে তুমি স্বদেশবাসীর অবিশ্বাস দেখিয়া বিস্মিত হও কেন ?

অতএব যদি অবিশ্বাস দূর করিতে চাও, তবে সাধনা কর। যোগী হও। এই যোগসাধন ব্যতীত দেশের দুর্গতি অন্য কোন উপায়ে দূরীভূত হইবে না। তোমার চিত্তে যখন অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই তুমি দেশের ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করিও, তখনই তুমি দেশবাসীর অবিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা করিও, তাহা হইলেই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। অসমাহিত চিত্তকে কখনও বিশ্বাস করিও না। সাধনা না করিয়া, স্পর্দ্ধার সহিত বলিও না, "আমি চোর নহি।" যে ব্যক্তি অম্লানবদনে দশ সহস্র মুদ্রার লোভ ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিও হয়ত মনের অসতর্ক অবস্থায় আধ পয়সার ঘুড়ির সূতার লোভও ত্যাগ করিতে পারেন না!! অতএব সাধনা-বিহীন মনকে কদাপি বিশ্বাস করিও না। অস্তেয়সাধনে সিদ্ধিলাভ কর, প্রকৃত যোগী হও, তাহা হইলে তোমার বক্তৃতা করিবারও প্রয়োজন হইবে না!! চুম্বক যেমন স্বতঃই লৌহকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ, তেমনিই অস্তেয়সিদ্ধ চিত্ত জগতের সকল চিত্তের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ। ভেকের ফুৎকারে হিমাদ্রি চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অমোঘ ঋষিবাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না! পারে না!!

ব্রহ্মচর্য্য সাধন।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনই যোগসাধনের সর্ব্বপ্রধান সাধন। ব্রহ্মচর্য্য সাধনেই ওজস্বিতা বা ব্রহ্মতেজঃ লাভ করা যায়। এই ব্রহ্মতেজঃ শরীরকে নীরোগ এবং মনকে প্রশান্ত করে। এতদ্দ্বারা ব্যাধিভয় ও মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়, সমগ্র ইন্দ্রিয় অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন হয়, তাহাতে মন নিয়ত আনন্দ উপভোগ করে। সঙ্ক্ষেপে যে যে কথা বলা হইল, তাহাদের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য নিম্নলিখিত কথা-গুলিতে মনোযোগ দাও ;—

যোগসাধনের জন্য বালককে অহিংসা, সত্য এবং অস্তেয় শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যেহেতু সাধারণতঃ বালকেরা অজ্ঞানতাবশতঃ হিংসা প্রভৃতি করিয়া থাকে। কিন্তু যোগসাধনের জন্য বালককে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হয় না ; কেননা **বালক স্বভাবতঃ ব্রহ্ম-চারী**। অতএব বুঝিয়া দেখ, যোগসাধনের সর্ব্বপ্রধান সাধন যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহা ভগবানের অনন্ত মহিমার জন্য আমরা সহজেই লাভ করিয়া থাকি, আমরা সহজ-ব্রহ্মচারী অথবা আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য-সিদ্ধ।

কিন্তু প্রকৃতির বিকৃতিবশে আমরা এই সহজাত পরম সম্পত্তি হারাইয়া নিতান্ত দীন দরিদ্র হইয়া পড়ি। আমরা ভগবানের কৃপায় সহজে ঘোর কঠোরতপাঃ যোগীর যোগ-সাধনের অতি দুর্লভ মহামূল্য ফলের অধিকারী হইয়াও

সেই পরম ফল হেলায় হারাইয়া ফেলি!! আমরা সহজে অমররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শীঘ্রই প্রকৃতির বিকৃতিবশে সেই অমরত্ব হারাইয়া মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকি। সুরাসুরগণের সম্মিলিত চেষ্টায় সমুদ্র-মন্থনে যে অমৃত উত্থিত হইয়াছিল, আমরা সহজে সেই অমৃত লাভ করিয়াও তাহা হেলায় হারাইয়া নিতান্ত কাঙাল—দীন—দুঃখী—দরিদ্র—অকিঞ্চন হইয়া নিয়ত কেবল যমতাড়নে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করি!! ভীষণ কালকূট আমাদের শরীর জীর্ণশীর্ণ করে! ভীষণ যমদূত-সকল আমাদের প্রত্যেক লোমকূপ নরকানলে উত্তপ্ত সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া নিয়ত যে যন্ত্রণা প্রদান করে, তাহা জগতের অদ্বিতীয় কবিও বর্ণনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ। এই নরক-যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলেও শরীর অবসন্ন হয়, হৃদয়ের শোণিত যেন শুষ্ক হইয়া যায়! সেই ভীষণ নরকানলের দৃশ্য, সেই অনলোত্তপ্ত-সূচী-হস্ত ভীষণ যমদূতগণের দৃশ্য সুদূর হইতেও দর্শন করিলে প্রাণ হু হু করে, হৃদয় স্তম্ভিত হয়, মন অবসন্ন হয়! অতএব সে দৃশ্য এখন দেখিব না। চল সহজ-ব্রহ্মচারী—সহজ-দেবতা ঐ যে শিশু স্বর্গের নন্দন-কাননে আনন্দে ক্রীড়া করিতেছেন, ঐ স্থানে গিয়া ক্ষণকাল স্বর্গের দৃশ্য দেখি!! চল, একবার ঐ সহজ ব্রহ্মচারী পরম যোগীর নিকট গিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করি।

বালক ক্রীড়া করিতেছেন। বালক যাহা কিছু দেখিতেছেন, অতি দুর্লভ মহামূল্য রত্নের ন্যায় তাহাই যত্নে গ্রহণ করিতেছেন! জগতে যে আপনাকে বড় মণিকার

বলিয়া মনে করে, সে এই বালকের নিকট আসিয়া রত্নের মূল্য অবধারণ করিতে শিখিয়া যাউক্। বালক যেরূপ আগ্রহ-সহকারে ঐ পাতাটী লইলেন, মণিকার কি তদ্রূপ আগ্রহ-সহকারে মরকত মণি গ্রহণ করে! পৃথিবীর সামান্য জহুরির কথা দূরে থাক্, ঐ যে দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত-পৃষ্ঠে গমন করিতেছেন, যিনি স্বর্গের অধিপতি বলিয়া এবং নন্দনকাননের অধিকারী বলিয়া ত্রিলোক-বিশ্রুত, তিনিও কি পারিজাতের যথার্থ গৌরব জানেন? কখনই না। তাহা হইলে তাঁহাকে সময়ে সময়ে স্বর্গের অধিকার হারাইতে হইত না; তাঁহাকেও অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না। ঐ বালক কিন্তু পারিজাতের যথার্থ গৌরব জানেন! ঐ দেখ বালক একটী ফুল পাইয়া কত আনন্দ ভোগ করিতেছেন!! আমরা এখন উহাকে ফুল বলিতেছি, কিন্তু উহা প্রকৃত ফুল নহে, উহাই স্বর্গের পারিজাত!! বাল্যকালে—অমর অবস্থায়—আমরাও একদিন এই পারিজাতের গৌরব বুঝিয়াছিলাম! তখন এই পারিজাতের সৌন্দর্য্যে আমরাও মোহিত হইয়া সমাহিত মহাযোগীর ন্যায় চিত্তে পরমানন্দ উপভোগ করিতাম! কিন্তু এখন আমাদের সে নয়ন কোথায়! আমরা প্রকৃতির বিকৃতিবশে সে নয়ন হারাইয়াছি!! আমরা অন্ধ হইয়াছি!!

ঐ দেখ, শিশু একটী ঝুম্‌ঝুমি লইয়া ঝুম্‌ঝুম্ শব্দ করিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া মুখে প্রবাহিত হইতেছে! আমরা উহা এখন সামান্য

অগ্রাহ্য ঝুম্ ঝুম্ শব্দ বলিয়া বোধ করিতেছি; কিন্তু আমরাও একদিন যখন এই শিশুর ন্যায় স্বর্গরাজ্যে ছিলাম, তখন উহাকে স্বর্গীয় অপ্সরোগণের নূপুরধ্বনি মনে করিতাম। কিন্তু এখন আমাদের সে শ্রুতি কোথায়? আমরা সে শ্রবণ হারাইয়াছি! আমরা বধির হইয়াছি!!

ঐ দেখ, শিশু একটী পুষ্পের সৌরভে কত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন! তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-প্রবাহ ধরে না, তাই শিশু মধুর হাস্যে সেই আনন্দ বিকীর্ণ করিতেছেন! সেই হাস্যময় শিশুর আস্য দেখিলে ঘোর নারকীও ক্ষণকালের জন্য নরক-যন্ত্রণাও বিস্মৃত হইয়া যায়। সেই হাস্যের এতই প্রভাব! এতই মহিমা! সেই হাস্যের সহিত এতই অমৃতের স্রোতঃ প্রবাহিত হয়!!! কিন্তু আমরা সেই স্বর্গীয় সৌরভ উপভোগ করিবার ঘ্রাণশক্তি হারাইয়াছি। সুতরাং সেই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগেও বঞ্চিত হইয়াছি!

ঐ দেখ, শিশু মাতৃ-অঙ্কে শয়ান হইয়া স্বর্গের অমৃত পান করিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেছেন! স্বর্গের বিভবও তাঁহার কাছে কি ছার তুচ্ছ বলিয়া গণ্য! কিন্তু আমরা এখন শিশুর রসন-স্পর্শনে বঞ্চিত হইয়া নিয়ত বিষপান করিতেছি এবং নিয়ত নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি! ফলতঃ আমরা স্বর্গীয় সমস্ত বিভব হারাইয়া এখন নরকেই অবস্থিতি করিতেছি। সেই জন্যই উপনিষৎকার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন;—

পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্।
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্।
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃশ্রোত্রং ম আগন্॥

আমাদের সেই মন, সেই আয়ুঃ, সেই প্রাণ, সেই আত্মা, সেই চক্ষুঃ, সেই শ্রোত্র পুনরায় ফিরিয়া আসুক্। যাহা আমাদের নষ্ট হইয়াছে, আমরা তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হই।

ঐ দেখ, বালক অবিরত ধাবিত হইয়াও ক্লান্তিবোধ করেন না। অবিরত কুর্দ্দন করিয়াও শ্রান্তিবোধ করেন না। শীতাতপ বা রৌদ্রবৃষ্টি তাঁহার গ্রাহ্য নহে! তিনি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু মহাতপস্বী! তিনি প্রাণায়ামসিদ্ধ মহাযোগী!

বালকের এত মাহাত্ম্য কেন? বালক সহজ-ব্রহ্মচারী বলিয়া। বালক সহজ-ব্রহ্মচারী কেন? বালকের নূতন দেহের বীর্য্য সুরক্ষিত বলিয়া। বালক পূর্ব্বজন্মে মৃত্যুকালে যমযন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর ও অভিভূত হইয়া অন্তরে একাগ্র-চিত্তে—সমাহিতমনে কেবল মা—মা—মা এই মন্ত্র জপ করিয়াছিল। সেই মন্ত্র-সাধনে সিদ্ধ হইয়াই বালক প্রকৃতি-মাতার নিকট এই নবদেহ লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি যমযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি সুরক্ষিত বীর্য্যপ্রভাবে এই জগৎ স্বর্গীয় নন্দনকাননের ন্যায় অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সতেজ—অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন; এই সুরক্ষিত বীর্য্যপ্রভাবেই তিনি অশ্রান্ত, অক্লান্ত, সদানন্দ! বালকের মাহাত্ম্যের নিগূঢ় রহস্য

এই। এখন বীর্য্য-মাহাত্ম্য বা শুক্রপ্রভাব কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে, শুন ;—

ধাতু।

এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যৎ নৃণাম্।
রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থি-মজ্জা-শুক্রাণি ধাতবঃ॥

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সাতটী দেহকে ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগের নাম ধাতু।

রস।

সম্যক্ পকস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।

ভুক্তদ্রব্য সম্যগ্‌রূপে পরিপক্ক হইলে তাহার সার-ভাগকে রস বলে।

রক্ত।

যদা রসো যকৃদ্‌যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ।
রাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংজ্ঞকঃ॥

যখন রস যকৃতে নীত হইয়া তত্রস্থ রঞ্জকনামক পিত্ত দ্বারা লোহিতবর্ণ এবং পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তখনই উহা রক্ত নামে অভিহিত হয়।

মাংস-মেদ-অস্থি-মজ্জা।

শোণিতং স্বাগ্নিনা পকং বায়ুনা চ ঘনীকৃতম্।
যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পকং তন্মেদ ইতি কথ্যতে॥
মেদো যৎ স্বাগ্নিনা পকং বায়ুনা যাতি শোষতাম্।
তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে সসারং সর্ব্ববিগ্রহে॥

অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো দ্রবো ঘনঃ।
যঃ স্বেদবৎ পৃথগ্ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ স্বীয় অগ্নি দ্বারা (স্বকীয় তেজে বা উত্তাপে) পক্ব এবং বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইয়া রক্তের সারভাগই মাংসরূপে পরিণত হয়। মাংস স্বীয় উত্তাপে পক্ব হইলে তাহার সারাংশ মেদরূপে পরিণত হয়। মেদ স্বীয় তেজে পক্ব এবং বায়ুকর্ত্তৃক শুষ্ক হইয়া অস্থিরূপ ধারণ করে। এই অস্থি শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করে। অস্থি স্বীয় তেজে পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে তাহার সারাংশ তাহা হইতে স্বেদবৎ নির্গত হয়, এবং তাহাই প্রথমে তরল ও পরে ঘনীভূত হইয়া মজ্জা নামে অভিহিত হয়।

শুক্র এবং ওজঃ।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥
শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥
ওজস্তু তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতি-নিবন্ধনম্॥

অর্থাৎ রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, এবং বল ও পুষ্টিকারক। উহা গর্ভের বীজস্বরূপ, শরীরের সার এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়।

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর তেজকে ওজঃ বলে। হৃদয় ইহার প্রধান আধার হইলেও ইহা সর্ব্বশরীর-ব্যাপী এবং শরীর রক্ষার প্রধান সাধন।

শুক্র কি, তাহা এখন অবশ্য বুঝিলে। শরীরের উপা-দানস্বরূপ সপ্তধাতুর মধ্যে শুক্রই যে শ্রেষ্ঠ ধাতু, তাহাও বুঝিলে। শুক্রই সর্ব্বশরীরব্যাপী ওজঃস্বরূপ অষ্টম ধাতুর আশ্রয় তাহাও জানিলে। শুক্র নষ্ট হইলে এই ওজঃ নষ্ট হয়। এই ওজঃ ব্রহ্মতেজঃ বলিয়া বিখ্যাত। এই ওজঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট হিউম্যান্ ম্যাগ্নেটিজ্ম্ বলিয়া খ্যাত। ওজঃ বিনষ্ট হইলেই দেহ নির্জ্জীব হয়। সেই নির্জ্জীব দেহ হইতে সূক্ষ্মশরীরসহ মান-বের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন বহির্গত হইয়া যায়। অতএব ওজঃ বা বীর্য্যই যে ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, ইহা প্রতীত হইতেছে।

দেহের কান্তি বা শ্রী, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্ত্তি এবং মনের প্রীতি, এই শুক্র বা ওজোধাতুরই ক্রিয়া। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে সকলেই বুঝিতে পারে যে, চক্ষুঃ পীড়াগ্রস্ত হইলে যেমন জগতের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, তেমনই শুক্র নষ্ট বা বিকৃত হইলে জগতের সমস্তই নষ্ট বা বিকৃত হয়। দেহের শুক্র নষ্ট হইলে সমুস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হয়, সুতরাং জগ-তের সমস্ত বিষয়সুখও তৎসহ অপসারিত হয়। অতএব যে সুখের জন্য কামুকেরা শুক্রধাতু নষ্ট করে, মূঢ়েরা অতি সত্বর কেবল সেই সুখে নহে, পরন্তু সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সুখে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়। তখন তাহারা এই জগৎকে

ভীষণ নরক মনে করিয়া হতাশপ্রাণে কেবল ভীষণ মৃত্যুর অপেক্ষা করে।

যে দিন বালক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বীর্য্যচ্যুত হয়, সেই দিন হইতে সে মৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ে। সেই দিন হইতেই সে অমরত্ব হারাইয়া মরত্ব বা নরত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং ক্রমশঃ কামপ্রবৃত্তিবশে যতই বীর্য্যহীন হয়, ততই সে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বালক যদি যোগসাধনে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে যৌবনেও তাহার বীর্য্য স্খলিত হইতে পারে না। বালক চিরদিনই ঊর্দ্ধরেতা হইয়া—অমরত্বের অধিকারী হইয়া স্বর্গের রাজত্ব সম্ভোগ করিতে পারেন।

ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ॥

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্য্যধারণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা। যিনি এই তপস্যা করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারেন, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনিই যথার্থ দেবপদবাচ্য।

যিনি ঊর্দ্ধরেতা তিনিই অমর; মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন। তিনি স্বর্গীয় অতুল আনন্দের অধিকারী। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য সম্যক্ বর্ণনা করা অসাধ্য।

যাহারা বীর্য্যক্ষয় করে, তাহারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। সেই সমস্ত যন্ত্রণা বর্ণনা করা, আর শাস্ত্রীয় সমস্ত নরকের বর্ণনা করা একই কথা। দুগ্ধ হইতে নবনীত বা ঘৃত অপসারিত হইলে তাহার যে দুর্দ্দশা ঘটে, শোণিত শুক্রভ্রষ্ট

হইলেও নিশ্চয় সেইরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়। সেই নির্ব্বীর্য্য বা দুষ্ট শোণিত সমস্ত রোগের নিদান। অতএব আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত রোগের বর্ণনা আছে, ক্ষীণবীর্য্য ব্যক্তির সেই সমস্ত রোগই হইতে পারে। কিন্তু ধৃতবীর্য্য ব্যক্তির প্রায় কোন রোগই হইতে পারে না। এই সকল সম্যক্ আলোচনা করিয়া এবং সমস্ত রোগের নিদান ও যন্ত্রণা সম্যক্ অবগত হইয়া, বীর্য্যধারণে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবে। এখানে ব্রহ্মচর্য্য-সাধন সম্বন্ধে আর অধিক বলা অনাবশ্যক; যেহেতু, যাহার বীর্য্য স্খলিত হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু যিনি বীর্য্যহীন হইয়া—সর্ব্বস্ব হারাইয়া যন্ত্রণা পাইতেছেন, তাঁহাকে নরক হইতে পরিত্রাণের জন্য, তাঁহার স্মরণশক্তির উৎকর্ষ সাধন জন্য **ব্রহ্মচর্য্যসাধন** নামে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক শীঘ্রই সংগৃহীত ও প্রচারিত হইবে। তাহাতে অতি বিস্তৃতভাবে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের সমস্ত কথাই বিবৃত হইবে। পাপীকে দুরুত্তীর্ণ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা অতীব প্রয়াস-সাপেক্ষ। **ব্রহ্মচর্য্যসাধন** নামক স্বতন্ত্র পুস্তকে সেই প্রয়াস গৃহীত হইবে।

যাঁহারা কুমার, অদ্যাপি যাঁহাদের বীর্য্য স্খলিত হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সাধন অতীব অনায়াস-সাধ্য। কিন্তু যে একবার কামের প্রলোভনে পড়িয়া বীর্য্যহানি করিয়াছে, তাহার পক্ষে এই ব্রহ্মচর্য্যসাধন অতীব দুঃসাধ্য। আধুনিক কোন কবি লিখিয়াছেন,—

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো যে চাম্বুপর্ণাশনাঃ।
তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ॥

শাল্যান্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবাঃ।
তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্॥

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি যে সকল মুনি জল ও পাতা খাইয়া তপস্যা করিতেন, তাঁহারাই যখন সুন্দর স্ত্রীমুখপদ্ম দর্শন করিয়া মোহিত বা কামান্ধ হইয়াছিলেন, তখন দধিদুগ্ধঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিয়া সাধারণ মানবগণ যদি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পঙ্গুও সাগর উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইতে পারে।

উল্লিখিত কবিতা ঋষিবাক্য নহে, মুনিবাক্যও নহে; উহা আধুনিক কবিবাক্য। সুতরাং উহা সত্য নহে, এবং সত্যের নিকটবর্ত্তীও নহে, ফলতঃ সত্য হইতে অনেক দূরবর্ত্তী। তবে ঐ কবিবাক্য যে নিতান্ত অগ্রাহ্য, তাহাও নহে। সাধারণতঃ সাংসারিক তামসিক ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি দেখিয়া উহাকে যেন হঠাৎ অভ্রান্ত যুক্তিমূলক সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। উহার ভাবার্থ এই যে, সাংসারিক লোকের পক্ষে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নিতান্ত অসম্ভব। এই ভাবটী বাস্তবিক সত্য নহে। আমরা সংসারে প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকারী শত শত ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং মুনি পরাশর এবং বিশ্বামিত্র যদি স্মরণশক্তির অভাবে ব্রত বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই যে ব্রত-ধারণ অনুচিত, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। বিশ্বামিত্রের কথা আর কি বলিব, তিনি অনেক কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব

লাভের পূর্ব্বে যে সকল ভ্রম বা ত্রুটি ঘটিয়াছিল, তাহা ঘটিবারই কথা।

পরাশর যে ভ্রান্ত ও কামান্ধ হইয়াছিলেন, ইহা একটু বিস্ময়ের কথা বটে; কিন্তু পরাশর দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। দেবতা হইলেও যে ভ্রম হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন, তাহাও নহে।

যাহা হউক, পরাশরের অপেক্ষা তৎপুত্র ব্যাসদেব যে উন্নতাত্মা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ব্যাসদেব অপেক্ষাও তদীয় পুত্র শুকদেব অধিকতর উন্নতাত্মা। এই শুকদেবের চরিত্রে আমরা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য দেখিতে পাই। ব্যাসদেবও পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়া—স্বর্গের অপ্সরা আনিয়াও পুত্রকে প্রলোভিত করিতে—ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই!! এই শুকদেব ব্যাসদেবেরও পূজনীয়! সমস্ত রাজর্ষি, মহর্ষি ও দেবর্ষিরও প্রণম্য!!

অতএব কবিবাক্য তুচ্ছ করিয়া, বিশ্বামিত্র-পরাশরকে ভুলিয়া গিয়া, এই শুকদেবকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য নিয়ত হৃদয়ে অনুধ্যান করিবে। আর তুমি যদি স্বয়ং ব্রহ্মচর্য্যপালনে একান্ত অশক্ত হও, তবে স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মচারী করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা প্রত্যক্ষ কর। তুমি ইচ্ছা করিলে, কিঞ্চিৎ সাবধান হইলে, তোমার পুত্রকে অনায়াসে ব্রহ্মচারী করিতে পার। যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ব্রহ্মচর্য্যসাধন বালকের পক্ষে নিতান্ত সহজ। বালককে যদি সাবধানে লালনপালন করিয়া স্বয়ং সাবধানে

শিক্ষা দেওয়া যায়, যদি তাহাকে কুসংসর্গে মিশিতে দেওয়া না যায়, যদি তাহাকে সাধারণ জনসংসর্গ হইতে সাবধানে সুরক্ষিত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সে অতি সহজেই ব্রহ্মচর্য্যের সুফল ভোগ করিতে পারে। জগতে তাহার অসাধ্য কোন কার্য্যই থাকে না। বীর্য্যই দেহের বলস্বরূপ এবং বীর্য্যই উৎসাহ ও আনন্দস্বরূপ। সুতরাং উৎসাহ, আনন্দ এবং বল সহকারে এ জগতে কি কার্য্য সাধন করা না যায়? সকল কার্য্যই সাধন করা যায়।

যাহাহউক, শুক্রক্ষয়ে দেহের যে আশু অপকার হয়, ইহা লক্ষ লক্ষ লোকে জানিলেও পুনরায় তাহারা শুক্রক্ষয় করে কেন? শুক্রই আনন্দস্বরূপ; সেই শুক্র যখন দেহ হইতে নির্গত হয়, তখনও একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করা যায়। সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিবার জন্যই লোকে ব্যগ্র এবং মোহিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই আনন্দ অনির্ব্বচনীয় হইলেও, তাহা যে অত্যন্ত অল্পক্ষণস্থায়ী এবং তাহার পরিণাম দুঃসহ ক্লেশদায়ক একথা স্মরণ থাকে না। কেননা এই শুক্রই মনকে সৌম্যগুণান্বিত, প্রশান্ত বা একাগ্র করিয়া থাকে। সেই শুক্র ক্ষীণ হইলেই মনও অস্থির ও অসুখী হইয়া একাগ্রতা এবং স্মরণশক্তি হারাইয়া থাকে। লোকে স্মৃতি-ভ্রষ্ট হইলে অর্থাৎ স্মরণশক্তি হারাইলেই বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়, এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেই বিনষ্ট হয়। এই কারণেই কামুকগণ অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা শুক্রক্ষয়ের অপকারিতা অন্তরে সম্যক্ অনুভব করিয়াও, সেই অনুভব

স্মরণ রাখিতে পারে না, কেননা শুক্রক্ষয়ের সহিতই স্মরণ-শক্তিও ক্ষয় পায়। সেই জন্যই লোকে জানিয়া শুনিয়াও মরে! যে মৃত্যুকে লোকে অতি ভীষণ বলিয়া ভয় করে, শুক্রক্ষয় করিয়া সেই মৃত্যুকেই তাহারা আহ্বান করে। এবং যতদিন কোনরূপে জীবিত থাকে, ততদিন কেবল নিয়ত মৃত্যুযন্ত্রণাই ভোগ করে। স্মরণশক্তির উৎকর্ষ-সাধন করিলে তুমি অতি সহজেই এই মৃত্যু-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে। ফলতঃ এই মৃত্যুযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যও স্মরণশক্তির নিতান্ত প্রয়োজন; আবার সেই স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন জন্যই ব্রহ্মচর্য্যসাধন অর্থাৎ বীর্য্যধারণ একান্ত আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্য্যসাধনই ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান সাধন এবং সর্ব্ব প্রথম সোপান। ব্রহ্মচর্য্যসাধন না করিলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না, সুতরাং মনও সুস্থ থাকিতে পারে না। আর যাহার মন অসুস্থ বা অসুখী, সেই নারকীর পক্ষে ধর্ম্ম-সাধন নিতান্তই দুঃসাধ্য বা অসাধ্য।

যিনি সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কাম রিপুকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্য দমনের জন্য বিশেষ আয়াস গ্রহণ করিতে হয় না। ফলতঃ সমস্ত কুপ্রবৃত্তিই সহজেই তাঁহার বশীভূত হয়। সুতরাং ধর্ম্মসাধন তাঁহারই পক্ষে অনায়াস-সাধ্য হয়। যিনি স্বীয় মনের প্রথম শত্রুকে দমন করিতে পারিয়াছেন, জগতে আর কোন শত্রুকেই তাঁহার ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। কাম যাঁহার বশীভূত, জগৎ তাঁহার বশীভূত। কামের উপর

যিনি আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। অতএব ইহা হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম কর। এখানে আর অধিক বলা বাহুল্য। *

অপরিগ্রহ সাধন।

দেহরক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তদতিরিক্ত ভোগসাধন দ্রব্যাদির আকাঙ্ক্ষা না করাকে অপরিগ্রহ বলে।

দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাস্বীকারো-
ঽপরিগ্রহঃ।

ধর্ম্মসাধনের জন্য বা দুষ্কৃতিক্ষয়ের জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজন। আমাদের স্থূল দেহ রক্ষার জন্য জল বায়ু খাদ্য প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে জলবায়ুর অভাব নাই। তজ্জন্য জগতে কাহাকেও বিশেষ আয়াস গ্রহণ করিতে হয় না। খাদ্যের জন্যই মোহান্ধ ব্যক্তিরা জগৎ উতপ্লুত করে। মানব খাদ্যের জন্য সমগ্র উদ্ভিজ্জগৎ প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট নহে, সমগ্র প্রাণিজগৎ মনুষ্য খাইয়া ফেলিতে চায়!! সেই জন্যই মনুষ্যের মাংসাহারে প্রবৃত্তি। কিন্তু এ সংসারে এমন উদাসীন সন্ন্যাসীও বিস্তর আছেন, যাঁহারা প্রত্যহ আধ পোয়া দুগ্ধই দেহরক্ষার্থ পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করেন। অথবা গোটাকত বিল্বপত্রের আধ পোয়া ক্বাথ প্রাত্যহিক যথেষ্ট

* কিন্তু কামরিপু যাহার মনে অত্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তাহার পক্ষে কিছু বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন। সেই জন্য ব্রহ্মচর্য্যসাধন সম্বন্ধে সত্বর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রচারিত হইবে। সেখানি সঙ্গে থাকিলে ব্রহ্মচর্য্যসাধন সকলেরই পক্ষে সুসাধ্য হইবে।

খাদ্য বলিয়া জ্ঞান করেন। সেই সকল সন্ন্যাসীও দিব্য-কান্তিকলেবর। তাঁহাদের শরীরে কোন রোগশোকপরিতাপ নাই। ফলতঃ ধৃতবীর্য্য বা উর্দ্ধরেতা ব্যক্তির পক্ষে প্রাত্যহিক এই আধপোয়া খাদ্যও অতিরিক্ত; তদ্রূপ ব্যক্তি সপ্তাহান্তে আধ পোয়া দুগ্ধ ভোজন করিয়াও ক্লেশবোধ করেন না। এ সকল কল্পিত কথা নহে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা। আবার এ সংসারে সাধারণ জনগণের মধ্যে ভোজনস্পৃহা এতই অধিক যে, সংসারের সমস্ত উদ্ভিদ্, সমস্ত প্রাণীও যেন তাহাদের পরিতৃপ্তি-সাধনে যথেষ্ট নহে। তাহাদের প্রত্যেকে এক সের দ্রব্য পরিপাক করিতে সমর্থ না হইলেও, লক্ষ মণ দ্রব্য উদরস্থ করিতে অভিলাষ করে! তাহাদের আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল।

ক্ষীরসরনবনীত এবং ঘৃতমধুশর্করা সকলের রসনাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। সেই জন্যই অনেকে শুঁট্‌কি মাছ, পচা ইলিশ, পচা মৃগমাংসজাত কৃমি, আর এতদ্রূপ নারকীয় কত অসংখ্য বস্তু নিয়ত ভোজনার্থ লোলুপ হইয়া থাকে! অনেকে মড়া-পোড়ার গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা মড়া-ভাজার গন্ধে আনন্দে মত্ত হয়। একটা মানুষের মৃতদেহকে পোড়াইলেও যেরূপ গন্ধ বিকীর্ণ হয়, একটা মৎস্য পোড়াইলেও তদ্রূপ গন্ধই বিকীর্ণ হয়। অনেকে কিন্তু মনুষ্যের মৃতদেহ পোড়াইয়া খায় না। * কিন্তু মাছ পোড়াইয়া খায়!

* এ সংসারে মনুষ্যের মৃতদেহকেই সাধারণতঃ মড়া বলে; এই মড়া-পোড়াও যে কেহই খায় না, তাহা নহে; কেননা মনুষ্যের অখাদ্য বস্তু জগতে কিছুই নাই। মনুষ্যের প্রবৃত্তির অন্ত নাই।

আবার যাঁহারা মাছ পোড়াইয়া খাইতে তত ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা তৈলে মাছ ভাজিয়া খাইতে ভালবাসেন। কিন্তু মড়ার মাংসও তৈলে ভাজিলে তাহাও ঠিক্ মাছ-ভাজার মতই উপাদেয় হইয়া থাকে !! এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাটুকু তাঁহাদের নাই; আর সেই জ্ঞান না থাকাতেই তাঁহারা মনুষ্যের মৃতদেহগুলি পুঁতিয়া বা পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া থাকেন।

অপরিগ্রহসাধনের বিষয় আর কি বলিব ? অধিক কিছু বলিব না, কেননা প্রবৃত্তির দমন করা বড়ই দুঃসাধ্য। কিন্তু যদি প্রবৃত্তির দমন করিতে পার, তাহা হইলে মহাফল লাভ করিতে পারিবে। সেই জন্যই বলিতেছি, তোমার যদি মাছ-মাংস খাইবার অত্যন্ত লোভ থাকে, তবে তুমি সে লোভকে দমন কর। এ লোভ কেনই বা দমন করিতে পারিবে না ? "মড়া-ভাজা ঠিক্ মাছ-ভাজার মতই উপাদেয় !" একথা বলিলেও তুমি কি মড়া-ভাজা খাইতে লোলুপ হও ? কেন হও না ? মড়ার প্রতি তোমার অত্যন্ত ঘৃণা আছে, সেই ঘৃণা তোমার সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্যই "মড়া-ভাজা" এই কথা বলিবামাত্রই তোমার বমি আসিয়া থাকে। কিন্তু "মাছ-ভাজা" বলিলেই তোমার রসনা লোলুপ হয় ! তুমি ঢোক্ গিলিয়া থাক। কিন্তু পরীক্ষা করিতে পার আর নাই পার, বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, "মড়া-ভাজা" আর "মাছ-ভাজা" উভয়ই তুল্য ! কেবল মোহান্ধতাবশতঃই তুমি একটীকে হেয় এবং অন্যটীকে উপাদেয় বলিয়া

মনে কর। আর সেই মোহান্ধতাই তোমার প্রবৃত্তি বা সংস্কারের মুল। অতএব নিয়ত বিচার দ্বারা এই মোহান্ধতা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রবৃত্তিকেও সহজে বশীভুত করিতে পারিবে।

নিয়ত বিচারের নামই সাধনা। মনকে বশীভূত করিতে পারিলেই জগৎ বশীভূত করা যায়। নিয়ত বিচার দ্বারা সেই মন বশীভূত হইয়া থাকেন। অতএব সাধনা করিতে হইলে, মনে-মনে বিচার কর। কিন্তু বিচার বলিলে কি বুঝায়, তাহা কি তুমি বুঝিয়াছ? বিচার ত সকলেই করে, অজ্ঞান বালক ও বন্য মূর্খও বিচার করিয়া কাজ করে। এ সংসারে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত না করিয়া কেহই কোন কাজ করে না। ফলতঃ "এ সংসারে সকলেই সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি" এ কথা বলিলেও যথার্থ কথাই বলা হয়। তবে তুমি আবার কি বিচার করিবে? তুমিত স্বভাবতই বিচারক, স্বভাবতই "সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি" তবে আবার তোমাকে বিচার করিতে উপদেশ দিতেছি কেন? অজ্ঞানান্ধ অসমাহিত চিত্তের বিচারকে বিচার বলে না; তাহাকে বৃথা জল্পনা বলে। ঋষিবাক্য বা গুরুবাক্য অবলম্বন করিয়া যে বিচার করা যায়, তাহাই যথার্থ বিচার নামের যোগ্য। যাহা ঋষিবাক্য বা গুরুবাক্যের বিরুদ্ধ, তাহা বিচার নহে; ফলতঃ তাঁহারই নাম ব্যভিচার!!

অতএব ব্যভিচার হইতে আত্মরক্ষা কর। গুরু-বাক্য

হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া নিয়ত বিচার কর। এই বিচারের নামই সাধনা। এই বিচারের নামই ধর্ম্মসাধন। ধর্ম্মই অনন্ত জীবনের সহচর। এই স্থূলদেহ এই স্থূল জগতে পড়িয়া পচিয়া যাইবে। ধর্ম্ম পচিবার জিনিষ নহে।

এ জগতে মানবজন্ম লাভ করিয়া ধর্ম্মই পরিগ্রহ করিতে নিয়ত সচেষ্ট থাক। বিষ্ঠামূত্র-কৃমিময় দেহের জন্য পরিগ্রহ-চেষ্টা পরিত্যাগ কর। হস্তী ও শূকরের হৃষ্টপুষ্ট দেহ আছে; সিংহ ও ব্যাঘ্রের বলবান্ দেহ আছে; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষাও তুমি আপনাকে যে জন্য শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাক, সেই জন্যই দেহের বল-পুষ্টি সাধনের আগ্রহ পরিত্যাগ কর। যে সম্পত্তির জন্য তুমি আপনাকে বিষ্ঠা-ভোজী শূকরের অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া থাক, সেই সম্পত্তির বৃদ্ধিসাধনেই নিয়ত নিয়োজিত থাক। শরীরের বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত থাকিও না। আর যদি শরীরের বৃদ্ধিসাধনই তোমার একান্ত অভিলষিত বা আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাহা হইলে তুমি শূকরের নিকটই তোমার সাধনা শিক্ষা কর। তুমি শূকরকে তোমা অপেক্ষা নির্ব্বোধ মনে করিও না; কেননা তুমি শত চেষ্টা করিয়াও—জগতের সর্ব্ব বস্তুর ভোক্তা হইয়াও তোমার শরীরের মাংস-বৃদ্ধি-বিষয়ে শূকরের অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইতে পার না। শূকর একমাত্র বিষ্ঠাতেই সন্তুষ্ট; কিন্তু তুমি জগতের কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট নও; এই অসন্তোষই তোমার শারীরিক কৃশতার কারণ। অতএব শূকরের নিকটও তুমি অপরিগ্রহ-সাধন শিক্ষা করিতে পার। অতঃপর অপরিগ্রহ বিষয়ে

আর অধিক কি বলিব? হে মানব! এ জগতে তুমি যেমন পরিগ্রহ-পাপে ঘোরতর পাপী, এমন পাপী আর কেহই নাই। জগতে ইতর প্রাণীদিগেরও আকাঙ্ক্ষার সীমা আছে, কিন্তু তোমার দুরাকাঙ্ক্ষা অসীম! সেই জন্যই অপরিগ্রহ সাধন তোমার পক্ষে যেন অসাধ্য বলিয়াই প্রতীত হয়!

লোভ পরিত্যাগ কর, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" এই চলিত কথাটী ঋষিবাক্য বা গুরুবাক্যের তুল্য। ইহা নিয়ত হৃদয়ে জাগরূক রাখ। বিলাসিতা পরিত্যাগ কর, যেহেতু বিলাসিতা লোভের জননী।

অভোজন বা কুভোজন এবং অতিভোজন পরিত্যাগ কর। যেহেতু ইহাই বহুরোগের এবং বহু যন্ত্রণার নিদান।

ফলতঃ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কর। ইহাই পরম শান্তি, পরম সন্তোষ এবং পরম সুখের নিদান। পরিগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষাই মনকে নিয়ত চঞ্চল করে। মন জগতের অগম্য স্থানে গমন করিয়াও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। অতএব অপরিগ্রহসাধন দ্বারা মনের আকাঙ্ক্ষা দূর কর, তাহা হইলে মন একাগ্র বা সমাহিত হইবে। এবং তখন,—

অপরিগ্রহে স্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ।

চিত্তে অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ব্বাপর জন্ম-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হয়। এই মহার্হ গুরুবাক্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

যাহাদের মন পার্থিব ভোগসাধনে নিতান্ত আসক্ত, যাহারা স্থূল দেহের মমতায় নিতান্ত ব্যস্ত, তাহারা জন্মান্তর-বৃত্তান্ত হৃদয়ঙ্গম করা দূরে থাক্, সে কথায় কোনক্রমেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। সেই জন্যই জগতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও জন্মান্তর স্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু জন্মান্তরবোধ পণ্ডিতের সাধ্য নহে, তর্কের সাধ্য নহে! অথচ ইহা অপরিগ্রহসিদ্ধ যোগীর সহজ-সাধ্য।

পরিগ্রহ বা দুরাকাঙ্ক্ষা পাপের ভীষণ ফল পর্য্যালোচনা করিলে শরীর অবসন্ন ও মন হতাশ হয়। এই পাপের জন্যই জগতে অসংখ্য প্রাণিহত্যা এবং অসংখ্য নরহত্যা হইতেছে। যুদ্ধবিবাদ এবং তজ্জন্য নরহত্যা এই পাপেরই ফল। বিলাস-ব্যসনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক নিতান্ত বৃথা বস্তুর অন্বেষণে জীবন ক্ষয় করিতেছে; সেই জন্য জগতে প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে অসংখ্য মানব মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বিলাসিনীর পোষাকের নিমিত্ত কাঠ-বিড়ালীর চামড়া আবশ্যক, পাখীর পালক আবশ্যক, হীরামণিপান্না-সোনার প্রয়োজন; অতএব সেই কাঠ-বিড়ালীর চামড়া, পাখীর পালক এবং হীরামণিপান্নাসোনার অন্বেষণে লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত; তজ্জন্য তাহারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছে!

যদি এই বিলাসিতা জগৎ হইতে দূরীভূত হয়, যদি সেই লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্য শস্যাদি উৎপন্ন করিবার জন্য নিযুক্ত হয়, তবে কি সংসারে কাহারও খাদ্যাভাব হয়? তবে কি জগতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হয়? তবে কি

জগতে পাপের এত প্রাদুর্ভাব হয় ? একজন মানুষ চেষ্টা করিয়া ১০০ জনের খাদ্য শস্যাদি অনায়াসে উৎপন্ন বা সংগ্রহ করিতে পারে। অতএব এরূপ স্থলে বহুবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইলেও মানুষ কি খাদ্যাভাবে মরিতে পারে ? অতএব হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখ, এই পরিগ্রহ পাপ কত অসংখ্য অনর্থের হেতু। ফলতঃ এই পরিগ্রহ পাপই অশান্তি, অসুখ বা অশেষ দুঃখের নামান্তর। সুতরাং সমস্ত দুঃখেরই মূল।

এ সংসারে কেহ বা অতিভোজনের জন্য পীড়িত হইয়া মরিতেছে, কেহ বা খাদ্যাভাবে জীর্ণ হইয়া মরিতেছে ! পরিগ্রহ পাপই এই বিষম অনর্থের—এই বিষম সর্ব্বনাশের হেতু। এই পাপের জন্যই জগৎ যেন অশান্তি ও অসুখে পরিপূর্ণ, এই পাপের জন্যই সাধনাবিহীন সাধারণ মানবের নিকট সংসার বিষময় হইয়াছে। এই পাপ তিরোহিত হইলেই জগতের বৈষম্য সহজে দূরীভূত হইতে পারে। এই পরিগ্রহ পাপই জন্মান্তরপরিগ্রহের হেতু ! এই পাপই সংসার-স্রোতের হেতু। এই পাপই নরক-যন্ত্রণার নিদান। এই পরিগ্রহ পাপই কামক্রোধাদি সমস্ত রিপুর জনক।

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই মহাপাপ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সুখশান্তির অধিকারী হও। এবং জগতের সুখশান্তি বিধান কর।

সর্ব্ববাদি-সম্মত সার্ব্বভৌম মহাব্রতস্বরূপ. পঞ্চাঙ্গ যম-সাধনের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে অপর যোগাঙ্গগুলি ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

নিয়ম-সাধন।

নিয়মসাধনও পঞ্চাঙ্গ, যথা ;—

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান। যমসাধনের সঙ্গেই এই পাঁচটী সাধনেরও প্রয়োজন।

শৌচ।

শুদ্ধাচারের নাম শৌচ। অর্থাৎ শরীর ও মন যথাসম্ভব নির্ম্মল বা পরিষ্কৃত করার নাম শৌচসাধন। জল, মৃত্তিকা, গোময় প্রভৃতি দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত হয়। এবং ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা বা বিচার দ্বারা মন নির্ম্মল হয়। হিংসা, অসত্য, স্তেয়, বীর্য্যক্ষয় এবং পরিগ্রহরূপ পাপ দ্বারাই চিত্ত নিতান্ত কলুষিত হয়, আর সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইলেই অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। অতএব উক্ত পাপ সকল যে অনন্ত অজ্ঞান ও দুঃখের হেতু, ইহা নিরত চিন্তা করিয়া চিত্তমল পরিহার করা কর্ত্তব্য। চিত্তের কলঙ্ক দূরীকরণের আর একটী অতি প্রশস্ত উপায় আছে, যথা ;—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।

সুখে মৈত্রী, দুঃখে করুণা, পুণ্যে মুদিতা (হর্ষ) এবং পাপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল

হয়। চিত্ত প্রসন্ন করিবার ইহা অতি উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু ইহাও নিয়ত সাধনা অর্থাৎ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

যে চিত্ত সতত স্বীয় সুখ প্রার্থনা করে, সেই চিত্ত যদি অন্যের সুখেও সুখবোধ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে ঈর্ষ্যারূপ কলঙ্ক থাকিতে পারে না। মরিচা ধরিয়া যেমন লৌহও জীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ঈর্ষ্যামল দ্বারা চিত্তও তদ্রূপ জীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। এই কথা স্মরণ রাখিয়া নিয়ত বিচার করা কর্ত্তব্য। অন্য কোন ব্যক্তিকে কোনরূপে সুখী হইতে দেখিলেই বা শুনিলেই সেই সুখে স্বয়ং সুখবোধ করিবে, কখনও ঈর্ষ্যা করিবে না।

কাহারও দুঃখ দেখিলে সেই দুঃখে সহানুভূতি বা করুণা প্রদর্শন করিবে। একান্তমনে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে একান্ত ইচ্ছা এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ধর্ম্ম-সাধনের বা চিত্তমল দূরীকরণের ইহা অতি প্রশস্ত উপায়। পরদুঃখে দুঃখী হইতে অভ্যাস করিলে তোমার চিত্তে বিদ্বেষমল থাকিবে না এবং পরের অপকার করিবার প্রবৃত্তি অর্থাৎ হিংসা পাপও থাকিবে না।

কাহাকেও পুণ্যকার্য্য করিতে দেখিলে বা শুনিলে হর্ষ প্রকাশ করিবে। ফলতঃ পুণ্যবানের চরিত্র নিয়ত আলো-চনা করিবে এবং তাহা আলোচনা করিতে করিতে পুলকিত বা আনন্দিত হইবে। ইহাতে তোমার অন্তঃকরণ হইতে অসূয়ামল অপসারিত হইবে এবং চিত্ত প্রসন্ন হইবে।

কাহাকেও পাপকার্য্য করিতে দেখিলে বা শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া অন্যত্র

স্থাপন করিবে। ফলতঃ পাপীর পাপ যেন দেখিয়াও দেখিবে না, এবং শুনিয়াও শুনিবে না। তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবে। পাপীকেও ঘৃণা করিবে না, এবং তাহার পাপের অনুমোদনও করিবে না। বরং তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুঃখ ও দুঃখের কারণ বিবেচনা করিয়া করুণার্দ্রি হইবে। পাপ-বিষয় মনে মনেও আন্দোলন করিবে না। ইহাতে তোমার চিত্ত হইতে ক্রোধমল দূরীভূত হইবে। এবং চিত্ত প্রসন্ন হইবে।

উল্লিখিত উপায় দ্বারা শরীর ও চিত্তকে বিশুদ্ধ করিলে, কি মহাফল লাভ করিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শুন ;—

শৌচাৎ স্বাঙ্গ-জুগুপ্‌সা পরৈরসঙ্গশ্চ।

বাহ্য শৌচ দ্বারা স্বীয় শরীরের প্রতিও ঘৃণা জন্মে এবং পরের সংসর্গ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

শরীর নির্ম্মল বা পরিষ্কৃত করিতে নিয়ত চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিবে যে, শরীর কখনই সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইতে পারে না, তখন স্বভাবতঃই স্বীয় শরীরের প্রতি তোমার ঘৃণা জন্মিবে। রসরক্তমাংসমেদ-অস্থি-মজ্জা-শুক্র এই সপ্ত ধাতুই অস্পৃশ্য ও অপবিত্র পদার্থ; এই শরীর ক্রমিকীটের আবাস-ভূমি; ইহার কোন স্থান ক্ষত হইলেই দুর্গন্ধ-রক্তপূয ও ক্রিমি নির্গত হয়। ইহা হইতে বিষ্ঠা, মুত্র, ঘর্ম্ম নির্গত হয়। গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে, শরীর ক্ষণকালের জন্য যেন নির্ম্মল হইল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রত্যেক লোমকূপ হইতে ঘর্ম্ম ও মল নির্গত হইতে লাগিল। অতএব শরীরকে

অধিকক্ষণ নির্ম্মল ও পবিত্র রাখা নিতান্ত অসাধ্য। এই সকল বিচার করিতে করিতে শরীরের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা জন্মে। আবার যখন স্বীয় শরীরের প্রতি ঘৃণা জন্মিবে, তখন পর-শরীরের প্রতি যে অধিকতর ঘৃণা জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরশরীরের প্রতি ঘৃণা জন্মিলে পরসংস্রব বা পরসঙ্গ ত্যাগ করিতে উৎকট ইচ্ছা জন্মিবে। এই ইচ্ছা দ্বারা কামরিপুও সম্পূর্ণরূপে দমিত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ কবিরা যাহাকে "স্ত্রীমুখ-পঙ্কজং সুললিতং" মনে করেন, শৌচাচার যোগীরা তাহাকে সাক্ষাৎ নরক বলিয়াই বোধ করেন।

যাহারা অখাদ্য-ভোজী, অশুচি ও ক্ষীণবীর্য্য, তাহাদের শরীর হইতে নিয়ত যে গন্ধ নিঃসৃত হয়, সেই গন্ধও যোগ-সাধনের পক্ষে অনিষ্টকর। সেই জন্য যোগীরা বা বিশুদ্ধা-চার ব্রাহ্মণেরা অপর সাধারণ ব্যক্তির সহিত একাসনে উপবেশন করেন না; এবং, সাবধানে অপর-সাধারণের সংস্পর্শ ত্যাগ করেন; অধিক কি, তাহাদের ছায়াকেও তাঁহারা অস্পৃশ্য বোধ করেন। ফলতঃ তুমিও যদি সাধা-রণের অপেক্ষা উন্নত হইতে চাও, তবে যথাসাধ্য তাহাদের সংসর্গ ও সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবে।

অতঃপর আভ্যন্তর শৌচের ফল বলিতেছি শুন;—

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শন-
যোগ্যত্বানি চ।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অন্তঃকরণ পরিষ্কৃত বা নির্ম্মল করিলে প্রথমে সত্ত্বশুদ্ধি হয়; অর্থাৎ তমঃ এবং রজো রূপ অন্তর্মল

ক্ষীণ হইয়া প্রকাশস্বরূপ এবং সুখস্বরূপ সত্ত্বগুণ পরিস্ফুট হয়। সত্বগুণ পরিস্ফুট হইলে অর্থাৎ সত্বশুদ্ধি হইলে সৌমনস্য জন্মে; অর্থাৎ মনের খেদ বা ক্ষোভ তিরোহিত হয়। আপনাকে তখন আর দীন বলিয়া কাতরতা জন্মে না; যেন মনের সমস্ত অভাব তিরোহিত হইয়া যায়; মন যেন আনন্দে পূর্ণ হয়। সৌমনস্য জন্মিলেই মনের একাগ্রতা জন্মে। তখন মনকে যে কোন বিষয়ে হউক্, সংলগ্ন করিয়া স্থির ও অচঞ্চল রাখা যায়। সুতরাং একাগ্রতা জন্মিলে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা যায়; আর ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিলে, বাক্য-মনের অগোচর জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে কিরূপ পদার্থ, তখন সেই জিতেন্দ্রিয় চিত্ত তাহাও সহজে অনুভব করিতে পারে।

অতএব বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধির মহাফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখ। আত্মা আছে কি না, ঈশ্বর আছেন কি না, যদি থাকেন তিনি কিরূপ? ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা তর্ক দ্বারা হইতে পারে না। সাধনার প্রয়োজন ও চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। মহাপণ্ডিত, মহাতার্কিক এবং মহাদাম্ভিকও উল্লিখিত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু একজন সামান্য সাধক স্বীয় অন্তঃকরণে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যোগীও সাধনাবিহীনকে বুঝাইতে সমর্থ নহেন। কেননা, পদ্মগন্ধ কিরূপ? ইহা কে কাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারে? স্বয়ং পদ্মের আঘ্রাণ না করিলে কেহই পদ্মগন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

অতএব শরীর ও অন্তঃকরণ নির্ম্মল করিতে সতত সচেষ্ট ও বিচার-পরায়ণ হইবে।

সন্তোষ-সাধন।

সন্তোষ-সাধন আর অপরিগ্রহ-সাধন প্রায় তুল্য। তুষ্টি বা তৃপ্তির নামই সন্তোষ। বিষয়-ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই এই সন্তোষ লাভ করা যায়। "আমার কিছুরই অভাব নাই" নিয়ত এইরূপ দৃঢ়ভাবনা সহকারে বিচার-পরায়ণ হইলে সন্তোষ লাভ করা যায়। এ সংসারে আমার এই তুচ্ছ শরীরটা জীবিত রাখিবার জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহা অতীব সুলভ; গলিত বৃক্ষপত্রেও এ শরীর পুষ্ট হইতে পারে; নিয়ত এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্তোষ সাধন করিবে।

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।

সন্তোষ হইতে অত্যুত্তম সুখলাভ হয়! এই গুরুবাক্য অতীব সরল। ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

তপঃসাধন।

ভূত এবং ভবিষ্যৎ পাপের প্রায়শ্চিত্ত-সাধনের নাম তপঃ বা তপস্যা। তপস্যার জন্য কিঞ্চিৎ কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।

তুমি গতকল্য অতি-ভোজনরূপ পাপ করিয়াছ, তজ্জন্য অদ্যই হউক্ বা কল্যই হউক্, তোমাকে তাহার ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব সেই দুঃখ নিবারণের জন্য অদ্য তোমার উপবাসরূপ তপস্যা করা কর্ত্তব্য। এই তপস্যা করিলে তোমার ক্লেশ লঘু হইবে।

লোভ নিবৃত্ত করিয়া প্রত্যহ মিতাহার করিলে ভবিষ্যতে তোমার প্রায় কোন রোগই হইবে না এবং তজ্জন্য যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হইবে না। অতএব এই লোভ-দমন ও মিতাহারের নামই তপস্যা।

প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে তোমার শরীর গ্লানিযুক্ত হয়; অতএব তুমি যদি একাদশী তিথিতে উপবাস কর, তাহা হইলে দেখিবে তোমার সেই গ্লানি হইবে না। অতএব এই একাদশী-ব্রতকে তপঃসাধন বা তপস্যা বলা যায়।

আয়ুর্ব্বেদে ঋষিরা লিখিয়াছেন যে, বর্ষাকালে মনুষ্যের জঠরাগ্নি ও বল ক্ষীণ হয় এবং ত্রিদোষ (বায়ুপিত্তকফ) প্রকুপিত হয়। অতএব আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারি মাস ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও হবিষ্যান্নভোজী হইয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, নতুবা স্বাস্থ্য নষ্ট হইবেই হইবে। অতএব এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের নামই তপঃসাধন বা তপস্যা।

ফলতঃ, অশেষ কায়ক্লেশ নিবারণের জন্য যে সামান্য কায়ক্লেশ স্বীকার করা যায়, তাহারই নাম তপঃসাধন বা তপস্যা।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।

তপঃসিদ্ধ যোগী শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে স্বেচ্ছাধীনে পরিচালিত করিবার শক্তি লাভ করেন। সেই শক্তির মহিমা যে কত, তাহা বর্ণনাতীত। সম্যক্ বর্ণনা করিলে

তুমি বিস্মিত হইবে। কিন্তু এখন তাহাতে তোমার বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প বলিয়া তদ্বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যাহা হউক, তপস্যার ফল যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই তুমি যথেষ্ট মনে করিয়া তপঃসাধন করিবে। তপস্যার মহাফল এখন তোমার জানিবারও প্রয়োজন নাই।

স্বাধ্যায়-সাধন।

বেদাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়-সাধন। জগতে মনুষ্যের পক্ষে যাহা কিছু জানা আবশ্যক, তাহারই নাম বেদ। জগতে যে কিছু সত্যবাক্য আছে, তাহারই নাম বেদ। অতএব বেদাভ্যাস বা স্বাধ্যায়-সাধন কি, তাহা বুঝিয়া দেখ। স্বাধ্যায় ব্যতীত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। এবং জ্ঞান ব্যতীত দেবতাও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব আজীবন স্বাধ্যায়-সাধন অত্যাবশ্যক। ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানসমষ্টি বেদে সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব বেদ বলিলে মুনি-ঋষি-প্রণীত সমগ্র শাস্ত্রগ্রন্থই বুঝিতে হইবে। এই শাস্ত্র পাঠ করা আর জ্ঞানিগণের সহবাস করা বা সাধুসঙ্গ করা একই কথা। জ্ঞান ব্যতীত দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই। কিন্তু জ্ঞান বলিলে তুমি কি বুঝিবে? ইতর-সাধারণেরও কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞানকে যদি তুমি তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত মনে কর, তাহা হইলে তাহাতেও শ্রদ্ধা করিতে পার। আর যদি কূপ-মণ্ডূকের জ্ঞান তোমার পর্য্যাপ্ত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাহা হইলে তুমি অগাধ অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন সমাহিত ঋষিগণের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার পর্য্যবেক্ষণ করিবে। এইরূপে তুমি ক্রমশঃ ব্যাকরণ ও

কাব্যালঙ্কারের রসাস্বাদ ত্যাগ করিয়া সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিবে, এবং পরিশেষে উপনিষদ্ বা বেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিবে। এই উপনিষদ্ বা বেদান্তবাক্যই গুরুবাক্য জানিবে।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।

স্বাধ্যায়-সিদ্ধ যোগী ইষ্টদেবতার সন্দর্শন লাভ করেন।

ইষ্টদেবতা বলিলে কি বুঝায়, তাহা আমি তোমাকে কিরূপে এখন বুঝাইয়া দিব, তাহা স্বয়ং বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার ইষ্টদেবতা কে, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি না।

কাহারও ইষ্টদেবতা ধন, পদ, মান, সম্ভ্রম, বল, রাজ্যসম্পদ্ প্রভৃতি পার্থিব বিভব। কাহারও ইষ্টদেবতা শিব, দুর্গা, গণপতি প্রভৃতি। সুতরাং সকলের ইষ্টদেবতা সমান নহে। কিন্তু স্বাধ্যায়-সিদ্ধ যোগী স্বীয় ইষ্টদেবতাকে লাভ করেন, এ কথায় অবিশ্বাস করিও না। কেননা ইহা গুরুবাক্য।

অতএব স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন করিয়া তাহার ফললাভ করিতে হইলে স্বাধ্যায়-সাধন করিবে। এই স্বাধ্যায়-সাধনের নামই বাঞ্ছাকল্পতরু যোগ বা কল্পবৃক্ষ। ইহাঁরই নাম দেবমাতা সুরভি। ইহাঁরই নাম বেদমাতা গায়ত্রী।

ঈশ্বর-প্রণিধান-সাধন।

ঈশ্বর-প্রণিধান কি? এ প্রশ্নের উত্তর কি দিব, চিন্তা করিতেই মস্তক অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। তোমাকে

লইয়া বহু উচ্চে উঠিয়াছি। এ স্থান হইতে ঐ দেখ, পৃথিবীটাকে একটা সর্ষপবৎ ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হই-তেছে! কিন্তু তথাপি সেই ক্ষুদ্রতম সর্ষপেরও এতই মাধ্যা-কর্ষণশক্তি যে, আমরা আর এস্থানে তিষ্ঠিতে পারি না। আমাদের যেন নীচে না নামিলেই নয়। নামিতেই হইবে। কিন্তু নামিলেও ঈশ্বর-প্রণিধান কিরূপ, তাহা তোমাকে আর বুঝাইয়া দিতেও পারিব না। এ উভয়-সঙ্কটে আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। পৃথি-বীর প্রবল আকর্ষণে মস্তক ভারাক্রান্ত হইলে, আর কি উচ্চে অবস্থিতি করা যায়? কখনই যায় না। অতএব চল, নীচে নামিয়া চল, সেখানে গিয়া যথাবুদ্ধি ঈশ্বর-প্রণিধান কি, বুঝাইয়া দিতেছি।

ঈশ্বর-প্রণিধান বলিলে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ বুঝায়; অর্থাৎ ঈশ্বরকে মনোযোগের অবলম্বন করাকেই ঈশ্বর-প্রণিধান বুঝায়। কিন্তু ঈশ্বর কি? তাহা না জানিলে, তাহাতে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হয়। তজ্জন্য অগ্রে ঈশ্বর কি? ইহা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। অতএব শুন;—

ঈশ্বর।

ইষ্টদেবতার নামই ঈশ্বর। ইষ্টদেবতা কি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব এখন আবার বলিব কি? যদি বলিতে হয়, তবে শুন;—

ধনমানপদবল প্রভৃতি পার্থিব ঐশ্বর্য্য বা বিভবকেই কেহ ঈশ্বর বলেন। * কেহ শিব, কেহ দুর্গা, কেহ ব্রহ্মা,

* এই মতে কার্য্যকারণ অভিন্ন বলিয়া ঐশ্বর্য্য আর ঈশ্বর একার্থবাচক।

কেহ বিষ্ণু, কেহ খ্রীষ্ট, কেহ মহম্মদ, কেহ বুদ্ধ, কেহ জিন, কেহ রাম, কেহ বা শ্যামকে ঈশ্বর বলেন। এই অসংখ্য ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অসংখ্য শাস্ত্রে ও দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—চার্ব্বাকদর্শনে ধনমানপদবল প্রভৃতি পার্থিব ঐশ্বর্য্যের নামই ঈশ্বর। আধুনিক অধিকাংশ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কৃত দর্শনশাস্ত্র উক্ত চার্ব্বাকদর্শনেরই শাখাপল্লব।

অতএব প্রত্যেকেরই ঈশ্বর স্বতন্ত্র বা একমেবাদ্বিতীয়ম্। আবার এই সমস্ত ব্যষ্টি ঈশ্বরের সমষ্টিও একমেবাদ্বিতীয়ম্।

শৈবদর্শন প্রভৃতিতে শিবাদি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব তোমার ইষ্টদেবতাকেই তুমি ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ কর। তুমি চাও কি? এই প্রশ্নের যদি উত্তর দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার ঈশ্বর কে, নিরূপণ করিয়া দিতে পারি। তুমি যমনিয়মসাধনে মনের একাগ্রতা লাভ করিয়া, সেই একাগ্রতাসহকারে তোমার ইষ্টদেবতার ধ্যান বা প্রণিধান কর। * তাহা হইলেই তোমার সিদ্ধি-লাভ হইবে। যেহেতু ভগবান্ পরম ঋষি বলিয়াছেন,—

সমাধি-সিদ্ধিরীশ্বর-প্রণিধানাৎ।

ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সমাধি-সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ যোগ-

* ধ্যান বা প্রণিধান কিরূপ, ইহা নবপ্রসূতা গাভীর নিকট শিক্ষা পাইতে পার। পরম সাধক সাধু তুলসীদাস বলিয়াছেন,

"তুলসী য্যাসা ধেয়ান্ ধর্ য্যাসা বিয়ান্ কা গাই।
মু মে তৃণ চাপা টুটে ঔর চেৎ রাখয়ে বাছাই॥"

নবপ্রসূতী গাভী তৃণাদি ভক্ষণের সময়ও স্বীয় বৎসের প্রতিই একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ একাগ্রতার নামই ধ্যান। এই ধ্যানের বিষয় পরে লিখিত হইবে।

সাধনের চরম ফল লাভ করা যায়। যিনি যে কোন ঈশ্বরের প্রণিধান করুন্, সকলেরই চরম উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখ-নিবৃত্তি। অতএব যোগসাধনে সেই ফল লাভ করা যায়। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

যাহা হউক্, সকলের সুখদুঃখবোধ সমান নহে। তজ্জন্য সকলের সাধনাও সমান নহে। কুকুর একমুষ্টি অন্ন পাইলেই সুখী হয় বা একখণ্ড মাংস পাইলেই তৃপ্তি-বোধ করে, হাতী একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের সমস্ত পল্লব ভক্ষণ করিলে সুখবোধ করে। মনুষ্যদিগের মধ্যেও প্রবৃত্তি অনুসারে তদ্রূপ সুখের তারতম্য আছে।

অতএব তুমি স্বীয় প্রবৃত্তির পরীক্ষা করিয়া দেখ, কি পাইলে তুমি সুখী হও। তৎপরে তোমার ঈশ্বরকে তুমি খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার প্রণিধানে সমাহিত অর্থাৎ মনোযোগী হও। তাহা হইলেই তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে।

কিন্তু তোমাকে যখন যোগ-সাধনের কথা বলিতেছি, তখন উচ্চ যোগসাধনের অবলম্ব্য ঈশ্বর কিরূপ, অর্থাৎ যোগ-দর্শনের ঈশ্বর কিরূপ, তাহাও না বলিলে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। অথচ এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, সমাহিত নিরুদ্ধচিত্ত যোগী, ব্রহ্মপদেরও প্রার্থী নহেন। সুতরাং তদ্রূপ যোগীর ঈশ্বর কিরূপ, তাহা তোমাকে বলাও বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি ভগবান্ পরম ঋষি কি বলিয়াছেন, শুন ;—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাদৃশ পুরুষই ঈশ্বরপদবাচ্য।

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।

সেই ঈশ্বর নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ। অর্থাৎ তাঁহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান অন্য কোন পুরুষে নাই। তিনি পূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ।

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।

তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তাদিগেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, অর্থাৎ তিনি অনাদি অনন্তকাল বিদ্যমান আছেন এবং বিদ্যমান থাকিবেন। ব্রহ্মাদি দেবতাদেরও জন্ম ও বিনাশ আছে, কিন্তু এই পরমেশ্বরের জন্ম এবং বিনাশ নাই।

কিন্তু উল্লিখিত ঈশ্বর তোমার প্রণিধানের অতীত। উক্ত ঈশ্বর সংসার-বিরাগী পরম যোগীর পরমধন এবং পরমধ্যেয়। এই ঈশ্বর-প্রণিধানের জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য উভয়বিধ সাধনই আবশ্যক। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বৈরাগ্য সাধন তোমার আবশ্যক নহে। * অতএব এই ঈশ্বর তোমার ধ্যেয় নহে কেন, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য আমার জীবনের একদিনের একটী প্রত্যক্ষ ঘটনার বিষয় বলি শুন;—

অনেক দিনের কথা, আমি এক সময় এক বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলাম। সেই সময় বন্ধুর একটী অষ্টমবর্ষীয় খুল্লপিতৃব্য-

---

* "মোক্ষসাধন" নামক গ্রন্থান্তরে এই ঈশ্বরানুধ্যানের বিষয় সম্যক্ বিবৃত হইবে।

পুত্র একটা অস্বাভাবিক দন্তের যন্ত্রণায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল। দন্তটী দুইটী মূলবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্মাগ্র হইয়া ঊর্দ্ধমুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল; তাহাতে দন্তাবরক চর্ম্ম ক্রমশঃ ছিন্ন বা ভিন্ন হইতেছিল। কিছু খাবার জন্য মুখ নাড়িলেই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ হইতেছিল। এই কারণে উক্ত বন্ধুর পিতাঠাকুর মহাশয় উক্ত বালকটীকে কলিকাতায় আনিয়া মেডিকেল কলেজের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক (সার্জ্জন ডাক্তার) সাহেব দ্বারা দন্তটী উৎপাটিত করিয়া লইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় আসিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন।

বালকটী পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসে নাই। কলিকাতার অপূর্ব্ব কাহিনী কিছু কিছু শুনিয়াছিল মাত্র। সুতরাং কলিকাতা দেখিবার উৎসাহ ও আগ্রহ তাহার যন্ত্রণার লাঘব করিয়াছিল। সেই জন্যই বালক পীড়িত হইয়াও ইতস্ততঃ আমোদে বেড়াইতেছিল।

পূর্ব্বাহ্ন বেলা ৮টার সময় গ্রামের নাপিত ক্ষৌরকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের * বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়াগাঁয়ের নাপিত মহাশয়েরাও যে এক এক জন সার্জ্জন, তাহা বোধকরি তোমার অবিদিত নহে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাপিতকে ছেলের দাঁতটী দেখিতে বলিলেন, কিন্তু কলিকাতায় যাইয়া যে দাঁতটী সাহেব সার্জ্জন দ্বারা উঠাইয়া লইতে হইবে, এ কথাও ছেলের সাক্ষাতে নাপিতকে বলিলেন। ছেলেটী নাপিতকে

* আমার বন্ধু মুখোপাধ্যায়।

দাঁত দেখাইতে কিছুমাত্র সন্দেহ বা ভয় করিল না। নাপিত দন্তটী একটু ভাল করিয়া দেখিল, পরে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই দাঁতটী তুলিয়া ফেলিল। আমরা সকলে দাঁতটী দেখিয়া অবাক্ হইলাম। নাপিত কখন যে অস্ত্র গ্রহণ করিল, তাহা দেখিবারও আমরা অবকাশ পাই নাই। কেননা নাপিত যে অস্ত্র লইয়া দাঁত তুলিয়া দিবে, ইহা আমাদের জানা ছিল না; সুতরাং আমরা তদ্বিষয়ে তাহার চেষ্টার প্রতিও মনোযোগ দেই নাই।

উৎপাটিত দন্তটী দেখিয়া আমাদের সকলেরই অশেষ আনন্দের উদয় হইল। আমরা নাপিতের দক্ষতা দেখিয়া তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যে বালক দন্তের জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, সে দন্তটী উৎপাটিত দেখিয়াই চীৎকার ধ্বনি করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমরা সকলেই মনে করিলাম, দাঁতটী তুলিয়া দেওয়াতে বালকের মুখে আঘাত লাগিয়াছে, বিশেষতঃ শোণিত নির্গত হইতেছে দেখিয়াই বালক অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। সকলে তাহার মুখে জল দিবার জন্য ব্যস্ত হইল; তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। কিন্তু বালক জলও মুখে দিল না, কাহারও সান্ত্বনাও শুনিল না! সে মাটীতে অনবরত গড়াগড়ি দিয়া কাটা কবুতরের মত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল! সকলেই বালকের সান্ত্বনার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইল। কিন্তু কাহার সাধ্য যে বালককে শান্ত করে? বালক শেষে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"আমি ক'ল্‌কাতায় যাবো !!!"

এই কাতরধ্বনি শুনিয়াই আমরা বালকের মর্ম্মবেদনার কারণ বুঝিতে পারিলাম। তখন আমরা সকলেই দুষ্ট নাপিতকে যথোচিত তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলাম। এই দুষ্ট নাপিতের জন্যই বালকের কলিকাতায় আসিয়া দেখাশুনার আশা-ভরসা সমস্ত নিঃশেষিত হইয়াছিল। সেই জন্যই বালক হতাশপ্রাণে "আমি ক'ল্‌কাতায় যাবো।" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন তাহাকে, কলিকাতায় যাওয়া হইবে বলিয়া নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করা হইল। সেই আশ্বাসে বালক স্থির হইল এবং আবার আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

যোগদর্শনের ঈশ্বরও ঠিক্ এই দুষ্ট নাপিতের মত। এই ঈশ্বর আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের অস্বাভাবিক দন্ত উৎপাটিত করিয়া দিয়া, আমাদের সকল আশা-ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া দিতে পারে। আমরা আশা করি, পর্য্যটন করিয়া যেখানে যাহা কিছু আশ্চর্য্য আছে, সমস্ত দেখিব; যেখানে যাহা কিছু বাহাদুরি আছে, তাহাও দেখিব এবং আমাদেরও বাহাদুরি যথাসাধ্য দেখাইব। আমরা দিল্লী যাইব এবং "দিল্লীকা লাড্ডু" খাইব, ইহা আমাদের প্রাণের প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা! আমরা দিগ্বিজয়ী বীর হইব, দিগ্বিজয়ী বক্তা হইব, আর কত কি হইব, তাহার সীমা সংখ্যা নির্দ্দেশ কি করিব? কিন্তু ঈশ্বর ঠিক্

দুষ্ট নাপিতের মত আমাদের সকল আশা, সকল ভরসা, সকল আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করিয়া দিতে পারেন !!!

এই কারণেই এই দুষ্ট নাপিতকে আমাদের বাড়ীতে আসিতে দিতেও আমার ইচ্ছা হয় না; দাঁত দেখান ত দূরের কথা !!

অতএব তুমি অগ্রে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া তবে ঈশ্বর-প্রণিধান করিও। যোগীর ধ্যেয় ঈশ্বর তোমার নিকটে একবারমাত্র আসিলেই কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ হইবে! তোমার সকল আশা—সকল ভরসা—সকল আকাঙ্ক্ষা তিরোহিত হইয়া যাইবে। আর কাশী-গয়া, বিলাত-বৃন্দাবন ও আমেরিকা-দ্বারকা দেখা হবে না। আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, দার্শনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান দেখা হবে না !! আর নিজের বিদ্যাবুদ্ধিও দেখান হবে না! সঙ্ক্ষেপতঃ, আর "দিল্লীকা লাড্ডু" খাওয়া হবে না। সব যাবে! সবই মাটী হবে !! সর্ব্বনাশ হবে !!!

আমি যে উল্লিখিত কথাগুলি কল্পনা করিয়া বলিলাম, তাহা মনে করিও না। গুরুবাক্য বা বেদবাক্যও ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, শুন;—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

সেই পরাবর ঈশ্বরকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করিলে, হৃদয়-গ্রন্থি (বিষয়-বাসনা বা আশা-আশ্বাস-আকাঙ্ক্ষা) ভিন্ন হইয়া যায়; সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়া যায় (জ্ঞাতব্য কিছুই

থাকে না), এবং সর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষয় হয় (ক্লেশমূলক বা অবিদ্যা-মূলক সমস্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তি নষ্ট হয়)। যদি ইহ অপেক্ষা সরলার্থ শুনিতে চাও, তবে শুন ;—

পরাবর শব্দে যে "পরামাণিক" বুঝায় এ কথা আর কি বলিব ? অতএব, উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা এইরূপ,—

সেই পরামাণিক ঈশ্বরকে দেখিলেই হৃদয়-গ্রন্থি (দাঁতের গোড়ার বাঁধন) ভিন্ন হইয়া যায়, সর্ব্বসংশয় (কলিকাত্তা-দর্শনের আশা-ভরসা) ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সকল কর্ম্মের ক্ষয় হয় (সর্ব্বনাশ হয়! কোন কাজ করিতে আর ইচ্ছা থাকে না, কাহারও কথা ভাল লাগে না, কেবল ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে ইচ্ছা হয়)!

অতএব অগ্রে হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, যোগীর ধ্যেয় ঈশ্বরের প্রণিধান কর্ত্তব্য নহে। কেননা তাহাতে ইতোনষ্টস্ততঃভ্রষ্ট হইতে হয় ; অর্থাৎ একূল ওকূল দুই কূল হারাইতে হয়। যাহা হউক, সময়ান্তরে মোক্ষসাধন-প্রকরণে এই মহাযোগীর আরাধ্য দেবতার সাধন-প্রক্রিয়া যথাসাধ্য বলিব। তখন সেই সাধনার ফলও সম্যক্ ব্যক্ত করিব। এখন তোমার সে মহাফলের প্রয়োজন নাই।

অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের যম ও নিয়ম সাধন বিবৃত হইল। অতঃপর আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির বিষয় বিবৃত হইতেছে, শুন ;—

আসন।

শরীর চঞ্চল হইলে মনও চঞ্চল হয়, অথবা মন চঞ্চল

হইলে অনেক সময় শরীরও চঞ্চল হয়। শরীরের চাঞ্চল্য নিবারণের জন্য আসন অভ্যাস করা আবশ্যক।

স্থিরসুখমাসনম্।

যেরূপে বসিলে শরীর স্থির থাকে এবং মনেও সুখ হয়, তদ্রূপে বসিতে অভ্যাস করিবে। শরীরের মেরুদণ্ড বক্র করিয়া বসিবে না। বসিয়া শরীর দোলাইবে না। অনেক ছাত্র বেঞ্চিতে বসিয়া পা দোলাইয়া থাকেন এবং পড়িবার সময় শরীর দোলাইয়া থাকেন, ইহা অতি কদভ্যাস। প্রত্যহ ঠিক্ একভাবে বসিতে অভ্যাস করিলে কিছু দিনের মধ্যেই আসনসিদ্ধি হয়। সেই আসনে বসিয়া যে কোন বিষয়ের অনুধ্যান করিলে তাহাতে সহজে একাগ্রতা জন্মে। আসন সম্বন্ধে এখানে অধিক বক্তব্য নাই। মহাযোগীর যোগাসন তোমার অনাবশ্যক। কিন্তু মনে করিও না যে, সে আসন তোমার দুঃসাধ্য। যম-নিয়ম সাধনে কিঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইলে তোমার পক্ষে সেই যোগাসনও অনায়াস-সাধ্য হইবে। তবে এখানে অনাবশ্যক বলিয়াই সে সকল আসনের বিষয় উল্লেখ করা হইল না।

প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম কাহাকে বলে? যোগশাস্ত্রে তাহা এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা ;—

শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক গতিবিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম। প্রাণকে আয়ত্ত বা বশীভূত করাই এই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য।

কিন্তু শরীরের বীর্য্য বা ওজঃ প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রাণকে আয়ত্ত করা অসাধ্য। ধৃতবীর্য্য বালকের পক্ষেও প্রাণ সহজে আয়ত্ত। বালক অনবরত দৌড়াদৌড়ি করিয়াও হাঁপাইয়া মরে না। কিন্তু স্খলিত-বীর্য্য ব্যক্তি প্রাণায়াম করিতে গেলে তাহার শ্বাসকাসযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই যমালয়ে গমন করিতে হয়। বীর্য্যস্খলনের পরেই যে প্রাণ অস্থির হয়, ইহা বলা অনাবশ্যক। অতএব অব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রাণায়াম-সাধন অসাধ্য এবং অনুচিত।

বিষয়-বিরাগী যোগীরা যে প্রণালীতে রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামক প্রাণায়াম সাধন করেন, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাণায়াম করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। কেননা তাহাতে উপকারের অপেক্ষা গৃহীর পক্ষে অধিকতর অপকারের সম্ভাবনা। আফিম্, মর্ফিয়া বা ক্লোরোফর্ম্ম সেবন করিলে যে ফল লাভ হয়, গৃহীর পক্ষে উক্ত প্রকার প্রাণায়াম তদপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহে। ফলতঃ জানিয়া রাখ যে, উক্ত প্রকার প্রাণায়াম শরীর ও মনের অবসাদক। উহা এক পক্ষে যেমন কাম-ক্রোধাদি রিপুদমনের সহায়তা করিয়া একাগ্রতা জন্মাইতে পারে, তেমনই অন্য পক্ষে শরীর ও মনকে নিতান্ত অবসন্ন ও অলস করিয়া ফেলে। সাংসারিক কার্য্যপ্রবৃত্তি বা উদ্যম-উৎসাহ তিরোহিত করে। সেই জন্য ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-তৎপর গৃহস্থের পক্ষে উক্ত প্রাণায়াম সহজসাধ্য হইলেও উহা অভ্যাস করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ

বিষয়-বিতৃষ্ণ যোগীর পক্ষে যে প্রাণায়াম যোগসাধনের ব্রহ্মাস্ত্র তাহা বিষয়-তৃষ্ণ যোগীর ব্যবহার্য্য নহে।

বিরাগী যোগী প্রাণায়াম-সাহায্যে সহজেই যে মহাধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, মহাসমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন, মহারণ্যের সিংহব্যাঘ্রাদির গর্জ্জন, মহাযুদ্ধের সহস্র কামানের ধ্বনি, অথবা মহামেঘের সহস্র বজ্রধ্বনি, সেই ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে না। তোমার তাদৃশ একাগ্রতার প্রয়োজন কি? তদ্রূপ ধ্যানেরই বা প্রয়োজন কি? ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাযোগীর ইষ্ট দেবতা হইতে তোমার ইষ্টদেবতা স্বতন্ত্র। স্মতরাং তোমার সাধনাও মহাযোগীর সাধনা হইতে স্বতন্ত্র। অতি সামান্য একাগ্রতা দ্বারাই তোমার ইষ্ট-দেবতা প্রসন্ন হইয়া তোমার স্বাভিলষিত বর প্রদান করিবেন। অতএব তোমার পক্ষে কিরূপ প্রাণায়াম কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি শুন ;—

এই বঙ্গদেশে একটী চলিত কথা আছে যে, "দৌড়ান অপেক্ষা দাঁড়ান ভাল, দাঁড়ান অপেক্ষা বসা ভাল, বসা অপেক্ষা শোওয়া ভাল।" এই চলিত কথাটী বঙ্গবাসীদিগের আন্তরিক আলস্যের বা তমোগুণের পরিচায়ক। এই তমোগুণের জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বজাতির অপেক্ষা বাঙ্গালি অকর্ম্মণ্য জাতি। অতএব প্রাণায়াম-সাধন দ্বারা এই তমোগুণ দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ উক্ত বাক্যের ঠিক্ বিপরীত আচরণ করাই কর্ত্তব্য। উক্ত বাক্যই স্বাভাবিক প্রাণের গতি প্রমাণ করিতেছে; স্মতরাং সেই স্বাভাবিক প্রাণগতির বিচ্ছেদরূপ প্রাণায়াম করাই কর্ত্তব্য। স্মতরাং

"শোওয়া অপেক্ষা বসা ভাল, বসা অপেক্ষা দাঁড়ান ভাল, দাঁড়ান অপেক্ষা দৌড়ান ভাল।" ইহাই তোমার প্রাণায়ামের প্রকৃত প্রণালী। এই প্রণালীই তোমার অবলম্ব্য।

অতএব প্রাণায়াম সাধনের জন্য তুমি সাবধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দৌড়ান অভ্যাস কর। এই দৌড়ান অভ্যাস করিলেই প্রাণায়াম তোমার সহজ হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে এবং সন্ধ্যাকালে প্রশস্ত প্রান্তরে বা নদীতীরে অর্থাৎ বিশুদ্ধ-বায়ু-সঞ্চালিত স্থানে ক্রমাগত দৌড়িতে অভ্যাস কর। এইরূপে তোমার প্রাণ আয়ত্ত বা বশীভূত হইবে। ইহাতে তুমি সাংসারিক অশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবে এবং গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে, তখন মহাযোগীর প্রাণায়ামও তোমার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

ধাবন-রূপ প্রাণায়ামের মহাফল বর্ণনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। অতএব এখানে তাহা বর্ণনা করা অভিপ্রেত নহে। সংক্ষেপে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, **এই প্রাণায়াম সংসারী যোগীর যোগসাধনের ব্রহ্মাস্ত্র।** এতদ্দ্বারা সাংসারিক সর্ব্ব-বিধ অভিলষিত সিদ্ধ হয়। এই প্রাণায়াম-ফল, ক্ষত্রিয়ের পরম সম্বল এবং বৈশ্যেরও পরম সম্পত্তি। গ্রন্থান্তরে ইহার মাহাত্ম্য সম্যক্ বিবৃত হইবে।

সংসারে থাকিয়া বালকদের আনন্দজনক ক্রীড়াকুর্দ্দনে ঠিক্ বালকের ন্যায় হইয়া যোগদান কর। বালকের

নিকট আনন্দ এবং উৎসাহ শিক্ষা কর, এবং জ্ঞান-বৃদ্ধ সাধু বৃদ্ধগণের নিকট বৈরাগ্য শিক্ষা কর। ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চিত্তবৃত্তি দুই প্রকার; ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা। যে সকল চিত্তবৃত্তি ক্লেশপ্রদ তাহা ত্যাগ কর। কিন্তু যেগুলি ক্লেশপ্রদ নহে, বরং আনন্দপ্রদ, সেগুলি ত্যাগ করিও না। তবে আনন্দপ্রদ বিষয়েও একান্ত আসক্ত হইবে না; তজ্জন্যই বৈরাগ্য শিক্ষা আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্য্য ও প্রাণায়াম দ্বারা শরীর নীরোগ ও বলশালী হইলে এবং সমগ্র ইন্দ্রিয় সতেজ হইলে, তোমার মনও ঠিক্ বালকের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে এবং তুমিও তখন ঠিক্ বালকের ন্যায় এই জগৎ নন্দনকাননবৎ নিরীক্ষণ করিবে। ফলতঃ একমাত্র নারকীয় অশেষ ক্লেশমূলক কামসুখ ত্যাগ করিলে, তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। বালকেরা সহজ-ব্রহ্মচারী বলিয়াই আনন্দ এবং উৎসাহ উপভোগ করে। কিন্তু বালকেরা অজ্ঞান বলিয়া, অশেষ ক্লেশও ভোগ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি-অনুসারে যদি দুষ্ট পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহাদের ক্লেশের সীমা থাকে না। সেইজন্য অনেক বালক, অমৃতের অধিকারী হইয়াও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব অজ্ঞানতা ও দুষ্কৃতির জন্য বালকেরা প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে পারে না। তুমি যমনিয়মসাধনে চিত্তমল পরিষ্কৃত করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করতঃ যদি পুনরায় বালক হইতে পার, তাহা হইলে তোমারই পক্ষে প্রকৃত স্বর্গীয় সুখ সুলভ হইবে।

অনেকেই স্ব স্ব বাল্যাবস্থার সুখ স্মরণ করিয়া বলিয়া থাকেন, "আহা! বাল্যকাল কি সুখের!" বাল্যকালের দুঃখের কথা তাঁহাদের স্মরণ থাকে না। আর একথাও তাঁহাদের স্মরণ থাকে না যে, আমরা যোগ-সাধন দ্বারা বৃদ্ধাবস্থাতেও সেই বাল্যসুখ অপেক্ষা শতগুণ বিশুদ্ধ সুখ উপভোগ করিতে পারি। ব্রহ্মচারীর নয়নে এই জগতের অতি তুচ্ছ বস্তুও যেন অমৃতসিক্ত বোধ হয়। প্রতি পত্রে প্রতি পুষ্পে যেন অনন্ত প্রেমতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও প্রাণায়ামের ফল আর অধিক কি বলিব।

এখানে সহজেই মনে হইতে পারে যে, কামত্যাগ করিলে সংসার-স্রোত এককালে রুদ্ধ হইয়া যায়, কাহারও সন্তানাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সংসারীর পক্ষে কামত্যাগ বা ব্রহ্মচর্য্য-সাধন নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা। এই আপত্তির জন্যই 'কাম' ত্যাগ করিতে বলা হয় নাই; 'কামসুখ' ত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কাম-ত্যাগ আর কামসুখ ত্যাগ একই কথা নহে। সুখের জন্য কামরিপুকে আহ্বান করিও না। রিপু কখনই সুখদায়ক নহে। তবে রিপু দ্বারাও কার্য্য সাধন করা যায়; সাংঘাতিক সর্পবিষ ইহার দৃষ্টান্ত। পুত্র-জনন জন্য ভগবান্ মনুর বা অন্যান্য সংহিতাকারদিগের ব্যবস্থা তিলমাত্র অতিক্রম করিয়াও স্ত্রীসহবাস করা কর্ত্তব্য নহে। তদ্রূপ ব্যবস্থা অনুসারে স্ত্রীসহবাস করিলেও গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয়। 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধন' নামক পুস্তকে মন্বাদি স্মৃতি-সংহিতাকারদিগের ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইবে।

প্রত্যাহার।

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্ব বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করাকে (ফিরাইয়া আনাকে) প্রত্যাহার বলে।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাম্প্রত্যাহারঃ।

ইন্দ্রিয়গণ মনের দ্বার স্বরূপ। ইন্দ্রিয় দ্বারা মন বিষয় ভোগ করে। যদি ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া বা রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে মন অগত্যা ধ্যেয় বিষয়েই স্থির থাকিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত যমনিয়মাদি সাধন দ্বারাই এরূপে মনকে সংযত বা একাগ্র করিবার শক্তি জন্মে। অন্যথা মনকে বা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত বা রুদ্ধ করা অসাধ্য। ফলতঃ অভ্যাস দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা যায়; কিন্তু সেই অভ্যাস যমনিয়মাদি সাধনেরই অন্তর্ভুক্ত। চিত্তের একাগ্রতা সাধন আর প্রত্যাহার একই কথা। অতএব এ স্থানে প্রত্যাহারের বিষয় অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।

প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত বশীভূত হয়।

ধারণা-ধ্যান-সমাধি।

অতঃপর অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটী বিষয় বলিতে বাকি আছে। এই তিনটী যোগ-

সাধনের অন্তরঙ্গ ; এবং পূর্ব্বোক্ত যম-নিয়মাদি পাঁচটী যোগ-সাধনের বহিরঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সহিত কেবল অন্তঃকরণেরই সম্বন্ধ আছে ; বাহ্য দেহের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই। মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিনের সমবায়কে অন্তঃকরণ বলে। মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিনটী চিত্তেরই বিভিন্ন অবস্থা-মাত্র। সত্ত্বপ্রধান চিত্তই বুদ্ধি, রজস্তমঃ-প্রধান চিত্তই মন, আর "আমি-আমার" এইরূপ বোধকে অহঙ্কার বলে। যম-নিয়মাদি সাধনে চিত্তমল দূরীভূত হইয়া যখন সেই চিত্তে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, তখনই বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা ধীশক্তি জন্মে ; সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গণ বা তাহাদের রাজা মনও সেই ধীশক্তির অধীন হইয়া থাকেন। মন যখন বুদ্ধির অধীন হয়, তখন বুদ্ধি অনায়াসে সেই মনকে বা চিত্তকে ধ্যেয় বিষয়ে বন্ধন করিয়া বা সংযুক্ত করিয়া রাখিতে পারে। চিত্তকে এইরূপে কোন ভাব্যবিষয়ে (ধ্যেয় বিষয়ে) বন্ধন করার নামই ধারণা। যথা ;—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।

চিত্তকে দেশ-বিশেষে (ধ্যেয় বা ভাব্য বিষয়ে) বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা। ফলতঃ বুদ্ধি বা ধীশক্তিতে ধ্যেয় বিষয় ধারণ করার নামই ধারণা।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

ধারণা যদি একতানতা বা ধারা-বাহিকতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি যদি বহুক্ষণ ব্যাপিয়া কোন ধ্যেয় বিষয় ধারণ

করিয়া থাকে, তবে তাহাকেই ধ্যান বলে। ফলতঃ অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক ধারণার নামই ধ্যান।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।

অর্থাৎ সেই ধ্যান যখন কেবল ধ্যেয় পদার্থকেই উদ্ভাসিত করিবে, 'আমি ধ্যান করিতেছি' এ জ্ঞানও যখন লুপ্ত হইবে, তখনই তাহা সমাধি আখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

ধ্যানপ্রভাবে চিত্ত যখন অহঙ্কারকেও ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা যখন অহঙ্কার-বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, তখন একমাত্র ধ্যেয় পদার্থই বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত হয়। এই অবস্থার নামই সমাধি বা একাগ্রতার চূড়ান্ত অবস্থা! ইহারই অপভ্রষ্ট আখ্যা মনোযোগ। *

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একত্র হইলেই তাহাকে সংযম বলে। ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে করিতে যখন অত্যল্প ক্ষণমধ্যেই ধ্যেয় বস্তুকে ধারণা করিয়া সমাহিত হইবার শক্তি জন্মে, তখনই সেই শক্তি সংযম আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।

সেই সংযম যখন আয়ত্ত হয়, তখনই প্রজ্ঞালোক (বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক) লব্ধ হয়। এই প্রজ্ঞালোকের প্রভাব বর্ণনা করা অসাধ্য।

---

* সমাধি বাস্তবিক মনোযোগ নহে। ইহাকে বুদ্ধিযোগ বলিলেও বলা যায়। মনোযোগ এবং বুদ্ধিযোগে স্বর্গমর্ত্ত প্রভেদ। মনোযোগ দ্বারা সামান্য স্মরণশক্তির বৃদ্ধি হয়; বুদ্ধিযোগে ঐশীশক্তি বা অলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়।

সংযমসিদ্ধ যোগী সঙ্কল্পমাত্রেই † প্রায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। তদ্রূপ ঐশীশক্তি লাভ করিয়াই যোগীরা এককালে আত্মবিস্মৃত হইয়া "সোঽহং" আমিই সেই ঈশ্বর ; এইরূপ অনুভব করেন। ফলতঃ সংযমসিদ্ধ যোগীর পক্ষে এরূপ অনুভূতি সহজেই হইতে পারে। যিনি সঙ্কল্পমাত্রেই একমুষ্টি ধূলি নিক্ষিপ্ত করিয়া সাধারণজনের বিস্ময়কর ও মোহজনক বহুজনসমাকীর্ণ রাজপুরীর সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে উল্লিখিত অনুভূতি নিতান্ত দোষার্হ নহে। যাহা হউক, এস্থলে ইহাও বলা নিতান্ত আবশ্যক যে, সংযমসিদ্ধ যোগীরা যতই ঐশ্বর্য্য লাভ করুন, সে ঐশ্বর্য্য অনন্ত ঐশ্বর্য্য নহে। ফলতঃ তাহাও অনন্ত ঐশ্বর্য্যের বিন্দুমাত্র ঐশ্বর্য্য। অনন্ত পয়োনিধির তুলনায় বারিবিন্দু যেমন, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের তুলনায় সে ঐশ্বর্য্যও তদ্রূপ। অতএব তাঁহারা ঈশ্বর হইলেও পরমেশ্বর নহেন।

এতক্ষণে স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা প্রায় সমস্তই বলা হইয়াছে। অতঃপর আনুষঙ্গিক কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে।

নাস্তিকতা ও আস্তিকতা।

যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে যোগী হইতে পারেন না, তাহা নহে। মহর্ষি ভগবান্

† যোগানুসন্ধিৎসু আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংযম এবং সংকল্পকে যথাক্রমে Concentration of the mind and Willforce বলেন।

কপিলদেব "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও স্বয়ং যোগপ্রভাবে ঈশ্বররূপে জগৎপূজ্য হইয়াছেন। ফলতঃ যম-নিয়ম-সাধনের অন্তর্গত ঈশ্বর-প্রণিধান পরিত্যাগ করিয়াও সংযম-সিদ্ধি লাভ করা যায়। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ বা বিস্ময়ের বিষয় নাই। চিত্তমল পরিহার করিয়া অর্থাৎ উদ্বেগ বা চিত্তবিক্ষেপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, তুমি গাছ পাতর মানুষ বা দেবপ্রতিমা প্রভৃতি যে কোন বস্তুতে সংযম অভ্যাস করিবে, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। অর্থাৎ তুমি চিত্তকে সংযত করিয়া যে কোন সঙ্কল্প করিবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধান পরিত্যাগ করিলে তুমি চিত্তমল পরিষ্করণের একটী প্রশস্ত উপায় পরিত্যাগ করিবে; তাহাতে যোগসাধন তোমার পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য হইবে। অধিক কি, নিতান্ত কলুষিতচিত্ত দুর্ব্বলের পক্ষে নিরীশ্বরযোগ একান্তই অসাধ্য। এই সম্বন্ধে একটী সামান্য উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারিবে ;—

ঐ দেখ, এক ব্যক্তি রিক্তপদে সমাজস্থ প্রতিবেশি-জ্ঞাতিকুটুম্ব ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুনেত্রে বলিতেছে, "আমি মাতৃদায়গ্রস্ত, আপনারা কৃপা করিয়া অধমের ভবনে পদার্পণ করিয়া আমায় উদ্ধার করিবেন।" ঐ ব্যক্তিকে চেন কি? উনি একজন উচ্চপদস্থ ধনিসন্তান, আজ কয়েক দিবস পূর্ব্বে উনি ধনমদে, পদমদে ও যৌবনমদে নিতান্ত

মত্ত হইয়া অন্যের কথা দূরে থাক, স্বীয় জননীকেও গ্রাহ্য করিতেন না! আজ সহসা উহাঁর এই ভাব দেখিয়া যুগান্তর উপস্থিত বলিয়া তোমার কি বিস্ময় জম্মে না? পাষণ্ডের দুর্দ্দর্শ মূর্ত্তি আজ এমন কমনীয়তা ধারণ করিল কেন? পাষণ্ডের মদগর্ব্বিত দুর্দ্ধর্ষ মন আজ এমন বিনীতভাব ধারণ করিল কেন? সমাজের ভয়ে? রাজভয়ে? ধর্ম্মভয়ে? না—না—না।

মাতার কুসন্তান মাতৃ-বিয়োগে আজ মাতৃ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে। তাহার কলুষিত চিত্তের অন্তস্তর-নিহিত মাতৃ-ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার চিত্তমল দূরীকৃত করিয়াছে! তাই সে আজ পরম ব্রহ্মচারীর কমনীয়তা ও নমনীয়তা ধারণ করিয়াছে! অতএব ভক্তির শক্তি বুঝিয়া দেখ। এই ভক্তিকেই যদি ধর্ম্মসাধনের বা যোগসাধনের প্রধান সাধন করিয়া ভক্তিভাজনকেই সংযমের লক্ষ্য করা যায়, তবে কিরূপ মহাফল কত সহজে লাভ করা যায়, তাহাও বুঝিয়া দেখ। অতএব মাতাপিতা-গুরু প্রভৃতিকে জীবন্ত দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করিলেও লোকে যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। সুতরাং যিনি মাতার মাতা, পিতার পিতা, এবং গুরুর গুরু, সেই পরাৎপর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সাধন করিয়া লোকে যে অতি সহজেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভগবান্ কপিল "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়াছেন বলিয়া যেন মনে করিও না, "ঈশ্বর নাই।" "ঈশ্বর নাই" একথা বলা

ভগবানের উদ্দেশ্য নহে ; যদি তদ্রূপ উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তিনি বলিতেন, "ঈশ্বরাভাবাৎ" অর্থাৎ "যেহেতু ঈশ্বর নাই।"

কপিলদেব স্বীয় সাধন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠার জন্যই পর-পক্ষযুক্তির খণ্ডনার্থ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ তোমরা ঈশ্বর আছেন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে না, অতএব তোমাদের কল্পিত ঈশ্বর অসিদ্ধ। কপিল-দেবের অভিপ্রায় এইরূপ যে, মুক্তিসাধন বিষয়ে ঈশ্বরকে অবলম্বন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর নাই, একথা বলা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। ফলতঃ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র যদি বলেন "আমি পিতৃধনের প্রত্যাশা করি না, স্বকীয় ক্ষমতায় আমিই ধনোপার্জ্জন করিব।" তাহা হইলে পুত্রকে কেহ কি পিতার অব-মাননাকারী বা অস্বীকর্ত্তা বলিবে? "সংসারে আমি পিতার সাহায্য চাই না" এ কথা বলিলে পিতাকে অস্বীকার করা বা অবমাননা করা হয় না। ফলতঃ এরূপ পুত্র "স্বনাম-পুরুষো ধন্যঃ" বলিয়া সংসারে সম্যক্ গৌরবের পাত্রই হইয়া থাকেন।

কিন্তু আমরা এ সংসারে নিতান্ত দীন-দুঃখী-অকিঞ্চন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের কিছুমাত্র সম্বল নাই। আমাদের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি সঞ্চিত নাই। সুতরাং আমা-দের পক্ষে পিতৃ-সাহায্য ত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। পঙ্গু যদি স্বকীয় শক্তিতে চলিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহার যেরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে, পিতার সাহায্য পরি-

ত্যাগ করিলে এ সংসারে আমাদেরও সেইরূপ দুর্গতি হইবে। ফলতঃ প্রতিপদক্ষেপে আমাদের পিতৃ-সাহায্য একান্ত আবশ্যক। পিতাকে ভুলিয়া আমরা যখনই পদমাত্র চলিতে চেষ্টা করিব, তখনই নরকের দিকে আমাদের পদ অগ্রসর হইবে। যেহেতু বহুজন্মের সঞ্চিত দুষ্কৃতিবশতঃ নরকের দিকেই আমাদের চিত্তের স্বতঃ-প্রবণতা! সুতরাং বহুজন্মের দুষ্কৃতির ফলে তদ্রূপ নারকীয় সংস্কার আমাদের চিত্তকে পূর্ণ করিয়া আছে। পিতার সাহায্য ব্যতীত সেই পাপ সংস্কার অপসারণ করা আমাদের সাধ্যাতীত।

আমরা সামান্য ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ নহি; আমাদের ধৈর্য্য নাই। এ সংসারে আমাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির সম্ভাবনাও নাই। কত জন্ম পরিগ্রহ করিলে যে আমরা সামান্য পরিগ্রহ-পাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব, কত জন্ম পরিগ্রহ করিলে যে আমাদের বিষয়-বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য জন্মিবে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। অত-এব একান্ত কাতর-প্রাণে নিয়ত পিতার নিকটে এই প্রার্থনা করিতে হইবে,—

“পিতা গো, ক্ষুধার সময় আমায় অন্ন দাও, তৃষ্ণার সময় আমায় জল দাও। নতুবা আমার প্রাণ বাঁচিবে না। দয়াময়, হয় অন্নজল দাও, না হয় ত ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ কর, নতুবা আমি বাঁচি না; আমার অশেষ যন্ত্রণা তুমি বিনা আর কে দূর করিবে?”

এইরূপ প্রার্থনা করিলেই আমরা হৃদয়ে পিতার এই দৈববাণী শুনিতে পাইব,—

"রে পুত্র, তুমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলে, তখন আমি তোমার অন্নজলের বিধান করিয়াছিলাম, এখনও আমি তোমার প্রতিদিনের অন্নজলের বিধান করিতেছি, তবে তোমার ভয় কি? আমার ক্রূরতম সন্তান অজগর নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট হইয়াও বিজন বিপিনে অনাহারে মরে না, তবে তুমি কেন মরিবে? বৎস, তুমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলে, তখনও আমারই ক্রোড়ে ছিলে, এখনও এ সংসারে ছুটাছুটি করিয়াও আমারই ক্রোড়ে আছ। তবে তোমার ভয় কি? পুত্র, আমার এই কথা স্মরণ রাখিয়া সংসারে বিচরণ কর, তাহা হইলেই সমস্ত উদ্বেগ নিবৃত্ত হইবে, সমস্ত দুঃখ ও সমস্ত ভয় নিবারিত হইবে।"

অতএব ভাই, পিতাকে স্বীয় অভাব জানাইয়া নিয়ত প্রার্থনা করিবে, তাহা করিলে স্বীয় হৃদয়েই পিতার আশ্বাসবাণী অনুভব করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ করিও না।

কিন্তু সংসারাশ্রমে বনস্থ সন্ন্যাসীর ন্যায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত নহে। নিষ্পাপ সন্ন্যাসী স্বীয় ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই যাবতীয় অভাব পূর্ণ করিতে সমর্থ; কিন্তু সংসারী ব্যক্তির চিত্ত বিবিধ কলুষপঙ্কে কলঙ্কিত বলিয়া সেই চিত্তের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করা সংসারীর কর্ত্তব্য নহে। সংসারীর পক্ষে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। নিশ্চেষ্ট প্রার্থনায় সংসারি ব্যক্তির কোন ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবে এবং কর্ম্মের মধ্যেই ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

কাজের কথা।

যোগসাধন সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়াছে। তুমিও যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিয়াছ। কিন্তু শুধু বুঝিলে চলিবে না। জ্ঞান হইলেই সাধন হয় না। কাজ করার নামই সাধন। সেই জন্য এখন কাজের কথা বলিতেছি অর্থাৎ তোমাকে প্রত্যহ কি করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি ন ;—

সময় আর জীবন প্রায় তুল্যার্থ। অতএব সময়ের সদ্ব্যয় করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক ঘণ্টার জন্য কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই নির্দ্দেশ অনুসারে অনলস হইয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। এদেশীয় সাধারণ লোকে কর্ত্তব্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়া চলে না। জলস্রোতে বা বায়ু-স্রোতে যেমন তৃণপর্ণ ভাসিয়া বেড়ায়, এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণও যেন সময়-স্রোতে তদ্রূপে ভাসিয়া বেড়ায়। সেই জন্যই এদেশে সাধারণতঃ লোকের এত দুর্গতি। তুমি অবশ্য তদ্রূপে সময়-স্রোতে ভাসিবে না। কেননা সাংসারিক উন্নতি-সাধন করাই তোমার উদ্দেশ্য এবং অসাধারণত্ব লাভ করাই তোমার অভিপ্রেত। অতএব যাঁহারা সময়ের স্রোতে না ভাসিয়া সময়কে কার্য্যক্ষেত্র মনে করিয়া স্বীয় পদের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছেন এবং তদ্রূপে চলিয়া যাঁহারা সংসারে খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও সম্পদ্ লাভ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিয়া চলিবে। কিন্তু এদেশে অসাধারণ ব্যক্তি-গণের সেই পদচিহ্ন প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ এদেশের মহৎব্যক্তিদের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য-তালিকা আমরা কোন গ্রন্থেই প্রাপ্ত হই না। তজ্জন্য পাশ্চাত্য জগতের একজন অসাধারণ ব্যক্তির দৈনিক কর্ত্তব্য-তালিকা (Routine) প্রদর্শন করিতেছি।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন স্বলিখিত জীবন-চরিতে তাঁহার দৈনিক কার্য্যপ্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই কার্য্যপ্রণালী এইরূপ যথা ;—

ফ্রাঙ্কলিনের দৈনিক কার্য্যপ্রণালী।

	সময়।	
প্রাতঃকাল। প্রশ্ন। আমি আজ কি সৎকার্য্য করিব?	৫ ৬ ৭	গাত্রোত্থান। প্রাতঃকৃত্য সমাপন। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা। কর্ত্তব্য স্থির করা। পাঠ। প্রাতের আহার।
	৮ ৯ ১০ ১১	কার্য্য।
মধ্যাহ্ন।	১২ ১	পাঠ; জমা-খরচের হিসাব দেখা; মধাহ্নের আহার।
অপরাহ্ণ।	২ ৩ ৪ ৫	কার্য্য।
সন্ধ্যাকাল। প্রশ্ন। আমি আজ কি সৎকার্য্য করিয়াছি?	৬ ৭ ৮ ৯	দ্রব্যাদি যথাস্থানে রাখা; সন্ধ্যার আহার; গান, বাদ্য, আমোদ-প্রমোদ, আলাপ। দিনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আত্ম-পরীক্ষা।
রাত্রি।	১০ ১১ ১২ ১৩ ১ ২ ৩ ৪	নিদ্রা।

উল্লিখিত তালিকার ন্যায় তুমিও দৈনিক কর্ত্তব্য-তালিকা প্রস্তুত করিবে। এই তালিকা ফ্রাঙ্কলিন প্রাতঃকালে প্রস্তুত করিতেন; আমার বিবেচনায় শয়নের পূর্ব্বে এবং দৈনিক কার্য্যসম্বন্ধে আত্মপরীক্ষার পরেই পরদিনের কর্ত্তব্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত। কর্ত্তব্য-তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাতঃসময় ক্ষেপণ করা উচিত নহে।

পুনঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ৮ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৬ ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিলেই যথেষ্ট হয়। সুতরাং শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক সময় নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য।

প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের নাম সাধারণ ধর্ম্মসাধন। এই সাধারণ ধর্ম্মসাধনের মধ্যেই বিশেষ ধর্ম্মসাধনও আবশ্যক। সেই বিশেষ ধর্ম্মসাধনের জন্য আর একখানি দৈনিক স্মৃতিলিপিও আবশ্যক। উল্লিখিতরূপ কর্ত্তব্য-তালিকার ন্যায় সেই স্মৃতিলিপিও নিয়ত সম্মুখে লম্বমান থাকিবে। ফ্রাঙ্কলিন সেই বিশেষ ধর্ম্মসাধনের জন্যও কর্ত্তব্য-তালিকা বা স্মৃতিলিপি প্রস্তুত করিতেন।

(১) মিতাহার, (২) বাক্‌সংযম, (৩) সুশৃঙ্খলা, (৪) কর্ত্তব্যসাধনপ্রতিজ্ঞা, (৫) মিতব্যয়, (৬) পরিশ্রম ও সময়ের সদ্ব্যয় প্রভৃতি সাধনকে ফ্রাঙ্কলিন বিশেষ ধর্ম্মসাধন মনে করিতেন। তাঁহার এই সাধনের তালিকাও তিনি স্বকীয় জীবন-চরিতে প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা;—

পরিমিত পানাহার।

	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
পরিমিত পানাহার।							
বাক্ সংযম।	*	*		*		*	
সুশৃঙ্খলা।	*	*			*	*	*
কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।		*				*	
মিতব্যয়িতা।						*	
পরিশ্রম ও সময়ের সদ্ব্যয়।			*				
অকপটতা।							
ন্যায়পরায়ণতা।							
স্থৈর্য্য ও তিতিক্ষা।							
ইন্দ্রিয় সংযম।							
বিনয়।							

উক্ত তালিকার শীর্ষদেশে যে পরিমিত-পানাহার লেখা আছে, উহার তাৎপর্য্য কি শুন ;—তিনি এই সপ্তাহে পরিমিত-পানাহার রূপ বিশেষ ধর্ম্মসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন ; ইহাই তাঁহার এই সপ্তাহের বিশেষ লক্ষ্য ছিল ; অর্থাৎ "আমি অন্ততঃ এক সপ্তাহ মিতাহারী হইব ; ইহা আমার অটল প্রতিজ্ঞা।" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি এক সপ্তাহ যাপন করিয়াছিলেন। তিনি এই সপ্তাহে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পরিমিত-পানাহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট তালিকার ৭টী ঘর কলঙ্কচিহ্ন হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে কোন বারেই তিনি অপরিমিত পানাহার করেন নাই। কিন্তু এই সপ্তাহে তিনি বাক্‌সংযম করিতে পারেন নাই ; কেননা বাক্‌সংযমে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল না। তজ্জন্য তিনি সপ্তাহের মধ্যে রবি, সোম, বুধ ও শুক্র এই চারিটী বারে বাক্‌সংযম হইতে স্খলিত হইয়া উক্ত চারিটী বারে চারিটী কলঙ্কচিহ্ন (*) স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ কর্ত্তব্য-তালিকার অনুসরণ করিয়াই মহাত্মা ও মহানুভব ফ্রাঙ্কলিন অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে আপনাকে অতি সম্মানার্হ পদবীতে উন্নমিত করিয়াছিলেন।

ফলতঃ উল্লিখিতরূপ কর্ত্তব্য-তালিকা ও স্মৃতিলিপি প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেই মহত্ত্ব লাভ করা যায়, নতুবা মহত্ত্বলাভের সম্ভাবনা নাই। ভাই, যদি মানুষের মত মানুষ হইতে ইচ্ছা কর, তবে দৈনিক কর্ত্তব্য-তালিকা ও স্মৃতিলিপি প্রস্তুত করিয়া আত্মোন্নতিসাধন কর। যোগসাধনের ইহাই নিগূঢ় রহস্য এবং প্রকৃষ্ট পন্থা। কর্ত্তব্য-তালিকার

নিকট আত্মসমর্পণ কর। স্বেচ্ছাচারিতার জন্য যেন মুহূর্ত্ত-মাত্র সময়ও নিজের হাতে রাখিও না। কর্ত্তব্য-তালিকার দাস হইয়া কার্য্য করিয়া যাও। তাহা হইলে মনে যখনই দুশ্চিন্তা বা কুচিন্তার উদয় হইবে, তখনই বলিতে পারিবে, "অয়ি দুশ্চিন্তে! তোমাকে লইয়া থাকিবার আমার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই, যেহেতু আমার কর্ত্তব্য-তালিকা তোমার জন্য তিলার্দ্ধ সময়ও রাখে নাই। আমি কর্ত্তব্য-তালিকার দাস; সুতরাং তাহারই নির্দ্দেশমতে আমাকে চলিতেই হইবে।"

যদি তুমি কোন প্রকার কদভ্যাসের নিতান্ত দাস হইয়া থাক, তাহা হইলে দেখিবে, উল্লিখিতরূপে কর্ত্তব্য-তালিকার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই তোমার কদভ্যাস অতি সহজেই অন্তর্হিত হইবে। কর্ত্তব্য-তালিকাই পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির হেতু। ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মান্ প্রভৃতি জাতি কর্ত্তব্য-তালিকাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করেন। কর্ত্তব্য-তালিকা স্বহস্তে প্রস্তুত হইলেও তাহা ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুসারেই প্রস্তুত বলিয়াই পবিত্র মনে করে। কর্ত্তব্য-তালিকায় দুষ্কার্য্যসাধনের কথা থাকে না। সহজে, নিতান্ত সামান্য কারণে বা সামান্য ছলে তাঁহারা কখনই কর্ত্তব্য-তালিকা লঙ্ঘন করিয়া কাজ করেন না। পরদিন কি কাজ করিতে হইবে, কেবল ইহাই নির্দ্দিষ্ট না করিয়া অনেক বড় লোক পরবর্ত্তী বহুদিনের কর্ত্তব্য অগ্রেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। ফলতঃ তাঁহাদের জীবন যেন কর্ত্তব্য-তালিকার নিকট অগ্রেই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বৃথা গল্প করিবার সময় থাকে না, বৃথা কার্য্য বা বৃথা চিন্তারও

অবসর থাকে না। সুতরাং তাঁহারা যে ক্রমশই উন্নতিশিখরে উত্থিত হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি ?

ভাই, কর্ম্মক্ষেত্রে যেন অলস হইয়া বসিয়া থাকিও না। হয় শারীরিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাক, না হয় মানসিক সুচিন্তা লইয়া ব্যাপৃত থাক। "এখন ত কোন কাজ নাই" এরূপ কথা ভীষণ পাপাত্মার পক্ষেই সঙ্গত। কাজ আছে কি না কর্ত্তব্য-তালিকার নিকট জিজ্ঞাসা কর। কর্ত্তব্য-তালিকা তোমাকে তিলমাত্র সময় আলস্যে বা স্বেচ্ছাচারিতায় ক্ষেপণ করিতে দিবে না। সময়ের সদ্ব্যবহারই জীবনের সদ্ব্যবহার। আর জীবনের সদ্ব্যবহারই ঈশ্বরের আদেশ-পালন। অতএব কর্ত্তব্য-তালিকাই ঈশ্বরের আদেশ। শয়নের পূর্ব্বে যখন পরদিনের কর্ত্তব্য-তালিকা প্রস্তুত করিবে, তখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিও; তিনিই তোমাকে কর্ত্তব্য-তালিকা প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দিবেন। আমাদের হৃদয়স্থ দেবতা কখন আমাদের অবনতি ইচ্ছা করেন না; তিনি উন্নতির পথেই লইয়া যাইতে নিয়ত অভিলাষী; তবে আমরা স্মরণশক্তি হারাইয়া অধোগতির পথে ধাবিত হই। কর্ত্তব্য-তালিকা আমাদিগকে সেই অধোগতির পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবে। সুতরাং কর্ত্তব্য-তালিকা আমাদের স্মরণশক্তি কদাপি বিলুপ্ত হইতে দিবে না। স্মৃতিভ্রংশ না হইলে আমাদের পতনেরও আশঙ্কা নাই। অতএব স্মরণশক্তির উৎকর্ষসাধন জন্য বা যোগসাধন জন্য কর্ত্তব্য-তালিকার মহিমা আর কত বলিব। ফলতঃ যে দিন হইতে তুমি কর্ত্তব্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে কাজ

করিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিন হইতেই তোমার যোগা-রম্ভ হইবে; সেই দিন হইতেই তোমার মনুষ্য-জীবনের সৎপথে নিয়োগ হইবে। নতুবা লক্ষ লক্ষ সদুপদেশ ও লক্ষ লক্ষ শাস্ত্রাধ্যয়ন কোন ফলই উৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তালিকা অনুসারে কাজ কর। ইহারই নাম যোগসাধন।

বিশেষ ধর্ম্মসাধনের জন্য যেরূপ স্মৃতিলিপি প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে; দৈনিক কর্ত্তব্য-সাধনের মধ্যে এই স্মৃতি সাবধানে রক্ষা করিবে। যেন যম-নিয়ম-সাধন হইতে বিচ্যুতি না ঘটে; যেন কোন দিন কলঙ্ক-চিহ্নে চিহ্নিত করিতে না হয়। তবে যদি অনবধানতাবশতঃ বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে অবশ্যই কলঙ্কচিহ্ন স্থাপন করিবে; যেহেতু জীবনের জমাখরচের সময় সেই কলঙ্কচিহ্ন দেখিয়াই খরচ লিখিতে হইবে।

সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন প্রকার ধর্ম্মসাধনেই অধিকার লাভ হইবে না। শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল, সুতরাং মনের উৎসাহ একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যসাধনেরই ফল। আর সেই স্বাস্থ্য, বল ও উৎসাহই সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল। আবার ধর্ম্মই অর্থসাধনের এবং অর্থই ভোগসাধনের সহায়; পুনঃ ভোগসাধনই মোক্ষসাধনের নিয়োজক। অতএব ব্রহ্মচর্য্যই চতুর্ব্বর্গসাধনের বা পুরুষার্থ-সাধনের নিদান।

ব্রহ্মচর্য্য।

যম-নিয়ম।		সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রবি
অহিংসা	ক্রোধ							
সত্য								
অস্তেয়								
ব্রহ্মচর্য্য	কাম							
অপরিগ্রহ	লোভ							
শৌচ								
সন্তোষ								
তপঃ								
স্বাধ্যায়								
ঈশ্বর-প্রণিধান								

স্মরণশক্তির উৎকর্ষ-সাধন বা যোগসাধনের জন্য আর একটি কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। জীবনের হিসাবের জমাখরচের একখানি খাতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আত্মোন্নতির ও সুখদুঃখের জমাখরচ রীতিমত লিখিতে হইবে। সেই হিসাব দেখিয়া সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক খতিয়ান্ প্রস্তুত করিতে হইবে। সামান্য জমীদারীর জমাওয়াশীল-বাকির জন্য আমরা কতই যত্ন করি, কিন্তু জীবনরূপ পরম সম্পত্তির জমাওয়াশীলবাকির হিসাব রাখিতে কিছুই যত্ন করি না, সেই জন্যই আমাদের জীবন বৃথা নষ্ট হয়; অতএব জীবনের হিসাব অতি সাবধানে রক্ষা করিবে।

যম-নিয়ম-সাধনে একাগ্রচিত্ত হইলে কামক্রোধাদি রিপু দমনের জন্য আর স্বতন্ত্র চেষ্টা করা অনাবশ্যক। যম-নিয়ম-সাধনই জীবনের উন্নতিসাধন বা ধর্ম্মসাধন এবং ইহাই ইহ-পারলৌকিক মঙ্গলসাধন।

ইতি যোগসাধন প্রথমভাগ

সমাপ্ত।